প্রথম প্রকাশ ঃ
১লা বৈশাখ, ১৩৬০

প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মাগান্ধী রোড়
কলিকাতা – ৯.

প্রচ্ছদ শিল্পী
শ্রীগণেশ বসু
৫৯৫ সার্কুলার রোড
হাওড়া - ৪

অন্যান্য ছবি
তরুণ চক্রবর্তী
৬০/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৭০০ ০০৯

কম্পোজিং -
ক্যালকাটা ফটোটাইপ সেন্টার
২৪বি, সৈয়দ আমির আলি এভিনিউ,
কলকাতা - ৭০০ ০১৭

মুদ্রক -
তপন কুমার দে
দেশ্রী অফসেট
১৩, বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

উৎসর্গ

ডাঃ ক্ষীরোদচন্দ্র হাজরা, এম. বি., আই. এম. এস

বাবা,

আমাকে ঘিরে আপনার স্বপ্নের অন্ত ছিল না। অথচ আপনার জীবিতকালে না করেছি পড়াশুনো না অন্য কিছু। আজ আমি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পেয়েছি, পি-এইচ. ডি পেয়েছি। অনেকগুলি বইও লিখেছি। আপনার 'কুলাঙ্গার' পুত্রের এ সব কিছুই আপনি দেখে যেতে পারেন নি। তবু মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আপনার সেই আশীর্বাদ আর 'তুই আমার বড় স্নেহের, বড় স্বপ্নের' কথাটা আজও আমার কানে প্রেরণার মত বাজে।

সত্যিই কি আত্মা অবিনশ্বর! যদি তা হয় তবে কি আপনি আমার এসব গ্রন্থ দেখতে পান? আমার দিকে তাকিয়ে আপনার মুখ কি খুশীতে উজ্জ্বল হয়? যদি হয় তবে আশীর্বাদ করুন দশ ও দেশের সংস্কৃতিচর্চায় আমি যেন আরো কিছু চিন্তা জমা রেখে যেতে পারি। ইতি—

আপনার স্নেহের
পুত্র
(নীরদবরণ হাজরা)

ভূমিকা

এক.

শ্রুতিনাটক-কোষ আমার কোষ-গ্রন্থমালার তৃতীয় গ্রন্থ। প্রথম গ্রন্থ আবৃত্তিকোষ লিখি প্রায় কুড়ি বছর আগে। তখন উপলব্ধির সত্যকে প্রকাশে অকৃত্রিম সংকোচ বোধ করতাম। ফলে সে গ্রন্থের 'কোষ' নাম দিতে সাহস প্াইনি। কিন্তু সেই সূত্রাকার গ্রন্থ সুধীজনের সমর্থন লাভ করায় আমি যে আন্তরিক প্রেরণা পাই আর নানা স্থান থেকে উৎসাহী পাঠকেরা যত চিঠি পাঠিয়ে গ্রন্থটিতে আরও নানা তথ্য সংযোজনের বিষয় জানিয়ে দাবী প্রকাশ করেন — তাতে আমাকে প্রায় পাঁচ বছর এ বিষয়ে নিয়ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে হয়। এর পরেই 'আবৃত্তিকোষ'-এর প্রকাশ ঘটে।

আমার দ্বিতীয় 'কোষগ্রন্থ' ভাষণ সম্পর্কে। সে গ্রন্থে যাবতীয় ভাষণের রীতি-নীতি, অনুশীলন পদ্ধতি এমন কি বিচার-পদ্ধতির সূত্রও গড়ে তুলেছি। এ গ্রন্থও জনপ্রিয় হয়। সংস্কারান্তর প্রকাশের ফলে আমার নিজের চিন্তাভাবনাও বারবার কষ্টিপাথরে কষে নেবার সুযোগ পাই।

এ দুটি গ্রন্থই আলোচ্য বিষয়ে বাঙলার প্রথম গ্রন্থ। এর পর আবৃত্তি সম্পর্কে আরো কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও, অনেকেই আবৃত্তির একটা সামগ্রিক রূপ তুলে ধরতে পারেন নি। ভাষণ বিষয়ে ভাষণকোষ বাঙলার একক গ্রন্থ। এই দুই গ্রন্থের সাফল্যেই শ্রুতিনাটকের মত বিতর্কিত বিষয়ে একটি সামগ্রিক গ্রন্থ ও কিছু নাট্যসংকলন একত্রে একটি 'কোষ গ্রন্থ' রচনায় আমাকে সাহসী করেছে।

বাঙলায় 'শ্রুতিনাটক' বিষয়ে এটি প্রথম গ্রন্থ । এর আগে গুটি দুয়েক নাট্যসংকলন বেরিয়েছে। ডঃ সনাতন গোস্বামীর সম্পাদনায় বেরিয়েছে 'প্রসঙ্গ : শ্রুতিনাটক' নামে এক মতামত-সংগ্রহ। সেখানে পক্ষে-বিপক্ষে বহু মতামত একত্রে সংকলিত হয়েছে মাত্র। ডঃ গোস্বামী ঐ মতামতের ঘনঘটা থেকে কোন বিশিষ্ট সত্যে উপনীত হন নি। ফলতঃ শ্রুতিনাটক কি, কি তার বিশিষ্ট রীতি, এ সব সম্পর্কে চতুর্দ্দিকে শুধু প্রশ্ন ও সংশয়ই সৃষ্টি হয়েছে।

আমি নিজে প্রথম অবস্থায় শ্রুতিনাটকের বিরোধী ছিলাম। আমারও মনে হ'ত নিষ্ঠাহীন ফাঁকিবাজী দিয়ে মঞ্চে নেমে পাদপ্রদীপের আলোয় সহজে নিজেকে আলোকিত করবার এক চটুল পদ্ধতি শ্রুতি-নাটক। কিন্তু গত কয়েক বৎসর কতকগুলি শ্রুতিনাটক প্রতিযোগিতার আসরে বিচারক হিসাবে উপস্থিত হয়ে বাধ্য হলাম বিষয়টি সম্পর্কে অভিনিবেশ সহকারে অনুভব করতে। এবং তখনই উপলব্ধি করলাম যে, এর সবটুকুই নিষ্ঠাহীনতা নয়, ফাঁকিবাজী নয়। চটুলতাও নয়। কোন একটি দল মাত্র পনের মিনিটের অভিনয়ে যে দিন আমার চোখে জল টেনে আনল, যেদিন প্রথম শ্রুতিনাটকের নাটকত্বে আমার প্রত্যয় জন্মাল। আমি নবজাতকের কোষ্টীবিচারে ব্রতী হলাম। আজ আমি শ্রুতিনাটককে সর্ব-সংশয়-মুক্ত করে যদি একটি আঙ্গিকগত প্রতিষ্ঠাভূমিতে যদি দাঁড় করাতে পেরে থাকি, তবে এর পিছনে প্রত্যক্ষ প্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে ঐ সব প্রতিযোগিতার আয়োজকেরা আর সেই সব মফঃস্বলী নাট্যদল, যারা বিশেষজ্ঞ-নিন্দিত শ্রুতি-নাটককে প্রাণের গভীর আকুতি দিয়ে সনিষ্ঠভাবে মঞ্চস্থ করে আমার মত বিরোধী মানুষকেও গুরুর মত জ্ঞানাঞ্জনশলাকা ঘষে

নিবাবৃষ্টি দান করেছিলেন। আমি সকৃতজ্ঞ চিত্তে সেই সব আয়োজকদের এবং শিল্পীদের প্রণতি জানাচ্ছি।

এই প্রসঙ্গে ডঃ বন্ধুবর সনাতন গোস্বামীর গ্রন্থটির কথা আবার তোলা যেতে পারে। এ গ্রন্থে শ্রুতিনাটকের সমর্থক অগ্রগণ্য ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত মশাই-এর প্রবন্ধটি প্রথম আমাকে সমর্থক চিন্তায় অনুপ্রাণিত করে। ডঃ গুপ্ত মশাইকে আমি ছাত্রাবস্থা থেকে জানি এবং তাঁর গ্রন্থাদি থেকে তাঁর বিশ্লেষণ-ধর্মী যুক্তিনির্ভর মনটিকে চিনি। ফলে তাঁর মতের সঙ্গে আমার মত মেলায় আমার জোর বেড়ে যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ডঃ অজিতকুমার ঘোষ এবং নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্তের মত মানুষকে যখন বিরোধী ভূমিকায় দেখি তখন ঐ সাহস গুটিয়ে আসে। ওঁরা ব্যক্তিগত ভাবে আমার পরিচিত এবং আমি ওঁদের স্নেহধন্য। স্বভাবত ওদের বিরুদ্ধে যেতে আমার সংকোচ ও দ্বিধার অন্ত ছিল না।

কিন্তু ওঁদের প্রবন্ধগুলি বার বার পড়তে পড়তে যখন এই উপলব্ধিতে উপনীত হলাম যে, আসলে ওঁরা শ্রুতিনাটক বিরোধী নন। তাদের সব বিরোধী মন্তব্য কলকাতায় গ্রামার-সর্বস্ব যে সব শ্রুতিনাটক মঞ্চায়ন হচ্ছে তার বিরুদ্ধে। তাদের বুকে নাটকাভিনয় সম্পর্কে যে শ্রদ্ধাপবিত্র মূর্তি গঠিত আছে, ঐ সব প্রযোজনা সেই মূর্তিকেই বিধ্বস্ত করেছে। তাই ঐ সব ক্রুদ্ধ মন্তব্য। ওঁদের প্রতি আমার ব্যক্তিগত যে শ্রদ্ধা ঐ উপলব্ধি তাকে অনাহত রাখল। বুঝলাম যে ওঁদের বিরুদ্ধে আমি নামছি না। ওঁরা আসলে আমার মতের সমর্থক। ভবিষ্যতের মানুষ 'প্রসঙ্গ : শ্রুতিনাটক' পড়ে যাতে ভুল ধারণা না করে, তার প্রতিশোধক ঐ সব বিরোধী মন্তব্য তুলেছি।

আমি মফঃস্বলবাসী। আমার দীনতা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আমি সচেতন। শ্রুতিনাটকের প্রকৃতি ও স্বরূপ নির্দ্ধারণের জন্যই বহুজনের বিরোধী মন্তব্য উদ্ধার করেছি। কাউকে অসম্মান বা বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা প্রকাশ আমার উদ্দেশ্য নয়। তবু ভাষার দীনতায় যদি কোথাও প্রাজ্ঞজনের প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ বা আক্রমণ বা বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়ে থাকে, তবে আমি পূর্বাহ্নেই করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমার বিশ্বাস তা হয়নি। কারণ শ্রদ্ধেয়জনের প্রতি বিনম্র বিনয় প্রকাশই আমার অকৃত্রিম মানসিকতা।

দুই.

আলোচ্য গ্রন্থের নাম রেখেছি 'শ্রুতিনাটক কোষ'। এতে প্রথম আপত্তি করেন আমার প্রকাশক-বন্ধু সুনীল মণ্ডল। তিনি নাম দিতে চান 'শ্রুতিনাটক কি ও কেন?' নামটির আকর্ষণ অনেক বেশী। 'শ্রুতিনাটক কোষ' নামে ঐ উজ্জ্বলতা, ঐ 'স্মার্টনেস' নেই। কিন্তু তবু আমি 'কোষ' নামটিই যুক্ত করলাম। কারণ, পূর্বোক্ত নাম গ্রন্থের তাত্ত্বিক আলোচনা অংশকে বোঝায়, নাট্যসংকলন অংশকে নয়।

কোষ কথাটি প্রাচীন কালে অভিধান অর্থে ব্যবহৃত হ'ত—যেমন 'অমর-কোষ'। কিন্তু সমগ্রতা বোঝাতেও কোষ শব্দটি ব্যবহার করা যায়। শ্রুতিনাটকের সব দিক সম্পর্কেই আলোচনা এ গ্রন্থে ঠাঁই পেয়েছে এমন কি কয়েকটি বিভিন্নধর্মী নাটকও। এ জন্য 'শ্রুতি-নাটক কোষ' নামটিই রাখা হ'ল।

এই গ্রন্থ দুটি পর্বে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম পর্বে শ্রুতিনাটক সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম প্রবন্ধেই শ্রুতিনাটক সম্পর্কে নানা সংশয়ের নিরসন করবার

চেষ্টা করেছি। এর ভেতর দিয়ে শ্রুতিনাটকের রীতিনীতি ও স্বরূপ সম্পর্কে একটা বোধ আভাসিত হয়ে উঠেছে মাত্র। তাই দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ বিষয়ে আমাদের মত ও ধারণা স্পষ্টাকারে বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে আবার শ্রুতিনাটকের সম্ভাবনা সম্পর্কেও বলা হল। আমি বিশ্বাস করি শ্রুতিনাটক নাট্যক্ষেত্রে একটা মাত্রা সংযোজন করল। এর সম্ভাবনা অনন্ত। মঞ্চ নাটক পৌঁছাতে পারে না—এমন বহু ক্ষেত্রে শ্রুতিনাটকের অভিসার।

এর পরের দুটি অধ্যায়ে আমরা শ্রুতিনাটকের শিল্পীদের আত্মপ্রস্তুতির নানা দিক নিয়ে বলেছি। তৃতীয় অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর আরো বিস্তারিত বিবরণ আমার 'আবৃত্তিকোষ' গ্রন্থে আছে। উৎসাহীজন গ্রন্থটি দেখে নিতে পারেন।

এর পরের চারটি অধ্যায়ে শ্রুতিনাটকে শব্দসংযোজনের নানা দিক সম্পর্কে বলা হয়েছে। শ্রুতিনাটকে শব্দ-সংযোজনের ভূমিকা মঞ্চনাটকের চেয়ে বেশি। এ জন্য অন্য আলোচনার সঙ্গে শব্দ-সংরক্ষণ এমন কি শব্দসৃষ্টির কৌশল সম্পর্কেও আলোচনা যোগ করতে হ'ল। অষ্টম অধ্যায়ে শব্দসংকেত লিপি প্রণয়ণের রীতি সম্পর্কে একটি নতুন দিকের আলোচনা যুক্ত করলাম। শব্দের ব্যাপারে আরো বিশদ আলোচনা আমার 'মঞ্চে শব্দবিজ্ঞান ও শব্দ-সংযোজন' গ্রন্থে পাওয়া যাবে।

নবম অধ্যায়টি মূলতঃ শ্রুতি-নাটক মঞ্চায়ন বিষয়ে। এত প্রস্তুতি, এত সাধনা,—সবই ত' মঞ্চায়নকে লক্ষ্য করে। তাই মঞ্চায়ন-কালের নানা বিধি-নিষেধ ও সতর্কতা এই অধ্যায়ে আলোচিত হ'ল।

দশম ও একাদশম অধ্যায় আমার মূল পরিকল্পনায় ছিল না। শ্রুতিনাটক-কোষ নামটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আকস্মিক ভাবেই মনে হ'ল, শ্রুতি-নাটকের নাট্যকার ও বিচারকদের সম্পর্কে কিছু না বললে গ্রন্থের আলোচনাও যেমন অসম্পূর্ণ থাকছে, তেমনি 'কোষ' নামটিও তাৎপর্যশূন্য হচ্ছে। এ কারণে শেষ দু অধ্যায় যুক্ত হ'ল।

দশম অধ্যায়ে শ্রুতিনাটকের নবব্রতী নাট্যকারদের প্রতি কিছু নিবেদন করেছি। এটি নাটক লেখা শেখাবার ক্লাস নয়। নাট্যরচনা বিষয়ে আমার কতকগুলি অনুভূতি মাত্র বর্ণনা করেছি। ঐ অনুভবগুলি যদি কোন নাট্যকারকে বিন্দুমাত্রও সাহায্য করে তবে আমি ধন্য হব। একাদশ অধ্যায়ে অনুরূপ মানসিকতাই পেশ করেছি বিচারকদের দরবারে। এ দুটি অধ্যায়ের জন্য গ্রন্থ প্রকাশে কয়েক মাস বিলম্ব হ'ল।

দ্বিতীয় পর্বে আটটি নাটক সংকলন করেছি। শ্রুতিনাটক যে কত বিচিত্র বিষয়ে রচিত হতে পাবে, মঞ্চনাটকের সীমানা পেরিয়ে নাট্যরসের সন্ধান দিতে পারে—আলোচ্য নাটকগুলিতে তাকেই পরিবিতিফলিত করা হয়েছে।

এই নাট্যসংকলনের দুটি নাটক আমার রচনা। বাকী ছ'টি আমার নাট্যরূপ দেওয়া। গল্প থেকে নাট্যরূপ। গল্পকারেরা আমাকে অনুমতি দিয়ে বাধিত করেছেন।

সম্পূর্ণ নিজ বিশ্বাস ও অনুধ্যানের সিদ্ধান্ত মতে এ গ্রন্থ গড়ে তুললাম। সত্যিই যদি এতে শ্রুতিনাটক তার প্রতিষ্ঠাভূমি পায় আর শ্রুতিনাটক-প্রেমীরা গ্রন্থটিকে মঙ্গলবিধায়ক মনে করেন, তবে আমার শ্রম সার্থক হবে। ইতি। নিবেদক

অঙ্গনা/কৃষ্ণনগর/নদীয়া

শ্রুতিনাটক-কোষ

●

বাঙলা ভাষায়

শ্রুতিনাটকের

স্বরূপ

বিশ্লেষণ

ও

অনুশীলন সহায়ক

একমাত্র গ্রন্থ

●

সঙ্গে

এক অনন্য

নাট্যসংকলন

●

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

- **আবৃত্তি কোষ**
(আবৃত্তির রীতি-নীতি, অনুশীলন পদ্ধতি ও আবৃত্তিযোগ্য কবিতা সংকলন।)
- **ভাষণ কোষ**
(বক্তৃতা, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, বিতর্ক, ইন্টারভিউ দেবার রীতি-পদ্ধতি ইত্যাদি অনুশীলন থেকে বিচার সর্বপর্বের আলোচনা)
- **মঞ্চে আলোক-সম্পাত**
(মঞ্চাভিনয়কালে আলোক-সম্পাতের রীতিপদ্ধতি ও বহু মঞ্চমায়া সৃষ্টির কৌশল)
- **মঞ্চে শব্দবিজ্ঞান ও শব্দসংযোজন**
(মঞ্চ-নির্মাণে শব্দবিজ্ঞানের প্রয়োগ থেকে অভিনয়ে শব্দ সংযোগের সর্ব ব্যাপারে শব্দ-বিজ্ঞানের প্রয়োগ-বিধি ও নানা শব্দমায়া সৃষ্টির কৌশল নির্দেশিকা)
- **মঞ্চে দৃশ্যপট নির্মাণ ও ব্যবহার**
(দৃশ্যপট নির্মাণের সর্ব বিষয়ের খুঁটিনাটি ব্যবহারিক জ্ঞান, ব্যবহারের নীতি বাঙলা নাটকে পট ব্যবহারের ইতিহাস, ও বহুপট ও পটকারদের চিত্রসংগ্রহ)
- **বিদ্রোহ-বিপ্লব-স্বাধীনতা**
(ভারতের স্বাধীনতা তিলে তিলে হারান ও পুনরুদ্ধারের ধারাবাহিক অনুপুঙ্খ ও অন্তরঙ্গ কাহিনী। উপন্যাসের মত সুখপাঠ্য অথচ তথ্য-পূর্ণ ইতিহাস।)
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-অভিধান**
(রামকৃষ্ণদেবের উপদেশাবলী, আত্মকথা ও ভক্তবৃন্দ পরিচিতির বর্ণানুক্রমিক বিন্যাস।)

কিশোর উপন্যাস ও গল্প

- রামরহিমের বন্ধু
- তিন রসিকের ব্রহ্মস্পর্শ
- মৈমনসিংহ গীতিকার গল্প
- কথাসরিৎসাগর
- সিন্দবাদের অভিযান
- কলকাতা কথা বলো
- বিবিধের মাঝে হবে মিলন মহান
- বাঙলা প্রবাদের গল্প
- ছড়ায় মোড়া শতেক ধাঁধা
- খেলার ছলে বিজ্ঞান
- ১০০০ জোকস্, ১৫০০ জোকস্
- প্রশ্নোত্তরে কলকাতা ৩০০

অনুবাদ গ্রন্থ

- **শুনুন ধর্মাবতার**
(নাথুরাম গডসের গান্ধী-হত্যা সম্পর্কিত জবানবন্দীর অপ্রকাশিত দলিলের অনুবাদ ও টীকাসংযোগ।)

সম্পাদিত গ্রন্থ

- **কাশীরাম দাসের মহাভারত**
- **কৃত্তিবাসী রামায়ণ**
- **শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণকথামৃত (পাঁচ খণ্ড)**

গবেষণা-গ্রন্থ

- **কলকাতা : ইতিহাসের দিনলিপি**
(কলকাতার প্রায় ৭০০ বছরের প্রতিদিনের প্রধান ঘটনার পঞ্জীয়ন।)

সূচীপত্র

প্রথম পর্ব তত্ত্ব ও প্রযোগ

দ্বিতীয় পর্ব।। নাট্য সংকলন

শ্রুতিনাটক-কোষ

প্রথম পর্ব

তত্ত্ব ও প্রয়োগ

১

শ্রুতিনাটক ঃ নানা সংশয়

'শ্রুতিনাটক' নামে এক জাতীয় নাট্যচর্চা আমাদের দেশে বিংশশতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে আবির্ভূত হয়ে একদিকে যেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে ঠিক তেমনি সংশয় ও আলোড়ন তুলেছে পণ্ডিত ও নাট্য-বিশেষজ্ঞদের মধ্যে। সন্দেহ নেই শ্রুতিনাটক নাট্যচিন্তার ক্ষেত্রে এক বিদ্রোহী-সন্তান। তবে তার বিদ্রোহ ধ্বংসাত্মক নয়—সৃষ্টিমূলক। সে প্রচলিত নাট্যচর্চাকে ধ্বংস করতে চায়না। প্রচলিত রীতির অনেক কিছুকে বর্জন করেও নাটককে নাটক হিসাবে টিকিয়ে রাখা যায় কিনা – তারই সাধনায় মেতেছে।

সাধারণ নাটককে ভারতীয় আলঙ্কারিকেরা বলেছেন দৃশ্যকাব্য। অর্থাৎ দর্শনই সেখানে প্রধান। যদিও আমরা বলি যাত্রা শুনতে যাচ্ছি কিন্তু নাটকের বেলায় বলি নাটক দেখতে যাচ্ছি। কিন্তু নাটকে ত' আমরা শুধু দেখি না। শুনিও। নাটকে শোনার মাত্রাটা এককালে সংলাপ এবং কিঞ্চিত আবহ সঙ্গীতেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানকালে বহুক্ষেত্রেই নাটকে দর্শনের সঙ্গে শ্রবণের গুরুত্বকে সীমাহীনভাবে বাড়ান হচ্ছে।

একটা নাটকাভিনয়ে আমরা কতখানি দেখতে পাই? আলোকশিল্পী আমাদের যতটুকু দেখাতে চান, আমরা ততটুকুই দেখি। তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে মঞ্চের খানিকটায় অন্ধকার সৃষ্টি করে আমাদের দর্শনের বাইরে রাখতে পারেন। এমন অন্ধকার সৃষ্টি নাট্য-প্রয়োজনার প্রয়োজনেই করা হয় আর তার দ্বারা নিশ্চয়ই নাট্যরস সৃষ্টির মাত্রা বাড়ে। কিন্তু তা হলেও বলতেই হবে আমাদের দর্শনের সুযোগ সে ক্ষেত্রে সীমায়িতই করা হয়েছে। আবার মঞ্চের পিছনদিক জুড়ে যদি থাকে এক দেওয়াল, তবে তার পিছনের অংশ থাকে আমাদের দৃষ্টির আগোচরে। অথচ ঐ দেয়ালের ওপারে যে দোয়েল শিস দেয়, বাঁশ গাছে বাতাস বয়ে সর্ সর্ শব্দ তোলে, নদীর জল এসে আছড়ে পড়ে যে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ তোলে, বন্ধু গোপনে নৌকা বেয়ে এনে দেয়ালের এ পাশের বন্দী বন্ধুকে মুক্ত করবার প্রয়াস পায়—তা তো ধ্বনিসংকেতেই মনের কন্দরে পৌঁছে দেয়। চোখের সামনে তো দেখছি একটি বন্দী মানুষের চোখের অর্থহীন চাউনি। এ শব্দগুলিকে যদি উপেক্ষা করা যায়, তা হলে মুক্ত পাখির শিস বন্দীর বুকে যে বেদনা তোলে, যে মুক্তির আকুলতা জাগায়; বন্ধুর গোপনে

নৌকা বেয়ে আনার শব্দ শুনে তার সন্দেহ, উৎকণ্ঠা, উদ্দীপনা, আশা ইত্যাদি মানসিক ভাব বিবর্তন অনুভব করা যায়, তা একেবারে অস্ফুট ও অর্থহীন হয়ে যায়। তা হলে দেখা যাচ্ছে নাটকে দর্শনের চেয়ে শ্রবণ কোন অংশেই কম গুরুত্বের নয়।

শ্রুতিনাটক এখানেই তার চ্যালেঞ্জ রেখেছে। সে শুধুমাত্র ধ্বনিময় উপস্থাপনার দ্বারা সহৃদয় সামাজিকের মনে নাটকের সমগ্র রস গড়ে তুলবার আকাঙ্খা রাখে। সাজ-সজ্জা, মঞ্চব্যবস্থা, কায়িক অভিনয়, আলো—সব কিছুকে বাদ দিয়েও যে নাট্যরস উপভোগ করা যায়, এই নব প্রত্যয়ে শ্রুতিনাটক উদ্দীপ্ত। এতগুলি সহযোগী উপকরণকে বাদ দিয়ে নাট্য উপস্থাপনার মত নাট্যরস সৃষ্টির প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়ন যে সহজ নয়—তা সকলেই অনুভব করবেন।

শ্রুতিনাটকের এই প্রগাঢ় প্রতিজ্ঞার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সহজতর একটি দিকে অনেক নাট্যপ্রযোজক, ও অভিনেতা-অভিনেত্রী আকৃষ্ট হন। যেহেতু এখানে দর্শনকে উপেক্ষা করা হয়েছে, তাই এরা মঞ্চে স্ক্রিপ্ট নিয়ে বসে, সামান্য প্রস্তুতি নিয়ে 'শ্রুতি-নাটক' মঞ্চায়ন শুরু করেছেন। একদল প্রয়োজক আবার বিখ্যাত চিত্রাভিনেতাদের মঞ্চে সমবেত করে শ্রুতিনাটক সন্ধ্যার আয়োজন করছেন। এই অভিনেতা অভিনেত্রীরা যদি যোগ্য সময় দিয়ে প্রস্তুত হয়ে মঞ্চে বসতেন, তবে বলবাব কিছু থাকত না। কিন্তু তাঁরাও তাদেব শক্তির বিশ্বাসে যথেষ্ট প্রস্তুত না হয়ে এসে স্ক্রীপ্টটি স্বভাব দক্ষতায় পড়ে যাচ্ছেন। আব একেই শ্রুতিনাটকের চরম প্রকাশ ভেবে নিয়ে বহু পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ এই নাট্য আঙ্গিকটিকে চরম আক্রমণ করছেন। বস্তুতঃ আক্রমণ শ্রুতিনাটকের ওপব নয় — ঐ জাতীয় নাট্য-প্রযোজনার ওপব। ওঁরা নিষ্ঠাহীন ঐ সব প্রযোজনা দেখে নিজ মনের নাট্যবোধকে এত আহত বোধ করেছেন যে তার তীব্র উচ্ছ্বাসে সমগ্র বিষয়টিকে ধী-দ্বারা বিচার না করেই ঐ সব মন্তব্য করেছেন।

বন্ধুবর ডঃ সনাতন গোস্বামী একটা মস্ত কাজ করেছেন। তিনি 'প্রসঙ্গঃ শ্রুতিনাটক' নামে এক গ্রন্থে বাংলা দেশের বহু পণ্ডিত, অভিনেতা-অভিনেত্রী প্রযোজক, নাট্যকার ও নাট্যকর্মীর শ্রুতিনাটক সম্পর্কিত মতামত একত্রিত কবেছেন। এতে শ্রুতিনাটকের নিষ্ঠ-সমর্থকের মতও যেমন আছে, ঠিক তেমনি আছে তীব্র-বিরোধী মত। আমরা আমাদের 'প্রমেয় সত্যে উপনীত হতে এই মতামতগুলি নির্বিচারে ব্যবহাব করেছি। এ সুযোগ সৃষ্টিব জন্য ডঃ গোস্বামী আমাব মত মফঃস্বলবাসী নাট্যকর্মীর কৃতজ্ঞতা অবশ্য পাবেন।

পুনরাবৃত্তি হলেও আবার বলি, যাদের মত আমরা বিরোধী বলে উপস্থিত করব এবং যাদেব মতামত আমরা খণ্ডন করব, তাদের মধ্যে অনেকেই আমার শ্রদ্ধাভাজন, অনেকে একান্ত পরিচিত, অনেকের অযাচিত স্নেহলাভে আমি

ধন্য। তাদের মতকে আমার উত্তপ্ত চিন্তার আক্রমণ বলেই বোধ হয়েছে। আক্রমণ করেছেন নিষ্ঠাহীন প্রযোজনা দেখে, অন্তরের একনিষ্ঠ সৎ নাট্য বোধকে আহত বোধ করে। এদের মতামতকে খণ্ডন করেছি। কিন্তু তা খণ্ডনের দ্বারা কোথাও তাঁদের প্রতি অশ্রদ্ধাপ্রকাশ আমার অভিপ্রায় নয়।

প্রথমেই আমি পার্থপ্রতিম চৌধুরীর মতামতের অংশ তুলে ধরছি। শ্রী চৌধুরী নাট্যব্রতী ও নাট্যমনস্ক মানুষদের কাছে পরিচিতনাম। তাঁর নাট্যবোধ বা এ সম্পর্কে সততা প্রশ্নাতীত। সম্ভবতঃ উল্লেখিত গ্রন্থে শ্রুতি-নাটক সম্পর্কে সবচেয়ে অসহিষ্ণু ও নিষ্ঠুর মন্তব্য করেছেন তিনি। লক্ষ্য করলে দেখবেন, তাঁর আক্রমণ যতখানি শ্রুতিনাটকের ওপর, তার চেয়ে বেশি তাঁর অভিজ্ঞতার প্রযোজনাগুলির ওপর—

> এই শ্রুতিনাটকও সেই ধান্ধাবাজী ব্যবসায়ী ছক এবং ধান্ধাবাজীরই ফসল। তাৎক্ষণিক সফল হলেও, আসলে এমন একটা পরিকল্পিত ফসল, যা মধ্যবিত্তীয় শিল্পচর্চায়, কম সময়ের জন্যও খাবে — মানে চলবে, চলে যাবে।— রবীন্দ্রসদনে শ্রুতিনাটক --যথেষ্ট বিজ্ঞাপন সহযোগে প্রচারিত হলেও একশোর বেশি দর্শক টিকিট কেটে ঢোকেন না। তা হলে, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণেই বলা যায়, যা চিরদিন চলতে আসে নি, তা চলে না — ইতিহাসে এ কথা বলে না।
>
> তদেব : পৃ - ৪০

এ মন্তব্য যে প্রচলিত কয়েকটি অনুষ্ঠানের রীতির বিরুদ্ধে সে কথা বলে দেবার অপেক্ষা রাখে না। তিনি ঐ সব প্রয়োগের বিরুদ্ধে ক্ষোভকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। শেষাংশে 'যা চিরদিন চলতে আসে নি, তা চলে না' মন্তব্যটি আপাতঃ শ্রুতিনাটক সম্পর্কে প্রোক্ত বলে মনে হলেও আসলে তা ঐ ধান্ধাবাজী প্রয়োজনা সম্পর্কেই।

বেতারের সঙ্গে সংযুক্ত কবিতা সিংহ। বেতার নাট্য-প্রযোজনাতে আমরা শ্রুতিনির্ভর নাট্যপ্রযোজনাই পাই। এ আঙ্গিক সম্পর্কে শ্রীমতী সিংহ যে ওয়াকিব, তা বলে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না। তাঁর মন্তব্যও আপাতঃ শ্রুতি-নাটক সম্পর্কে হলেও প্রকৃতপক্ষে ঐ ধরণের নাট্য প্রযোজনা সম্পর্কে।

> চোখের সামনে কাগজ বা বই ধরে পড়ে যাওয়া, মাঝে মাঝে আলটপকা ধ্বনি-সংযোগ, একটু আধটু আলোর ব্যবহার — সব মিলিয়ে, না-বেতার, না-সিনেমার এক হচ্পচ্ হ'ল শ্রুতি-নাটক। তদেব : পৃ - ৩৫

কোন এক নাট্যপ্রয়োজক কেমন ছেলেখেলা করে নাটক লিখিয়ে নিতে চেয়েছিল, তার কাহিনী বর্ণনে নাট্যকার কিরণ মৈত্র রূঢ় মন্তব্য করেছেন শ্রুতি-নাটক সম্পর্কে।

> শ্রুতি-নাটক আসলে কোন সৃষ্টিশীল ব্যাপার নয়। মঞ্চে, যাত্রায় (এমন কি বেতারেও) একটি নাটক প্রযোজনা করতে গেলে যে সুদীর্ঘ অনুশীলন করতে হয়, তার ভাবনা ও কঠোর পরিশ্রম করতে হয়, এই মাধ্যমকে তার কণামাত্রও করতে হয় না।
>
> তদেব : পৃ - ৩৫

নাট্যকার কিরণ মৈত্র এ মন্তব্য আন্তরিকভাবে করছেন, এমন বিশ্বাস করতে মন চায় না। কারণ মৈত্রমশাই-এর নাট্যবোধ সম্পর্কে আমার উচ্চ ধারণা আছে। তাঁর মন্তব্যটি ঐ ছেলেখেলা-করা প্রযোজক এবং তার প্রযোজনা সম্পর্কে তিক্ত মানসিকতারই ফলশ্রুতি। একটি ভাল শ্রুতিনাটক প্রযোজনায় যে কত অনুশীলন, ভাবনা ও পরিশ্রম করতে হয়, তা এ গ্রন্থের অন্য অধ্যায় গুলিতে পরিস্ফুট হবে। আলো, মঞ্চ তা অঙ্গসজ্জা, রূপসজ্জা কায়িক অভিনয় ইত্যাদি সহায়ক উপকরণাদির সহযোগে একটা নাটকাভিনয়ে যদি কঠোর অনুশীলন ও পরিশ্রম করতে হয়, যুক্ত করতে হয় গভীর ভাবনার সম্পদ—তবে এ-গুলি ব্যতিরেকে শুধু ধ্বনি-দ্বারা সেই ফল লাভ করতে গেলে যে তারও বহুগুণ অনুশীলন পরিশ্রম ও ভাবনা যুক্ত করতে হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ কি! শ্রুতি-নাটক কেন, ফাঁকিবাজি দিয়ে কোন রকম নাটক-প্রয়োজনাই হয় না।

এবার আমরা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস-প্রণেতা ও নাট্যতত্ত্ববিদ্ ডঃ অজিতকুমার ঘোষের মন্তব্য নিয়ে আলোচনা করছি। তিনিও প্রচলিত শ্রুতি-নাটক উপস্থাপন-রীতি দেখেই মন্তব্য করেছেন। তবে তাঁর মতামতে কোন অসহিষ্ণুতা নেই। বরং ঐ জাতীয় উপস্থাপনের সংশোধন বিষয়ে তিনি দুটি প্রকল্প পেশ করেছেন। এক. উপভোক্তারা যদি চোখ বন্ধ করে বসে থাকেন বা দুই. কোন যাদু বলে যদি অভিনেতা অভিনেত্রীদের অদৃশ্য করে দেওয়া যায়, তবে এগুলিকে তিনি শ্রুতিনাটক বলে মানলেও মানতে পারেন। নইলে, তাঁর প্রশ্ন—

> তথাকথিত শ্রুতি-নাটকের অভিনতা অভিনেত্রীরা সামনে খোলা বই নিয়ে পড়ছেন এবং কখনও অভিনয় করছেন, একে শ্রুতিনাটক বলা যায় কি?
>
> তদেব : পৃ - ১০

ডঃ ঘোষ শ্রুতি-নাটক সম্পর্কে যে আপত্তি তুলেছেন তা প্রধানতঃ অভিনেতা অভিনেত্রীদের চোখের সামনে উপস্থিত থাকা নিয়ে। সম্ভবতঃ তিনি বলতে চান যে, এর ফলে চোখে যা দেখছি এবং কানে যা শুনছি, দুয়ে বিরোধ ঘটে এবং উপভোক্তার তন্ময়তা ভগ্ন হয়। এমনি করে দর্শন ও শ্রবণ নিয়তঃ যেখানে দ্বন্দ্বমুখর সেখানে নাট্যরস জমতে পারে না। আর নাট্যরস না জমলে তাকে নাটক বলব কি করে?

ডঃ ঘোষের এ মন্তব্যের উত্তরে আমরা প্রথমে কথকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করব। কথকতায় কথকঠাকুরকে দেখা যায়। তিনি একবার রাধা একবার কৃষ্ণ একবার সখি হয়ে তার কথা বলেন। তিনিও শ্রুতি-নাটকের মত মঞ্চ, আলো, অঙ্গসজ্জা বা রূপসজ্জার সব কিছু ত্যাগ করেন, ত্যাগ করেন কায়িক-অভিনয়। অথচ কথকতা ত' বেশ উপভোগ করা যায়। সেখানেত' উপভোক্তাকে চোখ

খুঁজে অন্ধ সাজতে বা কথকঠাকুরকে অদৃশ্য হতে হয় না। আবার প্রশ্ন করা যায়, অভিনেতা অভিনেত্রীরা চোখের সামনে থাকলেও এ জাতীয় উপস্থাপনায় কি সত্যিই নাট্যরস জমে না! এ বিষয়ে আমরা দু জনের সাক্ষ্য তুলে ধরতে চাই।

প্রথম জন সাহিত্যের ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি প্রথমেই স্বীকার করেছেন, নাটক বিষয়ে তাঁর পূর্ব-সংস্কারও নেই। অর্জিত-সংস্কারও নেই। অর্থাৎ তিনি বিশেষজ্ঞ হিসাবে কোন মত পেশ করছেন না। শ্রুতিনাটকের একজন সাধারণ উপভোক্তা হিসাবে তিনি তাঁর অনুভবকে পেশ করছেন। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মস্বীকৃতিকে যদি ষোল আনা খাঁটি বলেই গ্রহণ করি অর্থাৎ ধরেই নিয়ে তাঁর কোন নাট্যবোধ নেই, তবু এ কথা ত' মানতেই হবে যে তিনি সাধারণ উপভোক্তাদের মধ্যেও কিঞ্চিত বিদ্যাবুদ্ধির অধিকারী। স্বভাবতঃ তাঁর অনুভব মননশীল হওয়া সম্ভব। তার মন্তব্যে এটুকু গুরুত্ব দেওয়া যায়। তিনি বলছেন,

> আমার উপলব্ধি বলছে, শ্রুতি নাটকও নাট্যরস সৃষ্টিতে সম্পূর্ণ সার্থক হতে পারে। অবশ্য কণ্ঠস্বর যদি যথাযথ হয়। সাহিত্যে কবি নাট্যকাররাই প্রধান নয়; আসল ব্যক্তি হচ্ছেন সামাজিক দর্শক ও শ্রোতা। তাদের স্বীকৃতি পেলে তবেই লেখার ব্যাপার মূর্ত হয়ে ওঠে। শিল্পের পরিণতি আসে ভোক্তার উপলব্ধির মধ্য দিয়ে, এবং সেই হিসাবে 'আমি' নামক সত্তাটি সাহিত্যের শেষ বিচারক, শেষ আপিল আদালত। শ্রুতিনাটক শুনে আমার রস-নিষ্পত্তি সম্পূর্ণ হয়েছে। সুতরাং আমি শ্রুতিনাটককে নাটক বলে গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি। তদেব : পৃ - ১৪

রস নিষ্পত্তির ব্যাপারে এবারে আমি সাক্ষ্য দিতে তলব করব ঊর্মিমালা বসুকে। তিনি কণ্ঠশিল্পী হিসাবে খ্যাত ও পরিচিত। শ্রুতিনাটক বিষয়ে তাঁর উৎসাহ এই আঙ্গিকের জন্মকালের একজন কর্মীর উৎসাহ হিসাবে প্রশংসা যোগ্য। যে কোন শিল্পীই প্রতি মুহূর্তে তাঁর সৃষ্টি উপভোক্তার মনে কি প্রতিক্রিয়া তুলছে তা বিচার করতে চান। সেইত' তার প্রয়োগের যাথার্থতা বিচারের কষ্টিপাথর। শ্রীমতী বসু সেই কষ্টিতে ঘষে যে অনুভব পেয়েছেন, তা অকপটে হাজির করেছেন আমাদের সামনে। তিনি ঠিক আলোচ্য প্রশ্নেরই জবাব দিচ্ছেন—

> এটা কখনও হয় নি যে, আমি একটা সতেরো বছরের মেয়ের কিংবা আশি বছরের বৃদ্ধার ভূমিকায় কণ্ঠাভিনয় করেছি, লোকে আমাকে accept করেনি। সামনে দেখা যাচ্ছে, দুজন তরুণ-তরুণী, অথচ অভিনয় করছে দুজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধার। এখানে কি illusion of realaity আসে? লোকে কি স্বাভাবিকভাবে নেয়? এখানে আমার উত্তর নেয়। এটা আমার অভিজ্ঞতা।

শিল্পী হিসাবে ঊর্মিমালা বসু তাঁর প্রবন্ধে শ্রুতিনাটকের শিল্পীর নাট্য প্রতিভার স্বরূপ ও তার দুর্গমতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি যথার্থই বলেছেন,

> মঞ্চনাটকে সাজসজ্জা করে রানীর ভূমিকায় নামলে আপনা থেকে (automatically) আমার সেই ভাবটা আসবে। অন্য উপকরণও আমাকে চরিত্র প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য

করবে—(because the costume, the whole thing is helping me) কিন্তু একটা পরিচারিকা হতে হতে শুধু গলার মাধ্যমে রানী হয়ে গেলাম, সেই সবটাই ফক্কিকারী? সেটা যে কত কঠিন, তা সুধীজন বলবেন বা বুঝবেন। সেটা কি সবটাই ফাঁকিবাজী, চোখভুলান jugglary? তদেব : পৃ - ২৩৪

ঊর্মিমালাদেবীর সাক্ষ্য আমাদের দুটি দিক থেকে সচেতন করে। আসিতবাবু কথিত 'কণ্ঠস্বর যদি যথাযথ হয়' তবে সামনে বই নিয়ে বসা নাট্যচরিত্র থেকে ভিন্ন রূপ অভিনেতা-অভিনেত্রীও illusion of reality সৃষ্টি করতে পারেন আর তাই তা দর্শক accept করে। আর, পোষাকাদির সুযোগে নাট্যচরিত্র সৃষ্টির সহজতর পন্থা পরিহার করায় নানা প্রতিকূল অবস্থাকে মান্য করে নাট্য চরিত্রের বিভ্রম সৃষ্টি অভিনেতা অভিনেত্রীর দিক থেকে কম শক্তি সামর্থ্যের পরিচায়ক নয়—তাকে কি ফক্কিকারী বলা যায়?

নতুন কোন বিশেষ দিক সম্পর্কে না বললেও আমরা প্রবীন নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্তের মন্তব্য উদ্ধার না করে পারছি না। তিনি ১৯২৯ সাল থেকে নাট্য-জগতের সঙ্গে ওতঃপ্রতো ভাবে জড়িয়ে আছেন। তিনি একাধিক সফল মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের স্ক্রীপ্ট রচনা করেছেন ও পরিচালনা করেছেন। দীর্ঘকাল করেছেন রবীন্দ্রভারতীর নাট্য-বিভাগের অধ্যাপনা। নাট্য-চিন্তার আধুনিকতম বেদ তাঁর জানা আছে। এ জন্য তাঁর মতামত প্রণিধানযোগ্য।

প্রথমেই তিনি শ্রুতিনাটক নামটিতে আপত্তি তুলেছেন। তাঁর অভিমত এ নাম ব্যাকরণ-দুষ্ট। হওয়া উচিত 'শ্রুত-নাটক'। দ্বিতীয়তঃ তাঁর মতে শ্রুতি-নাটক নবীন কিছু নয়। কারণ আমাদের দেশের 'কথকতা' এজাতীয় এক প্রাচীন নাট্যআঙ্গিক। কাণ্ঠ্য রূপায়ণ প্রসঙ্গে তিনি কণ্ঠযাদুকর বীরেন্দ্র ভদ্রের গদ্য-পাঠের প্রশংসা করেছেন। কিন্তু তার পরেই অত্যন্ত বিরূপ মন্তব্য করেছেন শ্রুতিনাটক সম্পর্কে।

মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের নামীদামী শিল্পীকে নিয়ে শ্রুতিনাটক করানো হচ্ছে। ব্যাপারটা মূলতঃ গ্ল্যামার নির্ভর কমার্শিয়াল ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বলতে গেলে এটা শিল্পের কোন কিছু নয়। একটা যৌথশিল্প সৃষ্টি করতে গেলে যে উপকরণ প্রয়োজন - শ্রুতিনাটকে তা নেই। এটা যেন individual একটা কিছু। কারো সঙ্গে কারো মেলেনা। তদেব : পৃ - ৬-৭

লক্ষ্য করে দেখুন, প্রবীন মানুষটি শ্রুতিনাটকের মৌল চরিত্র সম্পর্কে কোন মন্তব্য উদ্ধৃতাংশে করেন নি। তার সমগ্র মন্তব্য নামীদামী শিল্পীদের নিয়ে করা অনুষ্ঠান সম্পর্কে। সত্যিই সেখানে কারো সঙ্গে কারো মেলে না। কারণ, পর্যাপ্ত যে মহড়া ঐ মেলবন্ধন গড়ে তোলে, এ সব নাঠ্য উপস্থাপনার পিছনে তা থাকে না। কোন শিল্পপ্রয়াসেই অপ্রস্তুত অবস্থায় হতে পারে না। এতদূর পর্যন্ত শ্রীগুপ্তকে আমরা সমর্থন করি। এই Individual performance এর বিষয়টি পার্থপ্রতিমবাবুও আক্রমণ করেছেন।

> আমার কাছে তাই আমার (?) সামগ্রিক চর্চা ও শিল্প সম্ভোগের মাটি মাসুরে 'শ্রুতি নাটক' এক অলস কালবেলায় কবিতা পোড়ানর উৎসব ছাড়া আর কিছুই নয়।
>
> তদেব : প - ৪২

প্রস্তুতি-শূন্য ঐ সব প্রয়াস ত' শ্রুতি-নাটকের অপ-উপস্থাপনা। তাকে এই আঙ্গিকের চূড়ান্ত রূপ ভাবাতেই পূর্ব-সংস্কার সম্পন্ন সুধীজন ভ্রান্ত্যাত্মক দর্শন (mal-observation)-এর দোষে দুষ্ট হয়েছেন। এরই ফলে প্রাজ্ঞ দেবনারায়ণবাবু সিদ্ধান্ত টানেন,

> শ্রুতিনাটকের কোন নিজস্ব রীতি আছে কি? আমার উত্তর—না! আর এর ভবিষ্যৎ কি? এ নিয়ে যদি কেউ আমায় প্রশ্ন করেন, তা হলে উত্তরে বলব— যার ভূত ছিল না, তার আবার ভবিষ্যৎ কি? তদেব : পৃ - ৭

অনুরূপ প্রশ্ন পার্থপ্রতিমবাবুও তুলেছেন—

> শ্রুতি নাটক আবার কি? তার চরিত্র কি? তার পরিবেশনগত পরিবেশ কি? কেউ এর জবাব দিতে পারবে না সঠিকভাবে। তদেব : পৃ - ৮

পার্থপ্রতিমবাবুর এ মন্তব্যের পিছনে যথেষ্ট তথ্যের সমর্থন আছে বলে মনে হয় না। কারণ কলকাতাতে যারা শ্রুতিনাটক চর্চা করছেন, তাদের অনেকেই ওঁর এ সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন। অধিক কি, উষ্মা ত্যাগ করে নতুনকে ধীরভাবে বিচার করলে উত্তরগুলো নিজ মনেই না পাবার মত কম ধীসম্পন্ন মানুষ তিনি নন বলেই আমার বিশ্বাস। এসব প্রশ্নের উত্তরে এ গ্রন্থের পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে দেবার চেষ্টা করেছি।

ডঃ সূর্য সরকার নাট্যকার ও বেতারনাট্য পরিচালক। তিনি বেতার নাটককেই যথার্থ শ্রুতিনাটক বলে বিশ্বাস করেন। অর্থাৎ বেতারে যে নাটক পরিবেশিত হয়, তা শ্রুতিনাটক—কিন্তু মঞ্চে উপস্থাপিত হলে তা শ্রুতিনাটক নয়। তাঁর এই চিন্তায় প্রকারান্তরে 'শ্রুতিনাটক' এর অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে। মঞ্চে উপস্থাপিত হলে তা শ্রুতিনাটক কি না, সেটা স্বতন্ত্র প্রশ্ন। সে প্রশ্নের অনেকখানি জবাব ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও উর্মিমালা বসুর ভাষ্যে দেওয়া আছে। সে যাই হোক, আমরা এখানে ডঃ সরকারের পরবর্তী বক্তব্যকে বড় করে ধরছি। তিনি শ্রুতিনাটকের সীমাবদ্ধতা দেখাতে নায়ক-নায়িকা ও ভিলেনের এমন এক ঘটনাকে তুলেছেন যার শব্দময়তার চেয়ে দৃশ্যময়তা বেশি। এমন কি ঘটনাটিকে দৃশ্যময় বললেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি দৃশ্যটি শ্রুতিনাটকের প্রবক্তাদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ঐ দৃশ্য প্রয়োজনার সম্ভাব্যতা অস্বীকার করেছেন। কিন্তু, এই যুক্তির মধ্যে ফাঁক রয়েছে। আবার এর দ্বারা শ্রুতি নাটকের একটা সীমাবদ্ধতাকেও চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখান হয়েছে।

জীবনের যে কোন ঘটনাকেই শ্রুতিনাটকে ধরা যায় না। যা শুধুই দৃশ্য—তাকে কি করে ধরবে শ্রুতিনাটক? তাই শ্রুতিনাটকের জন্য বিষয় নির্বাচন করতে হয়। যে ঘটনাবলীতে শব্দময়তা কম—তা যোগ্যভাবে

শ্রুতিনাটক ধরতে পারে না। ঐ জাতীয় ঘটনাকে রূপায়ণের ভাষা ও কৌশল আজও আবিষ্কার করতে পারে নি। কিন্তু ভবিষ্যতেও পারবে না, এমন কথা বলা যায় কি? আর, সূর্যবাবু, আপনিত' বেতারনাটককে যথার্থ শ্রুতিনাটক বলেছেন। তা কি পারবে আপনার ঐ দৃশ্য রূপ দিতে? যদি না পারে, তবে বেতারনাট্যকে আপনি কি বলবেন? আর বেতারনাট্য যদি পারে, তবে মঞ্চে শ্রুতিনাটকই বা পারবে না কেন?

ডঃ সত্যব্রত দে 'জয় হোক নবজাতকের' নামক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে মূলতঃ শ্রুতিনাটককে সমর্থন করেছেন। অথচ সেই মানুষটিই মন্তব্য করেন,

> এই অভিনয়ের উদ্ভব এক হিসাবে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাবার উদ্দেশ্যে, পূর্ণাঙ্গ অভিনয় ব্যয় সাপেক্ষ। অনেক সময় অপেশাদার নাট্যমোদীদের পক্ষে সেই ব্যয়ভার সংগ্রহ করে ওঠা সম্ভব হয় না। সেই সব আয়োজনের সময় ও সুযোগেরও হয়ত অভাব থাকে। তদেব : পৃ - ৯৯

এই মন্তব্য থেকে মনে হয় ডঃ দের মনে শ্রুতিনাটকের সামগ্রিক রূপটি ধরা পড়েনি। আমাদের পাঠক ঊর্মিমালা বসুর বক্তব্যের প্রতি আবার লক্ষ্য করুন। তার বক্তব্য আমাদের নিম্ন বর্ণনার সমার্থক হবে। আসলে একটি নাটক মঞ্চস্থ করে আমার উপভোক্তার মনে যে রসসৃষ্টি করতে চাই, একটা শ্রুতিনাটক মঞ্চস্থ করেও আমরা সেই নাট্যরসই সৃষ্টি করতে চাই এজন্য নাটকও শ্রুতিনাটককে দুধ ও ঘোলের সঙ্গে তুলনা করা হয়ত উচিত নয়। এ কথা সত্য যে শ্রুতিনাটক মঞ্চায়নের জন্য মঞ্চ আলো সাজসজ্জা এমন কি কায়িক অভিনয়কে বাদ দিতে হয়। এজন্য আপাতঃভাবে অর্থ ও সময় কম লাগে বলে মনে হয়। কিন্তু বস্তুতঃই কি তাই? আলো-মঞ্চ-সাজসজ্জা ও কায়িকাভিনয় বাদ দিয়ে শুধু ধ্বনি দিয়ে সমফলোৎপত্তি করতে গেলে কত নিপুণ অধ্যাবসায় শ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে সুপরিকল্পনা মেশাতে হয়, তা কি ডঃ দে ভেবেছেন? আর কাণ্ঠ্য-অভিব্যক্তিকে যোগ্য আবহ ও অন্যান্য ধ্বনি দিয়ে পূরণ করে একদিকে নিটোলতা আনতে ও অন্যদিকে ঐ অভাবগুলোকে ঢেকে দিতে কি পরিমাণ চিন্তা, পরিকল্পনা ও সেই পরিকল্পনা অনুসারে শব্দ সংগ্রহের ব্যয় সম্পর্কে অনুমান করেছেন কি? সূর্যবাবু হয়ত' বলতে পারবেন শব্দ সংযোজনে নানা যন্ত্র ব্যবহার করে উপযুক্ত শব্দাত্মক রেকর্ড করে নিতে ব্যয় কত! একমাত্র রেকর্ড করে নিলেই আমরা যথাসময়ে তা নাটকে প্রযুক্ত করতে পারি। আসলে শ্রুতিনাটক নাটকের বিকল্প নয়— তা এক সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিক-রীতি।

শ্রুতিনাটকের এই স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা গড়ে না তোলায় পণ্ডিত অধ্যাপক ডঃ চিত্তরঞ্জন লাহাও নাটকের সঙ্গে শ্রুতিনাটকের তুলনা করতে গিয়ে শ্রুতিনাটক সম্পর্কে হীনাত্মক মন্তব্য করেছেন।

শ্রুতিনাটকে সংলাপই সব সময় কিন্তু সর্বেসর্বা এবং স্বাধিকারপ্রমত্ত। একাধিক চরিত্রের দ্বন্দ্ব সংঘাতেই সংলাপের বুকে ভরে নাট্যরসের মধু। শ্রুতিনাটকের সংলাপ সেই সংঘাত মুখর পথ-পরিক্রমায় নিতান্তই এক পঙ্গু পথিক।

তদেব : পৃ - ৩৭

ডঃ লাহা মন্তব্য করেছেন, প্রমাণ দেন নি। শ্রুতিনাটকে সংলাপের প্রাধান্য থাকতে পারে। কারণ সংলাপ দৃশ্য নয় ধ্বনি। কিন্তু তাকে স্বাধিকারপ্রমত্ত বলছেন কেন? শ্রুতিনাটকে সংলাপ কি প্রয়োজনাতিরিক্ত ভাবে ব্যবহার করা হয়? তাকি তার প্রমেয় কাজের অতিরেকে যুক্ত হয়? যদি কোন ক্ষেত্রে তা হয়েও থাকে, তবে তা নাট্যরীতির দুর্বলতা না নাট্যকারের? আর শ্রুতি-নাটকের সংলাপ পঙ্গু পথিক কেন? সে কি চারিত্রিক দ্বন্দ্ব ফোটাতে পারে না? যদি নাই পারে তবে সে দুর্বলতার দায় কার? নাট্যরীতির না নাট্যকারের?

ডঃ লাহার মতে শ্রুতিনাটকে নাটকীয়তা আসে না। তিনি স্পষ্টই লিখেছেন,

বেতারে শ্রুতিনাটক যান্ত্রিক কলা কৌশলের মাধ্যমে কিছুটা নাটকীয় চরিত্র অর্জনে কশ্চিত কখনো সক্ষম হলেও মঞ্চে কিন্তু ব্যাপারটা আবৃত্তি নাটকের মাঝামাঝি কিছু হয়। মাঝামাঝি শব্দটার মধ্যেও অতিশয়োক্তি আছে। কেন না ঝোঁকটা আবৃত্তির দিকেই বেশি। তদেব : পৃ - ৩৭

ডঃ লাহার এই মন্তব্যের তাৎপর্য পরিস্ফুট হয়নি আমার কাছে। আমার মনে হয়েছে তিনি দুটি পৃথক তথ্য স্থাপন করতে চেয়েছেন।

এক. বেতার নাটকে যান্ত্রিক কলাকৌশল প্রয়োগের সুযোগ থাকায় কশ্চিত নাটকীয়তা ফুটে ওঠে অর্থাৎ বেশির ভাগ সময় নাটকীয়তা ফোটেই না। মঞ্চের শ্রুতি-নাটকে ঐ যান্ত্রিক কলা কৌশলের সুযোগ না থাকায় নাটকীয়তা ফোটে না।

দুই. মঞ্চে শ্রুতিনাটকে নাটকীয়তা না ফোটার আর এক কারণ এই ক্ষেত্রে যে স্বররীতি বরণ করা হয় তা যতখানি নাটকাভিনয়ের উপযোগী, তার থেকে অনেক বেশি আবৃত্তি-মুখ্য।

আমার এই অর্থ বোধ যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে প্রথম সূত্রের সম্পর্কে আমাদের চিন্তা এই যে বেতারনাট্যে যে যান্ত্রিক সুযোগ ব্যবহার করা যায়, তা মঞ্চের শ্রুতিনাটকের ক্ষেত্রে ব্যবহার না করতে পাবার পক্ষে কি প্রকৃত বাধা থাকতে পারে? আর ঐ যান্ত্রিক সুযোগ ব্যবহার করেও বেতার শ্রুতি-নাটক 'কশ্চিৎ কখনো' সক্ষম হয়, একথা, আমার কথা ছেড়েই দিন, শ্রুতি নাটকের প্রকাণ্ড বিরোধীরাও কি মানবেন?

দ্বিতীয় সূত্র সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে, সত্যিই যদি শ্রুতিনাটকের অভিনেতা অভিনেত্রীরা নাটকের কণ্ঠাভিনয়ে নাটকের সংলাপ বলার রীতি বাদ দিয়ে আবৃত্তিধর্মী উচ্চারণ করেন— তবে তা ধিক্কার দেবার যোগ্য। এমন অভিনেতা অভিনেত্রীর মনে শ্রুতিনাটক সম্পর্কে বোধ অস্পষ্ট। শ্রুতিনাটক

নাটকই—আবৃত্তি নয়। আবৃত্তিধর্মী উচ্চারণ যারা করছেন, দোষ তাদেরই—শ্রুতিনাটকের নয়।

ডঃ লাহা শ্রুতিনাটক সম্পর্কে অতি প্রচলিত একটি ধারণাকে নিজ ধারণা বলে স্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন,

> নাটকপাঠ ও শ্রুতিনাটক শোনার মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। যুগপৎ চক্ষু ও কর্ণকে পরিতৃপ্ত করার যে ঐকান্তিক আগ্রহে নাটকের সৃষ্টি ও উল্লাস, শ্রুতিনাটক সে বাবদে একচক্ষু হরিণ। দর্শককে সে শ্রোতার আসনে টেনে নামাতে বদ্ধ পরিকর। তদেব ঃ পৃ - ৩৭

এই উদ্ধৃতিকেও দুটি সূত্রে বিভক্ত করা যায়।

এক. নাটক পাঠও শ্রুতিনাটক শোনার মধ্যে খুব বেশি পাথক্য নেই।

দুই. শ্রুতি নাটক দর্শককে শ্রোতার পরিণত করছে।

দ্বিতীয় সূত্র সম্পর্কে আমাদের কোন আপত্তি নেই। বরং মনে হয় ডঃ লাহা এ বিষয়ে যেটুকু দ্বিধা রেখেছেন, তা বর্জনীয়। শ্রুতিনাটক মঞ্চায়নের সময় অভিনেতা-অভিনেত্রী এমনকি যন্ত্রীদেরও গীতিনাট্য বা গীত আলেখ্য মঞ্চায়নের মত দেখা যায়। এটা কোথাও কোথাও উপভোগে বাধা। ডঃ অজিত ঘোষ এ বাধাকে বড় করে দেখেছেন। এটুকু দর্শনীয়ও বর্জিত হোক এ তার অভিমত। কিন্তু শ্রুতি নাটকের শিল্পী ও যন্ত্রীরা এই প্রতিকূলতাকে মান্য করেই মঞ্চে নেমেছেন। বস্তুতঃ শ্রুতিনাটকের উপভোক্তা শ্রোতা মাত্র—দর্শক নন। সংগীত, আবৃত্তি ইত্যাদি কণ্ঠনির্ভর শিল্প আঙ্গিকের উপভোক্তাও শ্রোতা মাত্র—দর্শক নন। এখানে 'বদ্ধপরিকরতা'র কোন প্রশ্ন নেই। এটা শ্রুতি নাটকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

ডঃ লাহা প্রথম সূত্রে নাটকপাঠ ও শ্রুতিনাটককের ফলশ্রুতিতে কোন পার্থক্য দেখেননি। কিন্তু চালভাজা এবং মুড়ি যেমন এক নয়, ছাতু এবং বেশন যেমন এক নয়, অথচ তাদের মধ্যে সমতা অনেকখানি, নাটকপাঠ ও শ্রুতি-নাটকের মধ্যেও মিল ও পার্থক্য অনুরূপ। অনেক নাট্য-প্রযোজক দ্রুত মঞ্চায়নের জন্য সার্বিক প্রস্তুতি না করেই শ্রুতিনাটক মঞ্চস্থ করতে গিয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সামনে স্ক্রীপ্ট ধরে দেন। এ থেকেই নাটক-পাঠ ও শ্রুতিনাটকের মধ্যে সমতা পরিস্ফুট হয়। কিন্তু এটাত' শ্রুতিনাটকের খাঁটি রীতি নয়। আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চে দ্রুত নাটক মঞ্চস্থ করবার জন্য প্রযোজকেরা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পার্ট মুখস্থ করতে দেবার অবকাশ পেতেন না। তাদের প্রম্পটারের ওপর নির্ভরতা শেখান হত। কিন্তু আধুনিক নাট্যচিন্তায় এ নীতি সম্পূর্ণ বর্জিত হয়েছে। কোথায় যেন পড়েছিলাম যে স্টানিসলাভস্কি পার্ট বলাটাকে এতদূর স্বতঃস্ফূর্ত ও অভ্যস্থ করাতেন যে শিল্পীরা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে একটা টেনিশ বল ছোঁড়া ও লোফালুফি করতে

করতেও কাণ্ঠ্য অভিব্যক্তি-সহ পরপর কণ্ঠাভিনয় করে যেতে পারতেন। আধুনিক নাট্য-প্রয়োজকেরা পার্ট মুখস্থ করাকে মঞ্চে নামার প্রথম শর্ত বলে মনে করেন। শ্রুতিনাটকের ক্ষেত্রেও এ রীতি মানতেই হবে। এটাই প্রকৃতরূপ। আসলে কলকাতার শিল্পীরা সিনেমা অভিনয় ও বেতার অভিনয় রীতির প্রভাবে পড়েই সামনে স্ক্রীপ্ট রাখেন। এটা সর্বথ বর্জনীয়। যে শিল্পী মুখস্থ করবার শ্রম স্বীকার করতে রাজী নন—তিনি যত খ্যাতই হন না কেন, তিনি শিল্পাঙ্গিকটির জাত মারছেন। মঞ্চায়নকালে স্ক্রীপ্টের দিকে যদি মন পড়ে থাকে তবে কখনই ষোলআনা শক্তি দিয়ে কাণ্ঠ্য-অভিব্যক্তি আনা যায় না। শিল্পীরা যেদিন সামনে স্ক্রীপরাখা বর্জন করবেন, সেদিন থেকে শ্রুতিনাটককে নাটকপাঠের গোত্রীয় ভাবা বন্ধ হবে।

এই বিষয়টিকে আরো একদিক থেকে ভাবা যেতে পারে। নাটকপাঠে আমরা উপভোক্তার কাছে নাটকের আভাস ও সম্ভাবনা তুলে ধরতে চাই মাত্র। নাট্যরসের সামগ্রিকতা সেখানে থাকে না। কখনও নাটকপাঠ কালে একজনই সব চরিত্রের সংলাপ অভিনয় করেন। কখনও একাধিক ব্যক্তি একাধিক সংলাপ বলেন। কোথাও বা দৃশ্য বর্ণনাও (Stage-direction) পাঠ করা হয়। কিন্তু সঙ্গীত সংগতাদি ও শব্দ-সংযোজন দ্বারা নাটকের সামগ্রিক রূপ পরিস্ফুটনের আকাঙ্খা দেখা যায় না। অর্থাৎ নাট্যপাঠকে কখনই শ্রুতিনাটকের সমতুল্য বলা যায় না।

শ্রুতিনাটকের চিন্তাটা কিন্তু আধুনিক কালের নয়। আমরা ইতিহাসের দিকে তাকালে অন্ততঃ একটি প্রযোজনার সংবাদ পাই যা শ্রুতিনাটকের সমতুল্য। আয়োজনটি করেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। তাঁর একটি নাটক তিনি শ্রুতিনাটকের রীতিতে মঞ্চস্থ করেন। জানি না, সেদিন শিল্পীরা সামনে পাণ্ডুলিপি রেখেছিলেন কিনা, তবে তারা যে কায়িক অভিনয় ও সাজসজ্জা ব্যতিরেকে মঞ্চায়ন করেন, তার পরিচয় পাওয়া যায়। তারা নাম দেন 'অভিনয়িক পাঠ'। তবু যে আমরা একে শ্রুতিনাটকের সমতুল্য বলছি, তার কারণ পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ নাট্যভাব পরিস্ফুটনে পাঠের সঙ্গে 'সঙ্গীত ও ভাবাত্মক সঙ্গত' যুক্ত করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ, শিশিরবাবু বা শম্ভুবাবুর যে সব নাটক পাঠের কথা কিংবদন্তীর মত ছড়িয়ে আছে, ব্যক্তিশক্তির প্রকাশে সেগুলি উপভোক্তাকে যত চমৎকৃতই করে থাকুক না কেন, সেগুলি নাটকপাঠ মাত্র—তা নাটকাভাষ। সমগ্র নাট্যভাবকে শুধু শ্রুতিমাধ্যমে শাব্দিক প্রয়োগ সম্পূর্ণ করবার আকাঙ্খা ঐ সব পাঠে ছিল না।

পূর্বোক্ত গ্রন্থে অনেকেই প্রচলিত মঞ্চনাটকের নানা অঙ্গের অনুপস্থিতির দরুণ শ্রুতিনাটককে নাটক বলে মানতে চান না। আমরা এ মতের সমর্থক নই। মঞ্চ-আলো-সেট-রূপসজ্জা-পোষাকাদি দ্বারা আমরা মঞ্চ-নাটককে

জীবন্ত করে তুলি। উপভোক্তা ঐ সব সহযোগে নাট্যরসকে উপভোগ করেন। লক্ষ্য করুন, মঞ্চ আলো সেট রূপসজ্জাদি কিন্তু নাটক নয়—নাট্যরসও নয়। ওগুলি নাট্যরস উদ্বোধনের সহায়ক—উপলক্ষ্য মাত্র। নাটকের লক্ষ্য মঞ্চও নয় আলো, সেট, রূপসজ্জাও নয়—নাটকের লক্ষ্য নাট্যরস। যদি কোন নাট্যদল ওগুলি ব্যতিরেকেই নাট্যরসের উদ্বোধন করতে পারেন, তবে তাকে ঐ উপলক্ষ্য গুলি না থাকার অজুহাতে নাটক আখ্যা থেকে বঞ্চিত করবার কোন যুক্তি থাকতে পারে কি? তাতে কি মানুষের চাইতে মানুষের পোষাকের মূল্য বেশি দেওয়া হয়ে যাবে না?

কেউ কেউ একে শাস্ত্রবহির্ভূত বলেই নাটক বলে মানতে চান না। এ কথা ঠিক যে প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য কোন নাট্যশাস্ত্রেই নাট্যরস উদ্বোধক উপকরণগুলি বর্জন করে নাটক মঞ্চস্থ করার কেন ব্যবস্থা অনুমোদন করেন নি। এজন্য অনেকে একে শাস্ত্রীয়-সমর্থনশূন্য অন্ত্যজ বলে মনে করেন। তাঁদের এ বক্তব্যকে খণ্ডন করবার যুক্তি আমাদের নেই। কেউ শাস্ত্রকেই চূড়ান্ত বলে মেনে যদি শ্রুতিনাটকের দিকে পিছন ফিরে কান বন্ধ করে রাখেন, আমাদের তখন, করবার কিছু থাকবে না। শ্রুতিনাটকের আপন শক্তি যৌবন প্রাপ্ত মহিমায় বিকশিত হলেই, এ সব আপত্তি দূরীভূত হবে।

তবে ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রবিদ্ ভরত নাট্যশিল্পের বিবর্তনের ধারায় অনাগতকালে যে সব রীতির উদ্ভব হবে তার নান্দীপাঠ নিজ গ্রন্থে করে গেছেন। তিনি লিখেছেন,

এবং নাট্যপ্রয়োগে বহু বহু বিহিতং কর্মশাস্ত্রপ্রণীতম্।
নপ্রোক্তং যচ্চ লোকাদনুকৃতিকরণং তচ্চ কার্যং বিধিজ্ঞৈঃ।

(এভাবে নাট্যপ্রয়োগে শাস্ত্রপ্রণীত বহু বহু কাজ এবং বিধিনিষেধ বর্ণনা করা হ'ল। যা বলা হল না, যা বাদ পড়ল, তা যারা নাট্যকলাবিদ, নাট্যশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, তারা জগৎ যেমন চলবে তার অনুকরণে প্রয়োগ করবেন।)

অর্থাৎ, ভরত ঐ সুবৃহৎ নাট্যশাস্ত্র প্রণয়ন করেও তাকেই চূড়ান্ত বলে মানেন নি। ভারতীয় কোন শাস্ত্রবিদই এমন চূড়ান্ত কথা বলতে চান না। যুগ বদলাবে, পৃথিবী বদলাবে অথচ তার শাস্ত্রের নির্দেশ চূড়ান্ত কথা বলে থেমে থাকবে — এত বড় অবৈজ্ঞানিক বিবর্তন-বিরোধী চিন্তা ভরতেরও ছিল না। তিনি আগামী দিনের সব রীতির উদ্ভাবন সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত রেখেছিলেন। শ্রুতিনাটক ভরত অভিনন্দিত সেই ভবিষ্যৎ সম্ভবনার ফসল। শাস্ত্র-বিশ্বাসীরা এ বিষয়টি চিন্তা করবেন, এই নবজাত শিল্প রীতিটিকে শাস্ত্রানুমোদিত নয় বলা কতখানি সঙ্গত!

ব্রেখটের নাটক পাশ্চাত্য নাট্যশাস্ত্রের প্রায় কোন 'ইউনিটি'- থিওরিকেই মানে নি। কিন্তু তাতে যেমন দর্শকের নাট্যরস গ্রহণে বাধা জন্মে নি— সারা বিশ্বে ব্রেখট সমাদৃত— তাঁর রচনাকে কেউ নাটক নয়ও বলতে সাহস পাচ্ছেন

না। শাস্ত্রকে অস্বীকার করেও যদি ব্রেখটের নাটক নাটক—হিসাবে অভিনন্দিত হতে পারে, তবে শ্রুতিনাটক এমন কি অভাজন যে তাকে নাট্য-পদবী থেকে বঞ্চিত করা হবে?

'শ্রুতিনাটক' সম্পর্কে আর এক ধরণের আপত্তি তার নামে। এই আপত্তি কারকদের মধ্যে আছেন শ্রদ্ধেয় নাট্যকার মন্মথ রায়। তিনি শ্রুতিনাটকের নাটকত্ব অস্বীকার করেননি। কিন্তু একে ভিন্ন নামে অভিহিত করতে চেয়েছেন। তিনি এ জাতীয় নাট্যরীতিকে 'বৈঠকী-নাটক' বলে অভিহিত করতে চেয়েছেন।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গীয় শব্দকোষে' বৈঠকী শব্দটির অর্থ লিখেছেন বৈঠক খানার যোগ্য, মজলসী। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস 'বাঙলা ভাষার অভিধানে' লিখেছেন 'বৈঠক করিবার, মজলিস করিবার বা বসিবার যোগ্য।' এই অর্থ গুলির মধ্যে কোনটি এই জাতীয় নাট্যরীতির বৈশিষ্ট্যকে সূচীত করতে পারে? আপাতঃভাবে একমাত্র 'মজলিসী' অভিধাকে নির্বাচন করা যায়। শব্দটি আরবী মূল। আরবী ভাষায় মজলিসী শব্দের অর্থ সামাজিক বা Social বলে জানিয়েছেন হরিচরণ বন্দ্যোপধ্যায়। এ অর্থেও কেউ শ্রুতিনাটককে 'বৈঠকী নাটক' বলে গ্রহণ করতে রাজি হবেন বলে মনে হয় না।

'শ্রুতিনাটক' শব্দটির উদ্ভাবক কে তা জানি না, তবে আমার মনে হয় তাঁর নামকরণ যথার্থ হয়েছে। ব্যক্তির নামকরণ বা স্থানের নামকরণের চেয়ে বস্তু বা বিষয়ের নামকরণের বৈশিষ্ট্য আছে। ব্যক্তি বা স্থানের নাম প্রায়শ চরিত্রদ্যোতক হয় না। কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন হতে পারে। কিন্তু বস্তু বা বিষয়ের নামে আমরা তার চরিত্র বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে চাই। এই জাতীয় নাট্যচর্চার বৈশিষ্ট্য এই যে এ নাটক উপভোক্তার শ্রুতিতেই আবেদন রাখতে চায়—অন্য ইন্দ্রিয়ের কাছে নয়। আবার শ্রুতিনাটক উপস্থাপনায় রয়েছে ধ্বনি-সর্বস্বতা। অর্থাৎ শ্রুতিময়তা। এ কারণে শ্রুতিময়তা এবং নাটকত্ব হচ্ছে এর প্রধান চরিত্র বৈশিষ্ট্য এ জন্য শ্রুতি এবং নাটক শব্দ দুটি সমাসবদ্ধ করে 'শ্রুতি সর্বস্ব যে নাটক' অর্থে শব্দটি সৃষ্টি হয়েছে। শব্দটি ব্যাকরণগত ভাবে শুদ্ধ এবং শ্রুতিনাটকের বৈশিষ্ট্যকে বঞ্চিত করেছে বলে আমরা এ নামটিতে আপত্তি দেখি না।

এ কারণেই আমরা 'নাটক-পাঠ', 'বৈঠকী-নাটক', 'মজলিসী-নাটক' ইত্যাদি নাম বাতিল করে 'শ্রুতি-নাটক' নামটিই গ্রহণ করলাম।

২

শ্রুতিনাটকের স্বরূপ ও সম্ভাবনা

প্রথম অধ্যায়ে আমরা শ্রুতিনাটক সম্পর্কে নানা সংশয়াত্মক প্রশ্নের মীমাংসা করেছি এবং এই প্রসঙ্গে আলোচনা ক্রমে শ্রুতিনাটক সম্পর্কে আমাদের বোধকেও তুলে ধরেছি। তবু মনে হয় সংশয় নিরপেক্ষভাবে স্পষ্টাকারে এই ধারণা ব্যক্ত করা দরকার। কারণ আমাদের মনে আছে, পার্থপ্রতিমবাবুর মত নাট্যামোদী ব্যক্তিও তীব্রস্বরে বলেছেন,

> শ্রুতি নাটক আবার কি? তার সংজ্ঞা কি? তার চরিত্র কি? তার পরিবেশনগত পরিবেশ কি? কেউ এর জবাব দিতে পারবে না সঠিকভাবে।
>
> তদেব : পৃ - ৪০

আমাদের ক্ষুদ্র সামর্থ্যে প্রশ্নগুলির জবাব দেবার চেষ্টা করা যাক।

শ্রুতিনাটকের সংজ্ঞা

যে কোন বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই সে বিষয়ের একটি সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করা দরকার। শ্রুতিনাটকের কি কোন সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করা যায়? তর্কবিদ্যায় বলেছে কোন বিষয়ের উপজাতিগত ও জাতিগত বৈশিষ্ট্য একত্রিত করলেই সংজ্ঞা নিৰ্দ্ধারিত হয়। তা হলে দেখা যাক শ্রুতিনাটকের জাতিগত বৈশিষ্টাই বা কি, আর উপজাতিগত বৈশিষ্টাই বা কি?

শ্রুতিনাটক জাতিগত বিচারে নাটক। তা যে কবিতা, বা প্রবন্ধ বা উপন্যাস নয়— তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। তবে যে কোন নাটকই যে শ্রুতিনাটক নয়, তাও অনস্বীকার্য। যাত্রা বা মঞ্চনাটক, পোস্টার নাটক বা থার্ড থিয়েটারের নাটক থেকেও শ্রুতিনাটক বিশিষ্ট। এ বৈশিষ্ট্য কি? অন্য যে কোন নাটকই দর্শনপ্রধান এবং গৌণতঃ শ্রবণের। কতখানি দর্শনের এবং কতখানি শোনার তা নিয়ে জটিল তর্কে মেতে ওঠা যায়। কিন্তু এখানে তার প্রয়োজন নেই। কারণ শ্রুতিনাটক এদের থেকে এখানেই স্বতন্ত্র যে সে উপভোক্তার দর্শন ও শ্রবণ উভয়কে একত্রে তৃপ্ত করতে চায় না। সে শুধু মাত্র শ্রাবণিক আয়োজন করে নাট্য রসোপভোগের আনন্দ বিতরণ করতে চায়। অর্থাৎ শ্রুতিসর্বস্বতাই তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। শুধু শ্রাবণিক আয়োজন করে নাট্যে রসোপভোগ সম্ভব কি না সেটি স্বতন্ত্র প্রশ্ন। সে বিষয়ে পরে মীমাংসা করা যেতে পারে। এখন আমরা সম্ভাব্যতার প্রশ্ন না তুলে এমন একটা সংজ্ঞা নিৰ্দ্ধারণ করতে পারি

যে, 'যে নাট্য ব্যবস্থাপনা শুধু মাত্র শ্রুতি মাধ্যমে পূর্ণ নাট্যরস সৃষ্টিতে প্রয়াসী—তাকে শ্রুতিনাটক বলে'।

শ্রুতিনাটক ও মঞ্চ :

এই সংজ্ঞাবাক্য বিশ্লেষণ করলেই আমরা বুঝি যে, শ্রুতিনাটক শুধু শ্রুতিনির্ভর হতে গিয়ে মঞ্চনাটকের জন্য প্রয়োজনীয় নাট্যরস-উদ্বোধক অন্য সব উপকরণ বর্জন করেছে। এই নাটক মঞ্চায়নের জন্য ফটো ফ্রেমের মত প্রসেনিয়াম উইংস দৃশ্যপট সমন্বিত পূর্ণ মঞ্চের প্রয়োজন হয় না। যে কোন রকম মঞ্চে ঠাই পেলেই শ্রুতিনাটক অনুষ্ঠিত হতে পারে। এর বিপরীত অর্থ গ্রহণ করবেন না। প্রসেনিয়াম দৃশ্যপট সমন্বিত সম্পূর্ণ মঞ্চেও শ্রুতিনাটক অভিনয় করা যায়—তবে সেখানে মঞ্চ থাকে অর্থশূন্য। আরও নিখুঁত ভাবে বললে তাৎপর্যশূন্য। এ জন্য শ্রুতিনাটকের যে কোন রকম মঞ্চের পিছনে এক বর্ণের একটি পর্দা টাঙ্গানই ভাল। পর্দাটি আকাশী রং-এর হলে সবচেয়ে ভাল। না হলে গাঢ় কোন রং এর হলেও চলবে। কালো এবং সাদা পর্দা ব্যবহার না করাই ভাল। যদি অন্য রং না মেলে তবে কালো বা সাদাও ব্যবহার করা যায়। যেহেতু শ্রুতিনাটকে দর্শনের প্রাধান্য নেই তাই পর্দার রং সম্পর্কে আমরা কোন গোঁড়া মত পোষণ করব না।

শ্রুতিনাটক ও সাজ-সজ্জা :

শ্রুতিনাটকের ঐ সংজ্ঞাবাক্য থেকেই বোঝা যায় যে নাটকের শিল্পীদের সাজসজ্জা বা মঞ্চে উপকরণ বা প্রপস্ দরকার হয় না। এগুলির আবেদন দর্শনেন্দ্রিয়ের উপর। এ জন্যই শ্রুতিনাটকের শিল্পীরা নাটকের চরিত্রানুগ সাজ সজ্জা গ্রহণ করবেন না। তারা চরিত্রকে উপভোক্তার মনে এঁকে দেবেন কণ্ঠের মাধ্যমে। এই illusion of reality সৃষ্টির মধ্যেই অভিনেতা-অভিনেত্রীর দক্ষতার চরম পরিচয় আর এর ভেতর দিয়েই শ্রুতিনাটক যথার্থ শ্রুতিনাটক হয়ে ওঠে।

আসলে পোষাক-আসাক ও রূপসজ্জার একটা প্রভাব মঞ্চনাটকের অভিনেতা-অভিনত্রীকে আবির্ভাব মাত্রেই উপভোক্তার মনে নাট্যচরিত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করে। শ্রুতিনাটকের শিল্পীরা এই বাড়তি প্রভাবকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছেন। শুধু কাণ্ঠ্য সুরে ও স্বরে চরিত্রেটির প্রতীতি সৃষ্টির প্রতিজ্ঞা তার। এই প্রতিজ্ঞা-পূরণেই তার সার্থকতা ও সিদ্ধি।

কোন কোন নাট্যদল মঞ্চে শ্রুতিনাটক অভিনয় করতে বসে শিল্পীদের চরিত্রানুগ বেশভূষার আয়োজন করছেন। তাদের এই বিশেষ পরীক্ষা যে শ্রুতি নাটকের মূলচরিত্রকে খণ্ডন করছে, এ বোধ তাদের নেই। মনে রাখবেন, কোন গোঁড়ামির জন্য আমরা সাজ-সজ্জা গ্রহণের রীতিকে বাতিল করছি না। নিজেকে উপভোক্তা রূপে বসিয়ে ব্যাপারটা কল্পনা করুন। সিরাজউদ্দৌল্লা ও মহম্মদী বেগে পাশাপাশি বসে শুধু বাচিক অভিনয় করছে—অর্থাৎ সে

ক্ষেত্রে আপনার দর্শকবৃত্তিও পরিতৃপ্ত হচ্ছে না, শ্রোতৃ-বৃত্তিও নয়। মঞ্চাভিনয়ে কায়িক অভিনয় ও বাচিক অভিনয় পরস্পরকে পরিপূরণ করে। আর নাট্য চরিত্র-রূপী শিল্পী দর্শনে যেটুকু নাট্যপ্রত্যয় সৃষ্টি করল, কায়িক অভিনয় শূন্য বাচিকঅভিনয় করে সে নাট্য প্রত্যয়কে ধ্বংস করে দেওয়া হ'ল। তখন দর্শন-অনুভূতি শ্রবণ-অনুভূতি পরস্পরের বিরোধী শক্তিতে পরিণত হয়। অতএব শ্রুতিনাটকে শিল্পীদের চরিত্রানুগ সাজ-সজ্জার মারাত্মক পরীক্ষা বর্জন করুন।

শ্রুতি নাটক ও আলো

শিল্পীদের অঙ্গ-সজ্জা, সাজ-পোষাকের মত আলোর যাদুকরীও শ্রুতিনাটক বর্জন করেছে। আলোর আবেদন দর্শনেন্দ্রিয়ের কাছে। স্বভাবতঃ আলোকের কারসাজি যখনই শ্রুতি-নাটকে যোগ করা হবে, তখনই উপভোক্তার চোখকে নিমন্ত্রণ করা হচ্ছে। চোখ দেখছে আলোর যাদুকরীর মধ্যে নাট্য-চরিত্রের বদলে কতকগুলি ভিন্ন মানুষ কায়িক-অভিব্যক্তি-শূন্য বাচিক অভিনয় করে চলেছেন। এখানেও দর্শন-অনুভূতি শ্রবণ-অনুভূতি পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠতে পারছে না। এ জন্য শ্রুতিনাটকের মঞ্চে আলোর যাদুকরী অপ্রয়োজনীয়।

তবে কি শ্রুতি নাটকের মঞ্চে আলো থাকবে না? নিশ্চয়ই আলো থাকবে। আলোর যাদুকরী-সম্পাত ব্যবস্থা না থাকলেও উজ্জ্বল আলো থাকতেই পারে—তাতে অভিনেতা অভিনেত্রীরা দৃশ্যমান হবেন। তা হলে প্রশ্ন করা যায় যে, ঐ আলো থাক'র ফলেও ত' সাজসজ্জাহীন শিল্পীদের দেখা যাচ্ছে। তা হলে একি চোখকে নিমন্ত্রণ করা নয়? এখন কি দর্শন-অনুভূতি ও শ্রবণ-অনুভূতি পরস্পর বিরোধী হয়ে উঠছে না?

নিশ্চয়ই দুই অনুভূতি পরস্পর বিরোধী হয়। ডঃ অজিতকুমার ঘোষের মত বিদগ্ধ মানুষ এই বিরোধটুকুও সহ্য করতে রাজী নন বলেই প্রস্তাব দিয়েছিলেন, হয় ভোক্তাদের অন্ধ করে দিতে নয় শিল্পীদের অদৃশ্য করে দিতে। সামান্য আলোতেই যখন দুই অনুভূতির দ্বন্দ্ব তখন আলোকে প্রকট করে তুললে যে দ্বন্দ্ব আরও প্রবল ও ঘনীভূত হয়ে নাট্যরস সৃষ্টির সর্বনাশ করবে, যে বিষয়ে সন্দেহ থাকবে না।

তা হলে আমরা আলোকে প্রকট না করবার তত্ত্ব না হয় মেনে নিলাম, কিন্তু সামান্য আলোতেও ত' সমস্যার সমাধান হ'ল না। বিরোধ ত' থাকল। তবে ডঃ ঘোষের বক্তব্যকে কোন যুক্তিতে অস্বীকার করবেন?

আমরা ডঃ ঘোষের অনুভবের বিরোধিতা করিনি। ঐ আলোর ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে বাতিল করা যায় যদি শিল্পীদের নেপথ্য স্থানে রেখে মাইক্রোফোনের সাহায্যে উপভোক্তাদের শ্রুতিনাটক শোনান যায়—যেমন করা হয় বেতার নাটকে। একারণে অনেকে বেতার নাটককেই বিশুদ্ধ শ্রুতিনাটক বলতে চান।

আমরা এ মতকে সর্বৈব অস্বীকার করতে পারি না।

তা হলে দর্শকদের সামনে মঞ্চে শিল্পীরা বসে যখন শ্রুতিনাটক অভিনয় করছেন এবং তাদের দর্শক স্পষ্ট আলোতে দেখতে পাচ্ছেন, এই দেখতে পাওয়ায় দর্শন ও শ্রবণ অনুভূতিতে বিরোধ ঘটছে এবং নাট্যরসকে ব্যহত করছে, তাকে অতিক্রমের পথ কি? পথ নেই। শ্রুতিনাটকের শিল্পীরা এ প্রতিবন্ধকতা মেনে নিয়েই মঞ্চে বসেছেন অভিনয় করতে। ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বোক্তি উদ্ধৃতি থেকে আমরা জেনেছি নাটকের বেগ এবং শিল্পীর কৃতিত্বে এই প্রাথমিক প্রতিবন্ধকতাকে উত্তীর্ণ হয়ে উপভোক্তা রসলোকে উত্তীর্ণ হতে পারেন। শ্রীমতী উর্মিমালা বসুও শিল্পী হিসাবে উপভোক্তার প্রতিক্রিয়া যাচাই করতে গিয়ে (শিল্পী মাত্রই উপভোক্তার ওপর তার অভিনয়ের প্রতিক্রিয়া যাচাই করেন, এটা শিল্প-সিদ্ধির এক সর্ত) অনুভব করেন যে শিল্পীকে দেখা গেলেও এবং নাট্যচরিত্রের সঙ্গে কণ্ঠদানকারী শিল্পীর কোন মিল না থাকাতেও উপাভোক্তা নাট্যরসে আপ্লুত হচ্ছেন। আমার ব্যক্তি অভিজ্ঞতাও অনুরূপ। আর তাই সিদ্ধান্ত করা যায় যে মঞ্চে শ্রুতিনাটক অভিনয় করবার সময় প্রকট আলোর কারসাজির দ্বারা উপভোক্তার দর্শনেন্দ্রিয়কে তীব্রভাবে উত্তেজিত ও ক্রিয়াশীল না করে, সাধারণ আলোতে শিল্পীদের আলোকিত করে উপভোক্তার দর্শনেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা ও ক্রিয়াশীলতাকে মৃদুভাবে উত্তেজিত করলে তাতে দর্শন শ্রবণ অনুভূতিতে যে মৃদু বিরোধ উপস্থিত হয়—শ্রুতিনাটকের শিল্পীরা তাকে মান্য করবেন এবং এই প্রতিকূলতাটুকু নাটকের অন্তর্নিহিত বেগকে অভিনয়ে পরিস্ফুট করে অতিক্রম করবেন।

শ্রুতিনাটকের বিষয় ও রূপ

এতক্ষণের আলোচনায় আমরা শ্রুতিনাটকের স্বরূপ সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে সচেষ্ট থেকেছি এবং সম্ভবতঃ গড়ে তুলতেও পেরেছি। আর তাই এবার শ্রুতিনাটকের অবয়ব গঠন সম্পর্কে আলোচনা করতে বসেছি।

শ্রুতিনাটক সম্পর্কে আশাবাদী মানুষের মনেও কতকগুলি অস্বচ্ছ ধারণা আছে। এ জন্য তারা অনেক বিভ্রান্তিকর মন্তব্য করে বসেন। ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র তাই রবীন্দ্রনাথের 'সে'র সঙ্গে শ্রুতিনাটকের তুলনা করে বলেছেন,

> 'শ্রুতিনাটক' ব্যাপারাটাই যেন সেইরকম এক ধরণের মগজবদল। অর্থাৎ 'আবৃত্তি', 'পাঠ' এবং 'নাটক' এই তিন শিল্পমাধ্যমের এক মিশ্রণ বা চমকাম্বয় বা বকচ্ছপ।
>
> তদেব : পৃ-২২২

এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই তিনি মনে করেন রবীন্দ্রনাথের কর্ণকুন্তী সংবাদ, কচ ও দেবযানী, বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটিকা বা নাট্য কবিতাগুলি,

জীবনানন্দ দাশের 'আট বছর আগের একদিন', '১৯৪৬-৪৭', 'এইসব দিন রাত্রি' 'লোকেন পালিতের জার্নাল' ইত্যাদি কাব্যধর্মী কাব্য ও কবিতাকেই শ্রুতি নাটকের উপযোগী। তাঁর মতে

> 'শ্রুতি-নাটকের পক্ষে একদিক থেকে কাব্যধর্মী নাটকের উপযোগিতাই সর্বাধিক বলে আমারও মনে হয়।' তদেব : পৃ - ২২২

এ বিশ্বাস আরো তীব্রভাবে ধরা পড়েছে পার্থপ্রতিম চৌধুরীর বক্তব্যে।

> শ্রুতি-নাটক আমাদের দেশে একটা পরিপূর্ণ অভিজাত্য অথবা জলহাওয়া কখনই তৈরী করতে পারে না, যেহেতু এখনও এদেশে কোন প্রথমশ্রেণীর কাব্যনাট্য লেখা হয়নি। শ্রুতিনাটোর জন্য আমার ধারণা, চাই পাবলো নেরুদার মতো কবিতা অথবা ইলিয়াড ও ওডিসির মত মহাকাব্যের কবিতা। লে-আউট ও লে-অফ নিয়ে কোন পত্রিকার কমরেডী কবিতা নিয়ে, অথবা নাট্যাংশ নিয়ে অথবা একাংক নিয়ে শ্রুতিনাটক হয় না, অথবা হতে পারে না অথবা টিকে থাকতে পারে না। তদেব : পৃ - ৪০

কাব্যনাট্য নিয়ে শ্রুতিনাটক হতে পারে আর লে-আউট, লে-অফ নিয়ে শ্রুতি-নাটক হবে না কেন—সে বিষয়ে পার্থপ্রতিমবাবু কোন আলোকপাত করেননি। করলে তাঁর মতকে আমরা আরো স্পষ্ট করে বুঝতে পারতাম।

আমরা পার্থপ্রতিমবাবুর মন্তব্য থেকে বুঝতে পারছি উনি বা হরপ্রসাদ মিত্রের মত মানুষ শ্রুতিনাটককে এমন একটা মাধ্যম বলে গ্রহণ করেছেন যা জীবনের প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের চাইতে কাব্যধর্মী বিষয়ে রূপ দিতে বেশি সমর্থ। কিন্তু কেন শ্রুতিনাটক জীবন বিমুখ উম্মার্গগামী হবে? লে-আউট, লে-অফের কমরেডী কবিতা নিয়ে যদি নাটক রচিত হতে পারে, তবে শ্রুতিনাটক হতে পারবে না কেন? শ্রুতিনাটকের কোন খামতির জন্য তার এই পঙ্গুতার নির্দ্দেশ করা হ'ল?

এর কারণ ওঁরা প্রথমেই শ্রুতি-নাটককে আবৃত্তিধর্মী ভেবে নিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে জীবনদ্বন্দ্ব-মুখর কবিতাও কি আবৃত্তি হয় না? তা যেমন হয়, তেমনি জীবন-দ্বন্দ্ব মুখর নাটকও অভিনীত হয়। শ্রুতিনাটক তবে দ্বন্দ্ব মুখরতার রূপ দিতে পারবে না কেন?

শ্রুতিনাটক ও মঞ্চনাটকের মৌলিক প্রভেদ কোথায়? মঞ্চনাটক শ্রবণ দর্শনকে একত্রে উত্তেজিত করে নাট্যকাহিনীর সামগ্রিক বাস্তব রূপায়ন চায়। পরিবেশ-সহই নাট্য-ঘটনা সেখানে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। এই illusion of reality যত স্পষ্ট হয়, যত নিখুঁত হয়, আমরা সে প্রয়োজনাকে তত সার্থক বলে গ্রহণ করি। কিন্তু শ্রুতিনাটক গান্ধারীর মত স্বেচ্ছায় চোখে কাপড় বেঁধেছে। সে শুধু শব্দ দিয়ে সমগ্র জাগতিক ক্রিয়াকে ধরতে চায়। সদ্যজাত এই আঙ্গিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা এত শক্তি এখনও অর্জন করেনি যে মঞ্চনাটকের মত তাল ঠুকে বলতে পারে যে, আমি জাগতিক যে কোন ঘটনাকে রূপ দিতে পারি। তার সীমাবদ্ধতা স্বীকৃত। আগামী দিনের প্রযোজকদের সনিষ্ঠ পরীক্ষায়

ও নাট্যকারদের পরিকল্পনা-গুণে এ সীমাবদ্ধতা একদা কাটবে বলেই বিশ্বাস রাখা যায়। তবে, এখনও শ্রুতিনাটকের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। তাই বলে শুধু কাব্যধর্মী বিষয়ের মধ্যে আটকে থাকবার মত শিশু সে নয়।

এ বিষয়ে আমাদের মতামত না বলে প্রাজ্ঞজনের মত আগে ব্যাখ্যা করা ভাল। পূর্বোক্ত গ্রন্থে ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত এক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধে শ্রুতিনাটকের বিষয়ক্ষেত্রকে সুন্দরভাবে নিরূপন করেছেন। তিনি বলেছেন,

> ধ্বনিময় বিশ্ব যা দৃশ্য-নিরপেক্ষ, তার নিজস্ব কিছু বলার আছে মানুষের কাছে—সেই দায়ভার শুধু সঙ্গীতের উপরে ছেড়ে দিতে রাজি নয় আধুনিক শিল্প। বিশেষতঃ ঐ শ্রুতিময়তার মধ্যে সুর নয়, নাট্যও আছে। তাকে আবিষ্কার করবার দায়িত্ব যদি নেয় শ্রুতিনাট্য—তাকে মেনে নিতেই হবে। আর এখানেই তার (শ্রুতি-নাটকের) তাত্ত্বিক-ভিত্তি।
>
> তদেব : পৃ - ১৭

ডঃ গুপ্ত খুব সুন্দর ভাবে শ্রুতিনাটকের মূল কথাটা বলেছেন। এর মধ্যে রয়েছে শ্রুতিনাটকের জন্ম ইতিহাস।

শ্রুতিনাটকের এই তাত্ত্বিক ভিত্তির সত্যকে উপলব্ধি না করায় শ্রুতি নাটকের সমর্থক হয়েও ডঃ সত্যব্রত দে শ্রুতিনাটককে নিতান্ত প্রযোজনা-দারিদ্রের ফসল বলে বর্ণনা করেছে।

> এই অভিনয়ের উদ্ভব এক হিসাবে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাবার উদ্দেশ্যে। পূর্ণাঙ্গ নাটকাভিনয় ব্যয়সাপেক্ষ। অনেক সময় অপেশাদার নাট্যামোদীর পক্ষে সেই ব্যয়ভার সংগ্রহ করে ওঠা সম্ভব হয় না। সেই সব আয়োজনের সময় সুযোগেরও অভাব থাকে। এই জাতীয় অভিনয়ের ভিতর দিয়ে অপেশাদার নাট্যমোদীদের অভিনয় স্পৃহা চরিতার্থ হয়।
>
> তদেব : পৃ ১৮-১৯

ডঃ দে শ্রুতি নাটকের মঞ্চায়নের পিছনে শুধু অর্থ ও সময় কম ব্যয় করতে হওয়ার সুযোগ গ্রহণের ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি দেখেছেন। অনেক প্রযোজকের এমন মনোবৃত্তি যে নেই এমন নয়। নাট্যকার কিরণ মৈত্র যে ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তার ভেতরে ঐ প্রযোজকের এই হীনবৃত্তিই ফুটে উঠেছে আর তাই মৈত্র-মশাই এর মত প্রবীন নাট্যকারও নাটক লিখে দেবার প্রেরণা বোধ করতে পারেন নি। এটা পারা সম্ভবও নয়। ঐ ব্যবসায়ী মনোভাবের কাছে নতি স্বীকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকারের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। বস্তুতঃ ঐ ঘটনার আঘাতই নাট্যকার মৈত্রকে শ্রুতিনাটকের প্রতি বিমুখ করেছে। অথচ বিশ্বের নিজস্ব বক্তব্যকে আবিষ্কার, অনুভব ও তাকে প্রকাশ করবার বাসনাই শিল্পীর কাছের প্রেরণা। শ্রুতিনাটকের নেপথ্যেও এমন প্রেরণা বর্তমান।

ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত তার প্রবন্ধে শ্রুতিনাটকের এই বিশিষ্টতাকে আরো নিপুনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন বেতার নাটকের সঙ্গে তার তুলনা করে। কারণ ডঃ গুপ্ত মনে করেন বেতার নাটকই শ্রুতিনাটকের বিশুদ্ধরূপ। কিন্তু তাই

বলে বেতারে পরিবেশিত হলেই তাকে শ্রুতি-নাটক বলে গ্রহণ করেন নি তিনি। সাজাহান, ডাকঘর হামেশাই অভিনীত হয় বেতার নাটকে। এ সব পরিবেশনায় যোগ-বিয়োগ করতেই হয়। দেখার অভাব নানা ভাবে পূরণ করে তাকে পুরোপুরি শ্রুতিনির্ভর করা সহজ নয়। এ জন্য ঐ সব স্থায়ী নাটক বেতারে শ্রুতিতে পরিণত করতে অনেক সময় 'অস্বাভাবিকতার সঙ্গে সন্ধিও' করতে হয়।

কিন্তু বেতার প্রযোজকেরা থেমে থাকলেন না। এই মধ্যমটির শক্তি ও সীমাবদ্ধতাকে কাজে লাগাতে মেতে উঠলেন পরীক্ষা নিরীক্ষাতে। তাদের 'অবাভকেই স্বভাব' করে তুলবার এই সাধনা আসলে অস্বাভাবিকতাকে পরিহার করতে চেষ্টা করা। বলে গেলেই শ্রুতিনাটক—এ সহজ ফর্মুলার কার্যকারিতা যে নেই—তা আজ আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

> শোনানোর মধ্যে দেখানোব মায়া তৈরী হচ্ছে, দৃশ্য সম্ভাবনা থেকে ছেঁকে নেওয়া হচ্ছে সুর, ধ্বনি। কণ্ঠযন্ত্র ও বিবিধ পার্থিব বস্তু থেকে বা সুবেলা বেসুবো বেতাল ও তালবদ্ধ মধুব কর্কশ কত বিচিত্র আওয়াজ উঠছে প্রতিক্ষণ, কখনও মৌন ঢেকে দিচ্ছে শব্দকে। ঠিকঠাক প্রয়োগে মুক্তি ঘটছে বেতার নাটকের শ্রুতি-নাট্য রূপে ধ্বনি দিয়ে গড়া ছবি, ধ্বনিতে বিদ্ধ চবিত্র। তদেব : পৃ ১৬

ডঃ গুপ্তের এই কাব্যময় প্রতিবেদনের মধ্যে যে সত্য ফুটে উঠেছে, তা হল এই যে 'ধ্বনি দিয়ে ছবি' গড়বাব সাধনায় শ্রুতিনাটকেব অভিজ্ঞতাকে অনেকখানি সমৃদ্ধ, ইতঃমধ্যেই কবে ফেলেছে বেতার নাটক। আর শুধু কাণ্ঠ্য বিবৃতিই শ্রুতিনাটক নয়— ধ্বনি দিয়ে আঁকা ছবি ও নাট্য প্রাণ প্রতিষ্ঠাই আসল শ্রুতিনাটক। এ জন্য শুধু বাচিক অভিনয় নয়—নানা বকম ধ্বনি সংযোগ কবে তাকে পূর্ণ ও নিটোল কবে তুলতে হয়—যাতে দর্শনের অভাব শুধু শ্রবণের মায়ায় মুছে যায়—নাট্যরস পূর্ণ হয়ে ওঠে।

ডঃ গুপ্তেব প্রতিবেদন আমাদেব কাজ সহজ কবে দিয়েছে। তাব বক্তব্যকে সূত্রাকারে বললে আমরা যে যে সত্যে উপনীত হই, তা হ'ল—

এক. যে কোন নাটকই শ্রুতিনাটক হতে পারে না। শ্রুতি নাটকেব নাট্যকার শুধু ধ্বনি দিয়ে সমগ্রকে ধরবার পরিকল্পনা করবেন। এ জন্য শুধু দৃশ্যময়তা পূর্ণ ঘটনা শ্রুতিনাটকের যোগ্য নয়। যদি তাকে ধ্বনি দিয়ে ধবা না যায় তবে তা শ্রুতিনাটকের পক্ষে অযোগ্য—তা শ্রুতিনাটকে আরোপ করলে অস্বাভাবিক হতে বাধ্য।

দুই. শ্রুতিনাটকের বিষয় শুধু ধ্বনি সংকেতে প্রকাশযোগ্য হলেই হবে না, তাতে যথার্থ নাট্যরস থাকা প্রয়োজন।

তিন. শ্রুতিনাটকেব প্রযোজক নানা জাতীয় শব্দ সংযোগ করে কণ্ঠ্য অভিনয়কে পূর্ণ ও সজীব করে তুলবেন। বহুক্ষেত্রে এই শব্দ সংযোজনের ভূমিকা অভিনয় অংশের চেয়ে বড় ভূমিকা নিতে পারে।

ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত তাঁর বিশ্লেষণ-ক্রমে শ্রুতিনাটকের ক্ষেত্র হিসাবে চারটি সূত্রের উল্লেখ করেছেন—

এক. আধুনিক সার্থক বেতার নাট্য অবশ্যই শ্রুতিনাটক।

দুই. কাব্যনাট্য শ্রুতিনাটক হিসাবে পরিবেশিত হতে পারে।

তিন. গীতিনাট্য, নৃত্যযুক্ত না হলে অবশ্য শ্রুতিনাটক।

চার. কোন কোন ধরণের গদ্য নাটকও—যেখানে সংলাপই ক্রিয়াকে পুরো ধরে রাখে, বিকল্পে শ্রুতিনাটকের ঢঙে পরিবেশিত হতে পারে।

আমরা শ্রুতি নাটকের ক্ষেত্র ও পরিধি সম্পর্কে ডঃ গুপ্তের মতকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করেও, তাকে আরো প্রসারিত করতে চাই। কারণ তিনি আমাদের মজুত নাট্যভাণ্ডারকেই বিচার করেছেন। বস্তুতঃ এতদিন যে সব মঞ্চনাটক বা রিডিং ড্রামা হিসাবে চিহ্নিত যে সব নাটক আমাদের হাতে এসেছে, সেগুলি থেকে ঝাড়াই বাছাই করে শ্রুতিনাটকের অভাব দূর করতে গেলে এচারটি সূত্র অনিবার্য। কিন্তু ডঃ গুপ্ত শ্রুতিনাটকের সম্ভাবনার দিকটি সম্পর্কে এখানে কোন মন্তব্য করেন নি। তাই এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য যুক্ত করতে হ'ল।

শ্রুতিনাটকের সম্ভাবনা ক্ষেত্র কিন্তু অনন্তপ্রসারি। শ্রুতিনাটকে প্রায় সিনেমার মত মুহূর্তে দৃশ্যান্তর ঘটান যায়। অনেক কাল আগে পঞ্চাশ-একান্ন সালে এক গ্রামের এক অতি সাধারণ নাট্যকার একটি নাটক লিখে আমাদের দেখতে দিয়েছিলেন। তাতে আকস্মিকভাবে লড়ির তলায় এক ব্যক্তি চাপা পড়া এবং তাকে কেন্দ্র করে পথের চলমানতার দৃশ্য ছিল। নাট্যমঞ্চে তা দেখান আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলতঃ আমরা সে নাট্যকারকে উৎসাহ দিতে পারি নি। আজ মনে হচ্ছে, ঐ নাটকটির সব ঘটনাই শ্রুতিনাটকের উপযোগী। আসলে ঐ নাট্যকারের মনে সেদিনই শ্রুতিনাটকের রূপটি ধরা পড়েছিল— যা আমরা ধরতে পারি নি।

রবীন্দ্রনাথ দৃশ্যপটের বিরোধী মানসিকতা প্রকাশ করেছেন বহুস্থানে। তাঁর মতে নাটক যখন চলছে তখন স্থানুপট উপভোক্তার মনে চেপে থাকে বোঝার মত — তার স্বপ্নকে ক্রিয়া করতে দেয় না। আসলে মঞ্চনাটকে সবটাই আমরা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চাই। এই বাস্তবতা আনতে গিয়ে উপভোক্তার মনকে তারিফ করবার অধিকার দি — তার মনে মনে সৃষ্টি করে নেবার অধিকার হরণ করি। শ্রুতিনাটকে উপভোক্তার কল্পনা তার বুকের মধ্যে ছবি আঁকে—শব্দসংকেতের হাত ধরে তার বুকে মূর্ত হয়ে উঠে নাট্যবিবৃত জগত। এখানে উপভোক্তাও স্রষ্টা হয়ে ওঠে। এর ফলে আমরা শ্রুতিনাটকে এমন ছোট ছোট ঘটনা, এত দ্রুত পটপরিবর্তন, এত কাল্পনিক বিষয়াদির অবতারণা করতে পারি যা অন্য কোন নাট্য আঙ্গিকে সম্ভব নয়। এ জন্য এ গ্রন্থের পাঠক আমাদের নাট্য-সংকলণের বৃক্ষবন্দনা ও সমুদ্রবিজয় নাটক দুটির দিকে

দৃকপাত করতে পারেন। বিপুল ব্যয়ে সিনেমায় হয়ত, নাটক দুটি রূপায়ণ সম্ভব কিন্তু মঞ্চে কখনই নয়।

এমনিভাবে বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যায় শ্রুতিনাটকের বিষয়ের পরিধি মঞ্চনাটকের ক্ষেত্রকে অতিক্রম করে এমন সূক্ষ্ম অবহেলিত ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারে, যেখানে মঞ্চনাটক কখনই প্রবেশ করতে পারত না।

এখানে একটা আপত্তির উদ্ধৃত না তুলে পারছি না। পূর্বোক্ত গ্রন্থে স্বপ্নময় চক্রবর্তী নামক এক ব্যক্তির একটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। আমি ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর পরিচয় জানি না। তিনি কিন্তু শ্রুতিনাটকের পরিধি সম্পর্কে বিশদ মন্তব্য করেছেন এবং তার মন্তব্য আমাদের ভাবনার বিরোধী। তিনি বলছেন,

> স্বল্প সময়ের হাল্কা বিনোদন বা আবেগের ব্যায়ামের জন্যই এই জনপ্রিয়তা। বাঙালী মধ্যবিত্তের যে মানসিকতার প্রকোপে সাহিত্যপাঠের পরিবর্ত কমিকস্ -পাঠ প্রবণতা বেড়েছে, সিরিয়াস পত্রিকার বদলে স্ক্যাণ্ডাল পত্রিকা পড়ছে, সে মানসিকতার প্রকোপেই শ্রুতিনাটকের এই হাল-ফিল জনপ্রিয়তা। দেখা গেছে স্বল্প সময়ের (চল্লিশ মিনিটের কম) হাস্যরসাত্মক বা আবেগপ্রধান শ্রুতিনাটকই বেশি জমে। হাস্য রসের ফরমূলা হ'ল—মুখরা স্ত্রী বনাম মুখচোরা স্বামীর ঝগড়া। আর আবেগের মশলা হ'ল ত্রিকোণ প্রেম। পুতুল নাচের ইতিকথা, জাগরী, রাজনগর জাতীয় কাহিনী শ্রুতিতে হাততালি পাবে না। তদেব : পৃ - ২১১

এই আলোচনায় শ্রুতিনাটককে মধ্যবিত্ত মানসিকতার এক ধরণের বিকারের ফসল বলা হয়েছে। শ্রুতিনাটকের মূল বৈশিষ্ট্য ও প্রতিজ্ঞা শ্রী-চক্রবর্তীর কাছে ধরা পড়ে নি। এর কারণ প্রচলিত নিষ্ঠাহীন কিছু প্রযোজনা। ঐ সব প্রযোজনার নিরিখে শ্রুতিনাটকের শক্তি সম্ভাবনার ক্ষেত্র বিচার করতে গিয়েই শ্রীচক্রবর্তী এ মন্তব্য করেছেন। ঐ প্রযোজনা গুলিই তাঁকে ঐ বিশ্বাসে পৌঁছে দিয়েছে যে হাস্যরসাত্মক ও আবেগধর্মী স্বল্প সময়ের নাটক ছাড়া শ্রুতিনাটক জমে না। কিন্তু আমাদের বক্তব্য ঐ সব প্রযোজনাতেই কিন্তু শ্রুতিনাটকের চূড়ান্ত পরীক্ষা শেষ হয় নি। শ্রী চক্রবর্তী নিশ্চয়ই এতদিন এমন বহু শ্রুতি নাটক পড়েছেন বা শুনেছেন, যা তার ঐ ফর্মূলার বাইরে।

শ্রীচক্রবর্তী কতকগুলি গ্রন্থের নাম বলে সিদ্ধান্ত করেছেন যে ঐ গ্রন্থগুলি শ্রুতিনাটক হিসাবে পরিবেশিত হলে, হাততালি পারে না। কিন্তু হাততালিই কি শিল্পসৃষ্টির শেষ কথা। অগভীর ভাল লাগার হাল্কা তৃপ্তি থেকেই লোকে হাততালি দেয়। কিন্তু তৃপ্তি যেখানে অতলস্পর্শী, ভাললাগার সংবেদন যখন গভীরতার সীমা পায়না — তখনই প্রকৃত শিল্প সৃষ্টি হয়েছে বলে বোঝা যায় আর তখন উপভোক্তা কখনও হাততালি দেয় না। আমরা শ্রুতিনাটকের ফল হিসাবে হাততালি চাই না।

আর আজ কোন ব্যাপার হয় নি বলে তা ভবিষ্যতেও হবে না বলে ঘোষণা করা কোন প্রত্যয়সিদ্ধ বচন বলে গ্রহণ করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী

দীর্ঘকাল অভিনয় যোগ্য নয় বলেই বিবেচিত হয়েছে—তাকে বলা হয়েছে রিডিং ড্রামা। বহুরূপীর প্রযোজনা সে ধারণা বদলে দিয়েছে। 'পথের পাঁচালী' চিত্রায়িত হতে পারে, এ বিশ্বাস অনেকেরই ছিল না। তাই সত্যজিৎবাবু যেদিন পথের পাঁচালী চিত্র রূপ দেবেন বলে ঘোষণা করেন— তখন অনেকেই যুবকের স্পর্দ্ধায় বিস্মিত এবং অমন একটি মহৎগ্রন্থের কল্পরূপ ধ্বংস হবার সম্ভাবনায় আতঙ্কিত হয়েছিলেন। কিন্তু দুটি আশঙ্কাই ধূলিস্যাৎ হয়েছে। কে জানে, স্বপ্নময়বাবুর এই উক্তিই কোন নাট্যকারকে উত্তেজিত করে তুলবে কিনা। আসলে যে কোন গ্রন্থের কাহিনীই শ্রুতিনাটকে সার্থক রূপ পেতে পারে যদি তার শ্রুতিগ্রাহ্য একটি স্বরূপ নাট্যকারের কাছে ধরা পড়ে। আর তা যদি ধরা না পড়ে তবে যত মহৎ গ্রন্থই হোক কোন নাট্যকার তার স্বাভাবিক সুন্দর শ্রুতিরূপ দিতে পারবেন না।

এই কারণেই ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত খুব সতর্কভাবে পদবিন্যাস করে শ্রুতিনাটকের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যথাসম্ভব স্বল্প পরিসর এক সম্ভাবনার দিক তুলে ধরেছেন—

> শ্রুতিনাট্য যদি বিশ্বের, মানবজীবন ও চিত্তের দৃশ্যহীন গূঢ়চারী অংশে যে ধ্বনি ও নাটকত্বের অবস্থান, তাকে প্রকাশ করতে চায়, তবে তা খুব একটা জনপ্রিয় না হলেও একটা স্তরের সঙ্গে নিবিড় সংযোগে বাঁচবে—যেমন ভিস্যুয়ালের সোর্দণ্ড সাম্রাজ্যেও শুদ্ধ সঙ্গীত বাঁচে, সাহিত্য ও চিত্রকলা সিনেমা টিভি নিরপেক্ষভাবে বিকশিত হয়। তদেব : পৃ - ২০

আমরা আগেই বলেছি ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত অত্যন্ত সতর্ক হয়ে শব্দ প্রয়োগ করেছেন এবং তার ভবিষ্যৎ বাণী যাতে কোন ক্রমেই অতি আশাবাদী বলে চিহ্নিত হতে না পারে সে জন্য তিনি শ্রুতিনাটকের সীমাকে সংকুচিতই করে দিয়েছেন। তা দিন, তাতেও ক্ষতি নেই। ডঃ গুপ্ত কথিত সীমিত ক্ষেত্রেও যদি শ্রুতিনাটক বেঁচে থাকে, তবে তাও হবে নাট্যক্ষেত্রে এক বাড়তি সংযোজন।

তবে, এ ক্ষেত্রে আমরা আর একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে চাই। এ সতর্কবাণী একান্তভাবেই শ্রুতি-নাট্য প্রেমীদের কাছে। যারা শ্রুতিনাটকের শিল্প সত্তায় বিশ্বাসী, যারা মনে করেন কোন ধান্দাবাজী ও ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি নিয়ে সস্তা হাততালির মোহে আপনারা শ্রুতিনাটক চর্চ্চায় নামেননি, যদি বিশ্বাস করেন যে, আপনার বক্তব্য আপনি এই শিল্প মাধ্যমেই উপভোক্তার কাছে সার্থক ভাবে পৌছেঁ দিতে পারবেন, একমাত্র তখনই আপনি শ্রুতিনাটক চর্চায় নামবেন। একে এই নব আঙ্গিকের প্রতি রয়েছে বহু ব্যক্তির পূর্ব-সংস্কার জনিত অবিশ্বাস, সংশয়, সন্দেহ এমন কি কোথাও কোথাও রয়েছে বিদ্বেষ ও আক্রমণ— অন্যদিকে প্রচলিত নাট্য আঙ্গিকের অন্য সব উপকরণকে বাদ দিয়ে শ্রুতিসর্বস্ব অনুষ্ঠান করবার দুরূহ পন্থা গ্রহণ করেছেন আপনি— তাই

দুস্তর সাধনা, অটল নিষ্ঠা ও ক্রমাগত পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা আপনার অভিনয় ও প্রযোজনাকে একান্ত লক্ষ্যমুখী করে তুলতে হবে। আপনার এই সাধনা, এই নিষ্ঠা ও নিরীক্ষাই পারে শ্রুতিনাটককে গ্লানিমুক্ত মহিমান্বিত আসনে বসাতে। এখন আপনিই আপনাকে প্রশ্ন করুন শ্রুতিনাটককে ঐ অবজ্ঞায় ফেলে রাখবেন—না তাকে তুলে আনবেন? শ্রুতিনাটকের ভবিষ্যৎ আপনার উত্তরের অপেক্ষা করছে।

৩

'শ্রুতি নাটকের শিল্পীর কণ্ঠ-প্রস্তুতি

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বোদ্ধৃত বক্তব্যে তিনি শ্রুতি-নাটক সম্পর্কে আশাবাদী ও সমর্থনসূচক মন্তব্য করেও একটি সর্ত প্রয়োগ করেছেন, 'অবশ্য কণ্ঠস্বর যদি যথাযথ হয়'। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় যদিও নিজেকে সর্বরূপ নাট্য-সংস্কার বর্জিত মানুষ রূপে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, তবু তাঁর কাছে শ্রুতি-নাটকাভিনয়ের মৌল দিকটি সঠিকভাবেই ধরা পড়েছে। মঞ্চ, আলো, সাজসজ্জা ইত্যাদি যা কিছু মঞ্চ-নাটকের ক্ষেত্রে অভিনেতা অভিনেত্রীকে উপভোক্তর মনে নাট্যচরিত্র প্রতিষ্ঠার সহায়তা করে আর যে কায়িক ও সাত্ত্বিক অভিনয় তার মনোভাব প্রকাশের অর্দ্ধেকেরও বেশি অংশ সম্পন্ন করে দেয় তার সবটুকু শ্রুতিনাটকে বর্জিত হওয়ায়, কণ্ঠাভিনয়ের ভূমিকা যে কতদূর গুরুত্ব পেল, তা শ্রুতিনাটকের অভিনেতা-অভিনেত্রী ও পরিচালককে অবশ্যই অনুভব করতে হবে। এ কারণে শ্রুতি-নাটকেব কণ্ঠাভিনয়ে প্রত্যেকটি উচ্চারণ সুরে-স্বরে স্বরাভিনয়ে হবে সূক্ষ্মতম অভিব্যক্তি প্রকাশের সহায়ক। তার ভাবাভিনয় হবে অব্যর্থ ও অনিবার্য। তা যদি না হয় তবে শ্রুতিনাটকের শ্রোতার মনে নাট্যচরিত্রও যেমন প্রতিষ্ঠিত হবে না, নাট্যঘটনাও নানা দ্বিধা দ্বন্দ্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব ব্যঞ্জনায় উপলব্ধি সৃষ্টি করবে না শ্রোতার মনে। এজন্য শ্রুতিনাটকের শিল্পীদের অবশ্যই কণ্ঠ-সাধনায় ব্রতী হতে হবে।

আবৃত্তিকারদেরও কণ্ঠসাধনা করতে হয়। কারণ আবৃত্তিকারও আবৃত্তির বিষয়কে কাণ্ঠ্য অভিব্যক্তিতেই শ্রোতার মনে এঁকে দেন। এই মিল থাকার ফলেই অনেক সুধী আবৃত্তি ও শ্রুতিনাটকের অভিনয়কে একই বলে মনে করছেন। এজন্যই একে কেউ বলেছেন 'অলস কালবেলায় কবিতা-পোড়ানর উৎসব' কেউ বা বলেছেন 'না-আবৃত্তি, না-সিনেমা' ইত্যাদি অনেকগুলি না-এর এক হচ্পচ্। কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে শ্রুতিনাটক একদিকে যেমন আবৃত্তি থেকে স্বতন্ত্র, অন্যদিকে তেমনি অনেক না-এর হচপচও নয়, তার নিজস্ব রীতি আছে। শুধু কণ্ঠের দিক থেকে তা একেবারেই মঞ্চ-নাটকের অভিনয়ের তুল্য। বরং বলা যায়, কণ্ঠ-নিভরতার সর্বময়তার জন্য শ্রুতিনাটকের কণ্ঠাভিনয় মঞ্চ নাটকের বাচিক অভিনয়ের থেকেও অনেক বেশি সূক্ষ্ম। এই সূক্ষ্মতা অর্জনের নৈপুণ্য কোন ধান্দাবাজী বা ফক্কিকারী দ্বারা সম্ভব নয়।

এই প্রসঙ্গে কবিতা আবৃত্তি ও শ্রুতি-নাটকের অভিনয়ে পার্থক্য কোথায়, তার সূত্র সন্ধান করা যেতে পারে। আমরা 'আবৃত্তি কোষ' গ্রন্থে প্রতিষ্ঠা করেছি যে কবি যে চিন্তাক্রম থেকে কবিতাটি রচনা করেছেন, কবিতাটি পাঠের সময় যে রসোপলব্ধি আবৃত্তিকারের চিত্তে পুনরাবির্ভূত হয়েছিল তাকেই আবৃত্তিকার নিজ কাণ্ঠ্য ক্রিয়ায় উপভোক্তার মনে আবির্ভূত করতে চান। ঐ উপলব্ধির সঞ্জীবনই আবৃত্তি। আবৃত্তিকার বস্তুতঃপক্ষে আবৃত্তিকালে নিজেই কবি, তিনি কবির প্রতিনিধি বা নিজেই সেই ভূমিকার আবির্ভূত। তাই বলে, নাটকের চরিত্র রূপায়নের মত কোন আত্মগোপনকারী ভিন্ন চরিত্রারোপন এখানে নেই। তবে কেন বলা হ'ল যে আবৃত্তিকার যেন কবির প্রতিনিধি বা স্বয়ং কবি? কারণ, আবৃত্তিকারকে এমনভাবে আবৃত্তি করতে হয় যে, কবিতার বক্তব্য যেন ভিন্ন কারো নয় স্বয়ং তার। সুকান্তের 'প্রিয়তমাসু' কবিতায় আবৃত্তিকার'ই সেই সৈনিক। দেশলাই বা সিঁড়িতে দেশালাই বা সিঁড়ির অভিব্যক্তি বা অনুভূতি আবৃত্তিকারেরই অনুভূতি। আসলে আবৃত্তিকার যেন তার অন্তরের ঐ সব উপলব্ধি ও অনুভূতিকে বুক খুলে একান্ত জনকে বলছেন।

এই বিবরণ থেকে বুঝবেন আবৃত্তি মূলতঃ বিবরণধর্মী ব্যাপার। সাধারণ কবিতা মূলতঃ ব্যক্তি অনুভূতির বিবরণ। কাহিনীমূলক কবিতাও বিবরণমূলক। তার ভেতর যত দ্বন্দ্ব বা সংঘাতই থাক—আবৃত্তিকার কিন্তু সেখানে ঘটনার বিবরণই দিচ্ছেন। কিন্তু নাটক বিবরণ নয়। যেখানে সমস্ত রকম বিববণ-নিরপেক্ষভাবে দ্বন্দ্ব সংঘাতকেই রূপ দিতে চাওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে সংলাপের মধ্য দিয়ে শিল্পীকে নাট্যচরিত্রকে ফুটিয়ে তুলবার যে প্রয়াস পেতে হয়—কবিতায় তা কখনই প্রয়োজন হয় না। কাব্য-নাট্য বা নাট্য-কাব্য—যাই বলুন, সেখানে বিষয়বস্তুর মধ্যে কিঞ্চিত কাব্যধর্মিতা থাকে। এজন্য ঐ সব নাটক মঞ্চায়নে শিল্পী স্বভাবতঃ খানিকটা আবৃত্তির দিকে ঝোঁকেন। এটা কতখানি সমর্থন-যোগ্য সে বিচারের স্থান এটা নয়। আমাদের মূল প্রমেয় এই যে শ্রুতি-নাটকের অভিনয়, আবৃত্তি নয়, কাব্য-নাট্যের না-আবৃত্তি না-অভিনয়ও নয়—এ অভিনয় মঞ্চাভিনয়ের বাচিক অভিনয়ের সমগোত্রীয়—বরং আরও নিখুঁত, আরও সূক্ষ্ম এবং আরও অব্যর্থ-ভাবপ্রকাশক হবে। আর এজন্য শ্রুতিনাটকের শিল্পীকে অবশ্যই কণ্ঠ-সাধনা করতে হবে। আবৃত্তিকারের কণ্ঠসাধনার চাইতেও এ সাধনা তীব্র ও কঠিন। এজন্য আমরা স্বর ও তা 'পোষা-পাখির মত' আজ্ঞাবহ ভৃত্যে পরিণত করবার নানা দিক সম্পর্কে আলোচনা করব।

ভাষার উদ্ভবের ইতিহাস :

নাটকের মূল উপজীব্য ভাষা। নাটকের চরিত্র ও সংঘাত ফুটে ওঠে ভাষার

মাধ্যমে। ভাষার দুই রূপ, লিখিত ও উচ্চার্য। আমাদের আলোচ্য বিষয় উচ্চার্যভাষা। অতএব আমরা ভাষার উদ্ভব থেকে শুরু করে, তার উচ্চারণ রীতি, উচ্চারণ যন্ত্রাদি এবং তার সুষ্ঠু ব্যবহারের রীতি বর্ণনা করব।

যে মিলন মন্ত্রে মানুষের জন্ম, সেই মন্ত্রের বশেই মানুষ গড়ে সমাজ। অবশ্য শুধু মানুষ নয়, প্রাণী মাত্রেই সমাজ গড়ে—সামাজিকতা শুধু মানুষের নয়, প্রাণী মাত্রেরই ধর্ম।[১] ভাষাই এই সমাজ বন্ধনের সূত্র। সব ভাষা সমান স্ফুট নয়। জীবজন্তুর ভাষা অপরিণত, অস্ফুট। মানুষের ভাষাও আগে অপুষ্ট ও অপরিণত ছিল। এখন তা অনেক পুষ্ট ও পরিণত।

এই সামাজিকতার তাগিদেই আদিম মানুষ গড়েছিল পরিবার, দল, গোষ্ঠী। কোনটা আগে, কোনটা পরে, তা নিয়ে বিবাদের মধ্যে না গিয়ে আমরা গড়-সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, তারা সমবেতভাবে খাদ্য আহরণ ও শিকার করত। নানা রকম চিৎকার ধ্বনি ও অঙ্গ-ভঙ্গি করে পারস্পারিক ভাব প্রকাশ করত। এই বন্যস্তরের মানুষের 'প্রকৃত ভাষা' ছিল না।

বন্যস্তর পার হয়ে মানুষ যেদিন আদিম-প্রস্তরযুগে এসে হাজির হল, শিখল আগুন জ্বালাতে, শিখল অগ্নিদগ্ধ খাদ্য খেতে, বানাল তীর ধনুক, শুরু করল চামড়ার ব্যবহার, সেই কালেই সৃষ্ট হ'ল কথার ভাষা (articulate language)। বিজ্ঞানীরা যে সব পুরোন মাথার খুলি পেয়েছেন, সেগুলি পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, বন্যস্তরে পশুপাখির মস্তিষ্কের আবরণের সঙ্গে মানুষের মস্তিষ্কের আবরণের পার্থক্য ছিল মাত্র পরিমাণগত—এবারে সে পার্থক্য হয়েছে গুণগত। তার উর্ধ্বতন মস্তিষ্কের আবরণের শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে প্রবল।

এল নতুনপ্রস্তর যুগ। মানুষ তখন গ্রাম্য সমাজ গড়েছে। স্থায়ী হয়ে বসেছে। ভবিষ্যৎ গড়ে উঠেছে তার। সঞ্চয় শিখেছে। শিখেছে বাণিজ্যিক লেনদেন। গড়ে উঠেছে শিল্প। এরই পর্যায়ক্রমে গড়ে উঠল লেখার ভাষা—বর্ণমালা। না, হঠাৎ এক দিনে গড়ে ওঠেনি বর্ণমালা। নানা কর্মপ্রেরণা নানা প্রাকৃতিক সামাজিক আঘাত-সংঘাতের ভেতর দিয়ে লিপিমালার একটা বোধগম্য রূপ প্রতিষ্ঠিত হল।[২] পরবর্তী স্তরগুলিতে মানুষ যতই সভ্য হয়েছে ততই তার ভাষা হয়েছে বলিষ্ঠ। তার চিন্তা হয়ে সূক্ষ্ম। কিন্তু অন্য প্রাণী পড়ে থেকেছে সেই বন্যস্তরে।

অন্য প্রাণীর সঙ্গে তুলনা করে তাই আমরা খুব সহজেই ধরতে পারি, মানুষের এই বাক্‌সমৃদ্ধির উৎস কোথায়। বিজ্ঞানীরা এর পুরো কৃতিত্ব

---

১. R. m. MacIver and C. H. Page : *Society* p. 6-7 (London '55)

২. C. Stanislavski : *Building a Character* (London '65) p. 87

দিয়েছেন মানুষের উর্ধ্বতন মস্তিষ্কের গঠনপ্রকৃতির ওপর। মানুষের উর্ধ্বতন মস্তিষ্কের গঠন অনেক উন্নত। তার সমন্বয় স্থান (association area) অনেক বিস্তৃত। তাইত' মানুষ তার শ্রবণস্থান দিয়ে শব্দের কত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পার্থক্য ধরতে পারে, দৃষ্টিস্থান দিয়ে বোঝে দৃশ্যান্তরের কত তুচ্ছাতিতুচ্ছ দ্রব্যাদি। মস্তিষ্কের সামনের দিকে যে সমন্বয় স্থান (frontal association area) তার দ্বারা মানুষ সব বোঝে, অর্থ করে, ব্যাখ্যা করে। বাইরের বস্তু দর্শন, শ্রবণ ও অনুভবনের মাধ্যমে সমন্বয় স্থানের ক্রিয়ায় অনুপ্রাণিত করে ক্ষুদ্র মস্তিষ্ককে (cerebellum)। এরই ফলে হয় বাক্‌-সৃষ্টি।

মানুষের উর্ধ্বতন মস্তিষ্কাবরণ বিশেষভাবে বাকশক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত। এতে আছে দশহাজার কোটিরও বেশি স্নায়ুকোষ। এদের গতি ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে মানুষ দেখতে, শুনতে, বলতে, লিখতে পারে।[৩]

কিন্তু ধ্বনি সৃষ্টির যন্ত্র ভিন্ন। দেহ তার জন্য যে ষড়যন্ত্র করেছে তার নাম স্বরযন্ত্র। এর অনেকগুলি অংশ : মুখ-গহ্বর, জিহ্বা, দন্ত, ওষ্ঠ, মাড়ী, তালু, মূর্ধা, আলজিব, গলবিল, নাসাপার্শ্বস্থ গহ্বরনালী, মুখ ও চোয়ালের পেশী, লারিংক্স ও ফ্রেরিক্স পেশি, সুষম্নাশীর্ষ, ফ্রেনিকস্নায়ু, মধ্যচ্ছেদা ইত্যাদি। এগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করবার রিমোট কন্টোল যন্ত্র যেন ক্ষুদ্রমস্তিষ্কের হাতে। তিনি কথা বলাতে পারেন, কথা গোপন করতেও পারেন। ইনি বিকল হলে বাকবন্ধ হয়ে যায়। এজন্যই মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতে আর বাক্‌স্ফূর্তি হয় না।

স্বরোৎপত্তি

বুকভরে শ্বাস নিয়ে কণ্ঠনালীর ভেতর দিয়ে মুখপথে সেই শ্বাসকে বের করে দেবার পথে নানাভাবে বাধা দিয়ে আমরা নানা রকম স্বর উৎপন্ন করে থাকি।

কাজটাকে যদি ভাগ ভাগ করে দেখি তাহলে স্বরোৎপাদনকে তিন পর্বে ভাগ করা যায়।

ক. স্বরতন্ত্রীর কম্পন

খ. ঐ কম্পন তৈরীর জন্য শ্বাসের শক্তির প্রয়োগ।

গ. কম্পন-জাত স্বরকে নিশ্বাস বায়ুর মাধ্যমে বাইরে এনে ছড়িয়ে দেওয়া।

স্বরযন্ত্রের পরিচয়

আগের শিরোনামে আলোচনার শেষে আমরা দেহস্থিত একগাদা যন্ত্রের নাম বলেছি। তারা কেউ বা প্রত্যক্ষভাবে এই সব কাজের কোন না কোনটা করে অথবা করতে সহায়তা করে। তাই আমাদের উচিত দেহযন্ত্রগুলিকে বুঝে নেওয়া।

---

৩. Jon Eisenson : Improvement of Voice and Direction (New York, 1958) p. 23

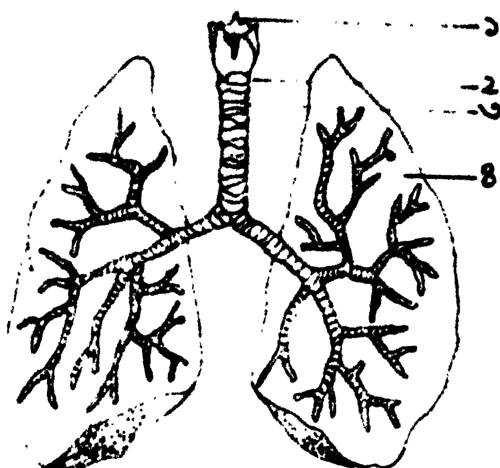
(১) *ফুসফুস বা বায়ুকোষ (lungs)*: স্পঞ্জের মত জিনিস দিয়ে মোচার আকারের যেন দু-টি বেলুন হল ফুসফুস। রয়েছে আমাদের বুকের খাঁচার মধ্যে একটি ডান দিকে, অন্যটি বাঁ দিকে। নাক আর গলার সঙ্গে সংযুক্ত শ্বাসনালী নেমে গিয়ে হঠাৎ দুভাগ হয়ে ঢুকে গেছে দুই ফুসফুসের মধ্যে। তারপর শাখা প্রশাখার মত ছড়িয়ে দিয়েছে ডালাপালা। ফলে যেই আমরা অনেক বাতাস শ্বাসনালী দিয়ে ঠেলে পাঠিয়ে দি, ফুসফুস দুটো বেলুনের মত ঠেলে উঠে; সে ঠেলায় ফুলে ওঠে বুকের পাঁজর। আর যেই শ্বাসনালী দিয়ে শ্বাস দেই বের করে, ওরাও চুপসে ঢুকে যায়, বুকের পাঁজর যায় নেমে। যে বাতাস না হলে আমরা স্বরতন্ত্রীতে কম্পন তুলতে পারি না আর তাকে বয়েও আনতে পারি না, তার সবটাই নির্ভর করে ফুসফুসের বাতাস ধরে রাখবার শক্তির উপর। যিনি যত বেশি বাতাস ধরে রাখতে পারেন, তিনি তত বেশিক্ষণ একদমে বলতে পারেন। একথাটা কণ্ঠশিল্পীদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে।

(২) *বক্ষগহ্বর (thorax)*: চলতি কথায় আমরা একে বলি বুকের খাঁচা। বুকের কঙ্কালের মাঝখানে যে ফাঁকটা থাকে, তাকেই বলি বক্ষগহ্বর। শিরদাঁড়া, কাঁধের হাড়, বুক ও পাঁজরের হাড়ের মধ্যে ফাঁকা অংশই বক্ষগহ্বর। এখানে থাকে হৃদ্‌পিণ্ড, ফুসফুস এবং উদর। একটা পাতলা পর্দা বা ডায়াফ্রম দিয়ে উদর আর বক্ষগহ্বর ভাগ করা থাকে।

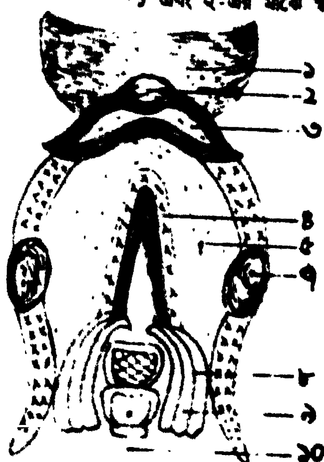
(৩) *শ্বাসনালী (trachea)*: মুখগহ্বরের তল থেকে একটা লম্বা গোল [illegible] মত নেমে গেছে শ্বাসনালী। খানিক গিয়ে ভাগ হয়ে ঢুকেছে দুই ফুস[illegible] নটি গোলাকার কোমলাস্থি (cartilage) দিয়ে তৈরী হয়েছে শ্বাস[illegible]। কোমলাস্থিগুলো সংযুক্ত আছে কতকগুলো টিসু (tissue) দিয়ে। টিসুগুলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, সেগুলো খানিকটা পেশির মত কাজ করে। 'শ্বাসনালী' নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে নাকের সঙ্গে এর যোগ আছে। নাসারন্ধ্র আর শ্বাসনালী মধ্যে আছে স্বরযন্ত্র। ছোট্ট যন্ত্র। কিন্তু গুরুত্বে এবং কর্মক্ষমতায় অতুলন। শ্বাসনালীর সঙ্গেই নিশ্বাস ছাড়াবার এবং প্রশ্বাস গ্রহণ কববার নালী যুক্ত থাকে।

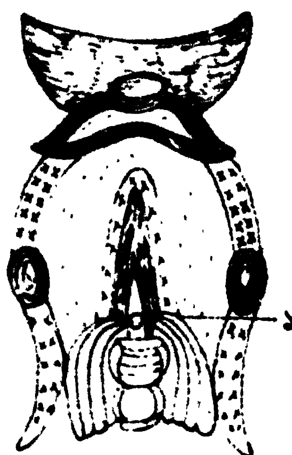
(৪) *গলবিল (pharynx)*: গলবিল দিয়েই নাক থেকে স্বরযন্ত্র সংযুক্ত রয়েছে। গলবিলের মুখে আলজিব। শব্দ সৃষ্টি হলে গলবিলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। আলজিব আটকে উত্তেজনা কমান যায়। এবং খুলে বাড়ান যায়।

(৫) *মধ্যচ্ছেদা (diaphragm)*: এটি বক্ষগহ্বরের মাঝামাঝি যেন সার্কাসের ট্রাপিজ খেলা দেখাবার নেটের মত টাঙ্গান রয়েছে। এ যেন ফুসফুসকে বেড়ে উঠে উদরের অন্ত্র-পাকস্থলী ইত্যাদিকে চাপ দিতে দিচ্ছে না। আবার প্রয়োজনে খানিকটা চেপে বাড়তেও দিচ্ছে। মোট কথা ফুসফুসে আমরা যত খুশি বাতাস



১—জিহ্বামূল ২—ক্রিকয়েড কোমলাস্থি ৩—শ্বাসনালী ৪— ফুসফুস
(১ এবং ২-এর মধ্যে স্বরযন্ত্র)





(উলটো আকৃতির মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গা শ্বাস-নিশ্বাস যাতায়াতের পথ)

১—জিহ্বার মূল ২—শ্বাসযন্ত্রের [illegible] পর্দা ৩—শ্বাসযন্ত্রের ঢাকনা ৪—কৃত্রিম স্বরতন্ত্রী ৫—স্বরতন্ত্রী ৬—স্বরযন্ত্রের পেশী ৭—থাইরয়েড কোমলাস্থি ৮—এরিটেনয়েড কোমলাস্থি ৯—স্বরযন্ত্রের পেশী ১০—ক্রিকয়েড কোমলাস্থি।

ঠেলে ভরে দিতে পারি না শুধু মধ্যচ্ছেদার জন্য। এটি এক ধরণের পিছল শ্লেষ্মা-ঝিল্লি দিয়ে তৈরী।

(৬) *মধ্যচ্ছেদীয় স্নায়ু (phrenic nerve)*: এটি একটি রবারের মত কমতে বাড়তে পারে এমন স্নায়ু। গলার কাছাকাছি থেকে উঠে এটি যুক্ত আছে মধ্যচ্ছেদার সঙ্গে। ও যেন টেনে রেখেছে মধ্যচ্ছেদাকে। ফুসফুস বেশী চাপ দিলে এই স্নায়ু মধ্যচ্ছেদাকে টেনে রেখে ফুসফুসের বৃদ্ধিকে সংযত করে। শ্বাস ছেড়ে দিলে সহজ হয়ে আসে।

(৭) *সুষুম্নাশীর্ষ (medulla)*: আমরা আগে যেমন ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের কথা বলেছি, যা আমাদের অনেকগুলি অনুভূতির নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র, ঠিক তেমনি নিশ্বাস প্রশ্বাসজাত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার কেন্দ্র অবস্থিত সুষুম্নাশীর্ষে। এটি মেরুদণ্ডের শীর্ষে অবস্থিত। সুষুম্নাশীর্ষ প্রত্যক্ষতঃ ধ্বনি-উৎপাদন করে না। তবে যেহেতু সে শ্বাসপ্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র, অতএব তার সম্পর্কে জেনে রাখা দরকার। সুষুম্না দুর্বল হলে শ্বাস-প্রশ্বাসের অসুবিধা হয়।

(৮) *সুষুম্নাকাণ্ড (spinal cord)*: মেরুদণ্ডের মধ্যে থাকে সুষুম্নাকাণ্ড। সে এবং তার পেশীগুলি নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে।

এই অষ্ট কাণ্ডের পর আমরা মূল স্বরযন্ত্রের কথা জেনে নেব। বেশ রোগা হাড় জিরজিরে পুরুষ মানুষের গলার দিকে তাকালে টিয়া পাখির ঠোঁটের মত একটা জিনিস তার কণ্ঠনালী ভেদ করে বেরিয়ে আসতে চাইছে, দেখা যায়। এটাই আসল স্বরযন্ত্র—Larynx। মজার কথা এই যে উর্ধ্বমস্তিষ্কের মত এটিও মানুষের ক্ষেত্রে অতিপুষ্ট ও পরিণত। একারণেই মানুষের কণ্ঠস্বরে এত বৈচিত্র্য। অন্য কোন প্রাণীর স্বরযন্ত্র এত পুষ্ট ও পরিণত নয়। নানা কারণেই এ যন্ত্রটিকে বিশদভাবে জানা দরকার।

আগের পাতার দিকে তাকালে দেখা যাবে যে ছবির ঠিক মাঝে উল্টো 'ভি' আকারের দুটি কালো রেখা টানা আছে। এ দুটিই সূক্ষ্ম স্বরতন্ত্রী। আমরা যখন বুকের ভেতর থেকে বাতাস টেনে স্বরযন্ত্রের ভেতর দিয়ে পাঠাই তখন স্বরতন্ত্রীদ্বয় প্রায় ঠোঁটের মত কাজ করে। এ জন্য কোন কোন ধ্বনিবিজ্ঞানী এদের নাম দিতে চান 'স্বরোষ্ঠ' (Vocal Lips)। ফুসফুস থেকে বায়ু এদের ঠেলে মাঝের পথ দিয়ে বেরুতে চায়—যায়ও। কিন্তু যাবার কালে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হয় নানা রকম। ফলে তন্ত্রী দুটির কম্পনেরও রকমফের ঘটে। তারই ফলে তৈরী হয় নানা রকম স্বর।

নারী পুরুষের স্বরতন্ত্রীর পার্থক্য থাকে। পুরুষের স্বরতন্ত্রী ৭/৮ ইঞ্চি থেকে ১১/৪ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়, নারীর ক্ষেত্রে তা হয় ১/২ইঞ্চি থেকে ৭/৮ইঞ্চি

পর্যন্ত। একারণেই নারীর স্বর ঈষৎ তীক্ষ্ণ ও কোমল, পুরুষের স্বর মোটা ও কর্কশ।

দুটি স্বরতন্ত্রীর মধ্যবর্তী ফাঁককে গ্লটিস বলে। বাতাস যাবার সময় গ্লটিসের প্রকৃতি ও গুণের ওপর ধ্বনির রকম নির্ভর করে। বাতাস বের হবার সময় স্বরতন্ত্রী যদি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয় তবে সৃষ্ট হয় ঘোষধ্বনি, তেমন প্রভাবিত না হলে হয় অঘোষধ্বনি।

স্বরযন্ত্রে ওপর থেকে ঠোঁট পর্যন্ত অংশকে বলা হয় মুখবিবর। চোয়াল দিয়ে আমরা মুখগহ্বরের ওপরের অংশ থেকে নিচের অংশকে দূরে নিতে পারি। ওপরের অংশ স্থির, নিচের অংশকে নাড়ান যায়। মুখ গহ্বরের মধ্যে চোয়ালবাহিত অংশের ভিতরে নিচের দিকে জিভ লাগান থাকে। জিভের অন্যপ্রান্ত স্বাভাবিকভাবে দন্তমূল স্পর্শ করে থাকে। জিভকে উল্টিয়ে তার মূল স্পর্শ করান যায়। ওপরের মুখ গহ্বরের দন্তমূলের পরেই কঠিন-তালু। কঠিন-তালুর পরেই জিব দিয়ে স্পর্শ করলে বেশ নরম বোধ হয়। একে বলে কোমল তালু। কোমল তালু শেষ হয়েছে আলজিবের কাছে। এর প্রত্যেকটি অংশ উচ্চারণ শুদ্ধতার জন্য আমাদের কাজে লাগে। এজন্য এগুলি চিনে রাখা কণ্ঠশিল্পীর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

স্বরোৎপাদন ও নিশ্বাস প্রশ্বাস :

অনেকেই এই সাধারণ ধারণা রাখেন, যে কোন ধ্বনির উৎপত্তির কেন্দ্রে থাকে কম্পন। আমাদের স্বর উৎপাদনের শ্বাসনালীতে থাকে স্বরতন্ত্রী (vocal cord)। এই গুলির কম্পন থেকেই স্বরের সৃষ্টি হয়। আবার স্বরতন্ত্রীর আকার প্রকারের ওপর স্বরের চরিত্র নির্ভর করে। পুরুষের স্বরতন্ত্রী দুই সেমি-এর চেয়ে একটু বড় হয় এবং খুব বেশি বড় হলে তিন সেমির কাছাকাছি। মেয়েদের স্বরতন্ত্রী সব সময়েই ছোট হয়। পুরুষদের স্বরতন্ত্রীর দৈর্ঘ্য সবচেয়ে যতটা ছোট হতে পারে, মেয়েদের স্বরতন্ত্রীর দৈর্ঘ্য হয় সবচেয়ে ততটা বড়। স্বাভাবিক দৈর্ঘ্য ১.২৫ সেমির কাছাকাছি। আবার মেয়েদের স্বরতন্ত্রী ছেলেদের স্বরতন্ত্রীর চেয়ে একটু বেশি পুরু হয়। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের এই ভেদ থেকেই নারী পুরুষের স্বরের তারতম্য ঘটে। অর্থাৎ স্বরতন্ত্রীর দৈর্ঘ্য প্রস্থের ভেদ ঘটাতে পারলেই পুরুষ নারীর এবং নারী পুরুষের স্বরের নকল করতে পারে।

এই স্বরতন্ত্রীকে কাঁপাতে প্রয়োজন শক্তির। আমরা এজন্য শ্বাস নিয়ে ফুসফুস ফুলিয়ে রাখি বাতাসে। এই বাতাস এসে আঘাত করে স্বরতন্ত্রীতে। তার থেকেই ধ্বনির সৃষ্টি। কিন্তু কে বয়ে নিয়ে যাবে সেই ধ্বনি? সে কাজও করে ঐ নিশ্বাস। কোন ব্যক্তির স্বরের ত্রুটি অর্থই তার যন্ত্রের ত্রুটি। কিন্তু যন্ত্রকে কার্যকর করতে বাতাসের বা নিশ্বাসের ভূমিকা প্রধান। এজন্য বক্তা-

গায়ক, অভিনেতা সকলকেই শ্বাস নিয়ন্ত্রণের কলা-কৌশল জানতে হয়।

নিশ্বাস-প্রশ্বাস যে শুধু আমাদের স্বরসৃষ্টিতে সাহায্য করে এমন নয়। প্রশ্বাস (যে শ্বাস প্রবেশ করছে) থেকে রক্তকণা হিমগ্লোবিনের সাহায্যে অক্সিজেন টেনে নিয়ে ছড়িয়ে দেয় সারা দেহে আবার দেহের সমস্ত টিসু থেকে কার্বন-ডাইঅক্সাইড টেনে এনে তা পাঠিয়ে দেয় ফুসফুসে। সেখান থেকে নিশ্বাস (নির্গত যে শ্বাস)-এর সঙ্গে ঐ কার্বন-ডাই-অক্সাইড বেরিয়ে আসে নাক মুখ দিয়ে। এমনি করে প্রতি মুহূর্তে দেহকে সজীব এবং কর্মশক্তিতে ভরপুর রাখছে নিশ্বাস-প্রশ্বাস। তাই শুধু স্বর-সৃষ্টির জন্য নয় দেহকে প্রয়োজনীয় মাপে বিশুদ্ধ ও কর্মক্ষম রাখবার জন্যও কণ্ঠজীবীকে (যাঁরা কণ্ঠকে উপজীবিকা হিসাবে ব্যবহার করেন, যেমন গায়ক, বক্তা, অভিনেতা, আবৃত্তিকার, হরবোলা) বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করতে শিখতে হয়।

শ্বাসের প্রকারভেদ

শারীরবিদেরা বলেন, শ্বাস তিনরকম। জন্মমুহূর্ত থেকে মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সব সময় নাক দিয়ে জলস্রোতের মত শ্বাস গ্রহণ-বর্জন চলছে। একেই তারা বলেন শ্বাসপ্রবাহ। আগের বর্ণনা থেকে মনে হতে পারে যে, আমরা যতটা শ্বাস নিয়ে থাকি, তার থেকে অক্সিজেনটুকু মাত্র গ্রহণ করে বাকী সবটাই বুঝি বা নিঃশ্বাসের সঙ্গে বের করে দি। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তা ঘটে না। আমরা দেখি যে ফুসফুস অসময়ে কাজে লাগাবার জন্য সর্বদাই খানিকটা বাতাস সঞ্চয় করে রেখে দেয়। একে অবশিষ্ট-শ্বাস (residual breathing)বলা হয়। বিশেষ বিশেষ কাজে বেশি নিশ্বাস দরকার হলে ফুসফুস বাড়তি শ্বাস টেনে নেয়। একে অনুপূরক-শ্বাস (supplemental breathing) বলে। গায়ক, অভিনেতা, বক্তা বা শ্রমজীবি মানুষকে অনুপূরক শ্বাস গ্রহণ করতেই হয়।

শ্বাসের নানা রীতি :

শ্বাস গ্রহণবর্জনের রীতিও তিনরকম। স্বাভাবিক অবস্থায় ফুসফুস প্রশ্বাসে বেড়ে উঠে। ঐ বেড়ে ওঠার ফলে উদর গহ্বরের নানাস্থানে চাপ পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত পেটটা ফুলে ওঠে। নিশ্বাস ছেড়ে দিল পেট আবার নেমে যায়। এভাবে প্রশ্বাস নিলে বুক এবং পাঁজরের নিচের দিকটা সামান্য বাড়লেও পেট ফুলেই বেশি বাতাসের জায়গা করে দেয়। এ জন্য একে উদর-রীতিও বলা যায়।

দ্বিতীয় পদ্ধতিতে শ্বাস-গ্রহণ করলে পাঁজর ফুলে ওঠে। পাঁজরের হাড় এবং পেশি ওপর দিকে ফুলে উঠে ফুসফুসের পাশে জায়গা করে দেয়। এজন্য একে পঞ্জরাস্থি-রীতি বা পার্শ্বিক-রীতি বলে।

তৃতীয় রীতিতে ফুলে ওঠে কণ্ঠাস্থি। এজন্য একে বলা হয় কণ্ঠাস্থি-রীতি।

এই তিন রীতির মধ্যে কণ্ঠাস্থি-রীতিতে বাতাস সবচেয়ে কম সংগৃহীত হয়। ফলে গায়ক বক্তা বা অভিনেতাকে বারবার শ্বাস টানতে হয়। তা ছাড়াও এভাবে শ্বাস নিলে কণ্ঠ এবং স্বরযন্ত্রের পেশীগুলোর ওপর অকারণে চাপ পড়ে। এর ফলে স্বরযন্ত্র আপনা থেকেই উত্তেজিত থাকে। তখন তা স্বরবৈচিত্র্য সৃষ্টি-সহায়ক হয় না। এজন্য কণ্ঠজীবীরা এ রীতি বর্জন করবেন—বা বলা যায় নেহাৎ প্রয়োজন না হলে এ রীতির ব্যবহার করবেন না।

আমরা আগেই বলেছি, উদর-রীতিই আমাদের স্বাভাবিক রীতি। এতে প্রচুর হাওয়া টানা যায়। কিন্তু যে সব কণ্ঠজীবীর পক্ষে উদররীতি যথেষ্ট বাতাস দিতে পারে না, সহায়ক হিসাবে তখন তাদের পঞ্জরাস্থিরীতি গ্রহণ করতে হয়। এই রীতিতে উদরনীতির চেয়ে বেশি শ্বাস টানা যায়। কণ্ঠজীবীদের মূলতঃ এই দুটি রীতির ওপরেই নির্ভর করতে হয়। গানেব দীর্ঘ তান বা দীর্ঘ আবেগময় সংলাপের জন্য উদররীতির চেয়ে পঞ্জরাস্থিরীতি বেশি কার্যকর।

শ্বাস গ্রহণ

আমরা সাধারণভাবে যখন স্থির থাকি তখন যে অনুপাতে প্রশ্বাস নি এবং শ্বাস ছাড়ি, তার থেকে যখনই কথা বলি, তখন সেই অনুপাতের পরিবর্তন ঘটে। কথা বলবার সময় যতক্ষণ ধবে প্রশ্বাস নি, তাব চেয়ে বেশি সময় ধরে নিশ্বাস ছাড়ি। কারণ, একটু একটু করে ছেড়ে ছেড়ে স্বরসৃষ্টি করতে হয়।

সাধারণ মানুষের চেয়ে কণ্ঠজীবীকে বেশি স্বরোৎপাদন করতে হয়। এজন্য তার আরও বেশি বাতাস আটকে রাখা এবং তাকে নিয়ন্ত্রণ করবার শক্তি থাকা দরকার। আবার এটা যথা-সম্ভব স্বাভাবিক হওয়া দরকার। একটা দৌড় প্রতিযোগিতার শেষে এসে একজন প্রতিযোগী যেমন হাঁপাতে থাকেন, কণ্ঠজীবীকে তা করলে চলবে ন। অতিরিক্ত শ্বাস গ্রহণ করে বা অনেক ক্ষণ ধরে সেই শ্বাস ছেড়েও তিনি স্বাভাবিক থাকবেন। এজন্য নাক-মুখ-গলা সব খোলা রেখে সহজ স্বাভাবিকভাবে পূর্ণমাত্রায় প্রশ্বাস গ্রহণ এবং স্বচ্ছন্দভাবে অবিরাম নিশ্বাস ত্যাগের অভ্যাস করা কণ্ঠজীবীর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা দরকার। স্বরবৈচিত্র্য সৃষ্টিতে বক্ষ গহ্বরের নিম্নভাগ এবং উদর বিশেষভাবে সহায়ক হয়। এজন্য কাঁধ বা বুকের খাঁচার ওপরের দিকটায় বেশি জোর না পড়াই ভাল।

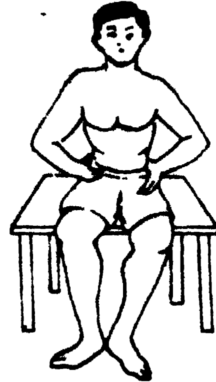
প্রশ্বাস নিশ্বাস এর ব্যায়াম :

এখানে আমরা কয়েকটি সাধারণ ব্যায়ামের নির্দেশ করলাম। এগুলি দ্বারা নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণে আনা যায়।

।। প্রাণায়াম।।

প্রথম রীতি

পদ্ধতি ঃ শক্ত কাঠের আসনে শিথিলভাবে বসতে হবে। দু পায়ের পাতার সবটা মাটিতে বসান থাকবে। পা দুটি থাকবে পাশাপাশি সংলগ্ন। দেহের ওপর ভাগও শিথিল থাকবে, বিশেষ করে শিথিল থাকবে কণ্ঠনালী, বুক আর পেট। কোমরের কাপড় থাকবে আলগা। হাত দুটি একটু ভাজ করে এমনভাবে দুপাশে রাখা হবে যাতে বুড়ো আঙ্গুল দুটো পিছন দিকে পাঁজরের ওপর এবং অন্যান্য আঙ্গুলগুলো পাঁজরের নীচে পেটের ও পর থাকবে। সাবধান, আঙ্গুল যেন কোথাও চাপ সৃষ্টি না করে। এবার নাক দিয়ে শ্বাস নিতে হবে, ধরে রাখতে হবে, ছেড়ে দিতে হবে। এই তিন ক্রিয়ার নাম পূরক (পূরণকরা।), কুম্ভক (কুম্ভের মত ধরে রাখা), রেচক (বর্জন করা)। সামনে টেবিলে একটা ঘড়ি থাকলে ভাল হয়। কারণ পূরক-কুম্ভক-রেচকের নির্দিষ্ট সময় অনুপাত আছে। তা হ'ল ১ ঃ ৪ ঃ ২ অর্থাৎ পূরক ১ সেকেণ্ড হলে কুম্ভক ৪ সেকেণ্ড আর রেচক ২ সেকেণ্ড।



পূরক	→	কুম্ভক	→	রেচক
[শ্বাস নেওয়া]		[ধরে রাখা]		[ছেড়ে দেওয়া]

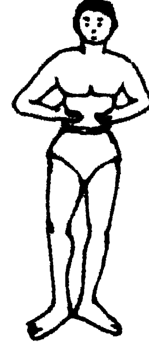
সাবধানতা।। দেহ সর্বদাই শিথিল থাকবে। হাতের আঙুলে শুধু পেটের ওঠানামা অনুভব করতে হবে। শ্বাস নেওয়া বা ছাড়ার সবটা সময় সমান ভাবে কাজ করতে হবে। সব কাজটা হবে স্বচ্ছন্দ।

ক্রমে কুম্ভকের পরিমাণ ৩২ সেকেণ্ডে আনতে হবে। এটা এক সপ্তাহে হবে না। তাড়াহুড়ো করবার দরকার নেই। দেখা গেছে সাধারণ স্বাস্থ্যের মানুষও ১৬ সেকেণ্ড কুম্ভক দিয়ে শুরু করতে পারে। অতএব প্রথম সপ্তাহে ৪-১৬-৮ রীতিতে শুরু করা যেতে পারে। দ্বিতীয় সপ্তাহে বাড়িয়ে ৬-২৪-১২ এবং তৃতীয় সপ্তাহে ৮-৩২-১৬তে পৌঁছান যায়। ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে এই অনুপাত আরও বাড়ান যায়।

স্থায়িত্ব।। কখনই এক সঙ্গে পাঁচ মিনিটের বেশি ব্যায়াম করবার দরকার নেই। পাঁচ মিনিট প্রাণায়াম করবার পর, অন্তত এক মিনিট বিশ্রাম নেওয়া উচিত।

দ্বিতীয় রীতি

সহজ ভাবে দাঁড়াতে হবে। পায়ের পাতা সম্পূর্ণভাবে মাটিতে পাতা থাকবে। গোড়ালি দুটি থাকবে সোজা এবং বুড়ো আঙুল দুটির মধ্যে থাকবে পাতার দৈর্ঘ্য অনুসারে ৪ থেকে ৬ ইঞ্চি ফাঁক। শিরদাড়া সম্পূর্ণ সোজা থাকবে অথচ সর্বদেহ থাকবে শিথিল । হাতের আঙুলগুলি আগের রীতির মতই পাঁজরের ওপরে এবং পেটের ওপর রাখতে হবে। এবার পর্যায়ক্রমে নাক দিয়ে এবং মুখ দিয়ে নিশ্বাস নিতে হবে আর উভয় ক্ষেত্রেই মুখ দিয়ে ছাড়তে হবে। এবারে যতক্ষণ ধরে নেওয়া হবে, ধরে রাখা হবে তার দ্বিগুণ আর ছাড়বার সময় এক-দুই করে গুণতে গুণতে ছাড়তে হবে কুম্ভকের সমান সময় ধরে। অর্থাৎ-এর অনুপাত হবে ১ : ২ : ২।



এটিও এক সঙ্গে পাঁচ মিনিটের বেশি করা উচিত নয়। বিশ্রাম থাকবে। সতর্কতা পূর্বের মতই।

তৃতীয় রীতি

এ রীতি দ্বিতীয় রীতির অনুরূপ। এখানে পাশাপাশি না রেখে সামনে পিছনে করে ভারসাম্য বজায় রেখে দাঁড়াতে হয়। বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য শ্বাস নেওয়া এবং ছাড়ার সময় 'আ' ধ্বনি করা যেতে পারে। শ্বাস ধরে রাখার সময় 'হুম্' ধ্বনি সৃষ্টিকরা যায়।

যত দিন যাবে ততই বৈচিত্র্য আনবার জন্য দীর্ঘ ছন্দবদ্ধ কবিতা আবৃত্তি শুরু করা যেতে পারে।

স্বরস্তর :

শ্রুতি-নাটকের অভিনেতা-অভিনেত্রীকে স্বরস্তর সম্পর্কেও ধারণা রাখতে হয় এবং এবিষয়ে কণ্ঠকে অনুশীলিত করতে হয়। আসলে, সুপরিণত স্বাভাবিক কণ্ঠ খুব কম লোকেরই থাকে। কারো থাকে প্রাবল্যের অভাব, কারো কণ্ঠ হয় নাকী বা ফ্যাসফেসে, কারো হয় অর্দ্ধস্ফূট কারো বা কাষ্ঠ্যধ্বনিযুক্ত। আবার শারীরিক অবস্থার ভেদেও স্বরের তারতম্য ঘটে। বয়স বা মানসিক অবস্থাও কণ্ঠস্বরের তারতম্য ঘটায়। তবে অবস্থা যাই হোক না কেন অনুশীলন দ্বারা তাকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। বক্তা নিজের স্বর সৃষ্টির প্রত্যেকটি ধাপকে বারবার পরীক্ষা করবেন এবং যাচাই

করবেন তাঁর ত্রুটিটি ঠিক কোন ধাপে। সেটা সংশোধনের চেষ্টা করলে অনেক সুফল পাওয়া যাবে।

কোন্ কোন্ দিকে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা নজর দেবেন?

১. ফুসফুস থেকে হাওয়া আসা পর্যাপ্ত এবং স্বাভাবিক কি?

২. সে হাওয়া স্বরতন্ত্রীতে যোগ্য কম্পন সৃষ্টি করতে পারছে কি?

৩. সেই সৃষ্ট-স্বর অনুরণন স্থানগুলিতে (নাক, গলা, মুখ ইত্যাদি) যথেষ্ট অনুরণন সৃষ্টি করতে পারছে কি?

৪. জিহ্বা-দ্বারা কণ্ঠ তালু-মূর্ধা-দন্ত ও ওষ্ঠ সঠিক ভঙ্গিতে স্পর্শিত হয়ে ধ্বনিগুলি সঠিকভাবে উচ্চারিত করছে কি?

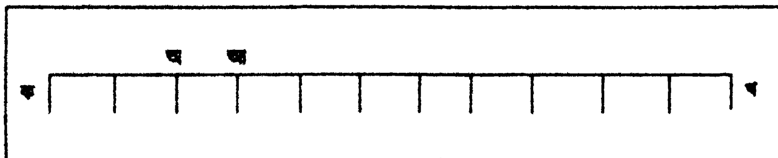
৫. উচ্চারণে আবেগ ও ভাবের রং লাগাতে পারছি কি?

এর প্রথম তিনটি বিষয় সম্পূর্ণভাবে স্বরযন্ত্রে নির্ভরশীল। চতুর্থটি অভ্যাসের ব্যাপার। পঞ্চমটিও তাই। প্রথম তিনটি সাধারণ ত্রুটি পূর্বে যে ব্যায়ামগুলির কথা বলা হয়েছে তাতে সংশোধিত হতে পারে। যে কোন ব্যাকরণ বইতে ধ্বনির উচ্চারণস্থান বর্ণিত থাকে। সে অনুসারে স্পষ্ট উচ্চারণের অভ্যাস করলে চতুর্থ ত্রুটিও সংশোধন করা যায়। শেষ ত্রুটির জন্য কণ্ঠের স্বরস্তর-নিয়ন্ত্রণ শিক্ষার প্রয়োজন হয়।

স্বর উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী কাঁপে। যত বেশি কাঁপে স্বর তত মিহি হয়। যত কম কাঁপে তত হয় মোটা। পুরুষের সাধারণ কম্পন সংখ্যা থাকে ১২৮ আর মেয়েদের স্বরতন্ত্রীর কম্পন সংখ্যা ২৫৬-র কাছাকাছি। এই স্বরতন্ত্রী কাঁপাবার সময় পাশে অন্য পেশীর (crico-thyroid এবং thyro-arytenoid) ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় কখনও সংকুচিত কখনও প্রসারিত হয়। স্বরতন্ত্রী সংকুচিত হলে উচ্চ পর্দার স্বর আরও প্রসারিত হলে নিচু পর্দার স্বর সৃষ্টি হয়। এমনি করে কোন একজনের কণ্ঠ থেকেই নানা পর্দার স্বর সৃষ্টি হতে পারে। এই পর্দাকেই ইংরাজীতে (pitch) পিথ্ বলে।

আমরা যখনই কথা বলি তখনই স্বরের একটা পর্দা থাকে। কোন রকম মানসিক আবেগ বা উত্তেজনা ছাড়া আমরা যে পর্দার কথা বলি, তাকেই আমাদের স্বাভাবিক পর্দা বলে ধরতে হবে। নিজেকেই নিজে শোনবার মত করে যখন পড়ি বা স্ফুটকণ্ঠে যখন একা প্রার্থনা করি, তখন আমরা স্বাভাবিক পর্দার ব্যবহার করি। কিন্তু যখন দু-একজন কাছের লোককে শোনাতে কথা বলি তখন আর স্বাভাবিক পর্দায় কথা বলি না, কথা বলি ওর থেকে একটু উঁচু পর্দায়। এটাকে বলা হয় অভ্যস্ত পর্দা। বেশির ভাগ সময় আমরা অভ্যস্ত পর্দাতে কথা বলি।

শুধু স্বাভাবিক এবং অভ্যস্ত পর্দা নয়। একজন মানুষ সাধারণ-ভাবে গোটা বার পর্দার ব্যবহার করতে পারেন। মুখের হাসি হাসি ভাব বজায় রেখে, কোন রকম বিকৃতি না ঘটিয়ে সুষ্ঠুভাবে শোনা যায়—এমন উচ্চারিত ধ্বনিকে তাঁর



স্বরস্তরের বিস্তৃতি রেখা

সর্বনিম্ন পর্দ্দা ধরা হবে। আর অনুরূপভাবে উচ্চারিত সর্বোচ্চ ধ্বনিকে ধরা হবে সর্ব্বোচ্চ পর্দা। সর্ব নিম্ন পর্দা থেকে যে কেউ ধাপে ধাপে সর্বোচ্চ পর্দায় তুলতে পারেন কণ্ঠ। এই সমগ্র পথটিকেই বলা হবে তাঁর স্বরস্তরের বিস্তৃতি। দেখা গেছে স্বরস্তর স্বাভাবিক পর্দা থেকেও বেশ খানিকটা নিচুতে নামতে পারে। সমগ্র পথের ১/৪ থেকে ১/৩ অংশের মধ্যে থাকে স্বাভাবিক পর্দা। ওপরের রেখাটিকে বারটি পর্দায় ভাগ করা হয়েছে। ঐ রেখা (ক-খ) যদি সমস্ত স্বরস্তর হয়ে তবে অ-আ-র মধ্যে কোথাও হবে স্বাভাবিক পর্দা। যে কোন কণ্ঠজীবী প্রথম স্থির করে নেবেন তাঁর স্বাভাবিক কণ্ঠপর্দা। তারপর তাকে ভিত্তিমূল (Base) ধরে স্বর-সাধনা করবেন। ভিত্তিমূলকে ধরতে হবে মুদারার 'সা'। ক্রমে রে-গা-মা-পা-ধা-নি—পর্যন্ত উঠতে হবে। সঙ্গে যদি একটি হারমোনিয়ম পাওয়া যায় খুবই ভাল না হলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু কণ্ঠস্বরকে নিজের আয়ত্তে আনতে গেলে স্বর-সাধনা করতেই হবে। জনচিত্ত জয় খুব সহজ ব্যাপার নয়।

মনোভাব কণ্ঠস্বর ও গতিবেগ।

মনোভাবের সঙ্গে কণ্ঠস্বরের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। মনোভাবের বৈচিত্র্যে কণ্ঠস্বর কখনও উঁচু পর্দায় ওঠে, কখনও নিচু পর্দায় নামে। কখনও তার স্থায়িত্ব বাড়ে, কখনও কমে। এর ফলে আমরা কথা না শুনে স্বর শুনেও মনোভাব বুঝতে পারি। এটা নিয়ন্ত্রিত হয় স্বরস্তর ও বলার গতিবেগ থেকে। অতএব অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরস্তর ও গতিবেগও নিয়ন্ত্রণ করবেন।

মনোভাবের দিক থেকে স্বরস্তরের এই পরিবর্তন সম্পর্কে একটি তালিকা নিচে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক অভিনেতা-অভিনেত্রী অবশ্য এই তালিকা স্মরণে রাখবেন এবং সেই অনুসারে নিজ উচ্চারণ নিয়ন্ত্রণ করবেন।

ক. হতাশা, বিষাদ বা বিমর্ষতা মানুষের কাজ-কর্মে যেমন শিথিলতা আনে, ঠিক তেমনি কথার গতিবেগও হয় মন্থর এবং স্বরস্তরও নিচে নেমে আসে।

খ. গম্ভীর ও ধীর-ভাবের ক্ষেত্রে গতিবেগ আরও মন্থর হয়—স্বরস্তর প্রায় ভিত্তিমূলে নেমে আসে।

গ. আনন্দ, উল্লাস আকস্মিক বিস্ময়, সুজাগ্রত অহংবোধ, সাফল্যের গর্ব, সাদর সম্ভাষণের উত্তাপে মানুষের হৃদস্পন্দন যেমন বেড়ে যায়—কথা বলার গতিবেগও তেমন বাড়ে। স্বরস্তরও হয় উন্নত।

ঘ. ঝগড়া, ভর্ৎসনা, স্পর্দ্ধা-প্রকাশ, অবজ্ঞা-প্রদর্শন, আলোড়ন বা ক্রোধের ভাব মানুষকে উত্তেজিত করে—ব্যবহারে দ্রুততা দেখা যায়। এজন্য এমন উত্তেজিত ক্ষণে উচ্চারণের গতিবেগ আরও বাড়ে, কণ্ঠের কোমলতা দূর হয়, স্বরস্তর শুধুই উঁচু হয় না, তাতে প্রাবল্যও দেখা দেয়।

ঙ. অসুস্থতা, উদ্বেগ, নেশাগ্রস্ততা, ক্লান্তি ইত্যাদি উদ্যমশূন্যতা বোঝাতে স্বর মৃদু হয়। স্বরস্তর হয় নিচু। গতিবেগ অতি মন্থর হয়ে পড়ে।

চ. ভয় ও আতঙ্কে স্বরের গতিবেগ বাড়ে। স্বরস্তর নিম্নের কাছাকাছি এসে যায়, কম্পিত হতে থাকে।

ছ. স্নেহ বা ভালবাসার প্রকাশে, লজ্জা বোঝাতে স্বরের গতি হয় মধ্যম। স্বরস্তর প্রায় ভিত্তিমূলে নেমে আসে।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রেও ভাব ও কণ্ঠস্বরের মধ্যে সম্পর্ক দেখিয়ে কয়েকটি সূত্র রচিত হয়েছে।

ভাব		গতি	স্বরস্তর
ক.	রতি, হাস, করুণ	বিলম্বিত	মন্দ্র
খ.	বীর, ক্রোধ, অদ্ভুত	দ্রুত	উচ্চ
গ.	ভয় ও জুগুপসা	দ্রুত	নিম্ন

ইংরাজী গ্রন্থগুলি এই প্রসঙ্গে Inflexion (ইনফ্লেক্সন) নামে একটি বিষয়ের অবতারণা করেছে। বাঙলায় স্বরবিদেরা একে আনতি বা বাঁক বলে নির্দ্দেশ করেছেন। স্বরকে একই স্তরে রেখেও তাকে উর্ধ্ব, অধ বা বক্র গতি দেওয়া যায় আর একেই বলে আনতি বা বাঁক। আনতিকে ছয় রকম বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

১. সরল উত্থান
২. সরল পতন
৩. চক্র উত্থান
৪. চক্র পতন
৫. জটিল উত্থান
৬. জটিল পতন

এই প্রসঙ্গে স্বরের গভীরতা (tone quality) এবং তীব্রতা (tone quantity) সম্পর্কেও ধারণা রাখা দরকার। একই স্বরস্তরে রেখে স্বরকে কখনও তীব্র বা নরম বা মৃদু করা যায়। একেই বলা হয় স্বরের গভীরতা। স্বরস্তর উঁচু কি নিচু তা বোঝায় স্বরের তীব্রতা।

৪

সংলাপ উচ্চারণ ও নাট্যরস

শিল্পীরা যখন শ্রুতিনাটকের সংলাপ উচ্চারণ করে অভিনয়ে নামবেন তখন মনে রাখবেন, তাদের এই কাজ দুটি দিক থেকে তাৎপর্যময় করে তুলতে হবে।

এক. উচ্চারণের দিক থেকে

দুই. নাট্যবস্তুর দিক থেকে

যে কোন রকম কাণ্ঠ্য বিষয়েরই প্রথম লক্ষ্য থাকে নানাদিক থেকে উচ্চারণের বিশুদ্ধতা। সঠিক ধ্বনিটি উচ্চারণ মাত্রই কিন্তু শুদ্ধতার মাপকাঠি নয়। আমরা চাই শুদ্ধতা, স্পষ্টতা, চাই শ্রোতার কানে পৌঁছাবার মত জোর, চাই তার অর্থ ভাব ও সৌন্দর্য গ্রহণে শ্রোতাকে সাহায্য করা। এরপরে আসে নাট্যিক প্রয়োজনে তাকে ব্যবহারের কথা। প্রাথমিক দাবীগুলি পূর্ণ না হলে, নাট্যিক প্রয়োজনের বাড়তি বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি ব্যর্থ হতে বাধ্য।

উপরে সংলাপ উচ্চাবণকে শুধু ধ্বনিগত দিক থেকে বিচারের যে কথা বললাম, তাকে বিশ্লেষণ করলে মোট চারটি সূত্রের সন্ধান পাই। তাকেই আমরা বিশুদ্ধ উচ্চারণ বলব, যার মধ্যে নিম্ন বৈশিষ্ট্যগুলি আছে।

১. উচ্চারণের স্পষ্টতা
২. উচ্চারণের ধ্বনিগত শুদ্ধতা
৩. শ্রোতার কর্ণগোচর করার মত স্বরের উচ্চতা
৪. উচ্চারণের কৌশলে অর্থ, ভাবও সৌন্দর্য উপভোগে সাহায্য করা।

এই প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে গেলে আগে থেকে সতর্ক ও সচেষ্ট হতে হয়। বার বার অনুশীলনের দ্বারা এই বৈশিষ্ট্যগুলি অর্জন করা যায়।

সুস্পষ্ট উচ্চারণ

জিভ এবং কানকে সচেষ্ট ও সজাগ রাখলেই আমরা সুস্পষ্ট উচ্চারণ করতে পারি। প্রত্যেকটি ধ্বনি উচ্চারণের জন্য বাকযন্ত্র ও জিভকে একটা বিশেষ ভঙ্গি গ্রহণ করতে হয়। জিভকে তা করতে বাধ্য করতে হবে। কখনই কোন কারণেই অস্পষ্ট উচ্চারণকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

এজন্য কানকেও সর্বদা সজাগ রাখা দরকার। উচ্চারণ স্পষ্ট কিনা, তার বিচার করে কান। নিজে উচ্চারণ করে তার স্পষ্টতার বিচার করা দরকার। অপরের উচ্চারণকেও বিশ্লেষণ করে ত্রুটিগুলো বুঝে নিতে হয়।

উচ্চারণকে স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন করবার জন্য পাঠের কালে প্রত্যেকটি শব্দ কেটে কেটে উচ্চারণ করা দরকার। শব্দগুলো লিখবার সময় আমরা যেমন প্রত্যেক শব্দের শেষে খানিকটা ফাঁক রেখে আর একটা শব্দ বসাই, উচ্চারণের কালেও তেমনি প্রত্যেক শব্দের পর একটু ছেদ থাকা দরকার। কিন্তু এই ছেদ দাড়ি কমার থামার মত নয়। তার থেকে অনেক অনেক অল্প এই থামা। অথচ এটুকু না থাকলে স্বর শ্রোতার কানে জড়িয়ে যায়। একটা হ্যাঁউ হ্যাঁউ শব্দ মাত্র শোনা যায়। পদগুলো পৃথকভাবে কানে গিয়ে পৌঁছায় না।

স্পষ্ট উচ্চারণের জন্য আরও একটি সতর্কতা প্রয়োজন। বাক্যের শেষে গিয়ে থামতে হবে, এই বিষয়টি অধিকাংশ সময় অভিনেতা-অভিনেত্রীর মনে এমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে যে, বাক্য যতই শেষ হয়ে আসে, কণ্ঠ ততই মৃদু হয়। ফলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাক্যের শেষ পদ শ্রুতিগোচর হয় না। এজন্য, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, আকাশবাণীর ঘোষকেরা, বাক্যের শেষ পদ একটা ঝোঁক দিয়ে শেষ করেন। এতবড় ঝোঁক দেওয়াটা বাঙলা উচ্চারণরীতির অনুসারী নয়। তবু মনে হয়, শেষ একটু চাপ দিয়ে উচ্চারণ না করলেও শব্দটা শোনাবার অন্য পথ নেই।

বাক-যন্ত্রের যে কোন অংশের দুর্বলতার জন্য অনেক সময় স্পষ্ট উচ্চারণ করা সম্ভব হয় না। কারো জিভ মোটা থাকে, কারো থাকে বেঁটে। প্রয়াসের অনুপযুক্ততায় অনেকের জিভ ঠিক ঠিক মত স্পর্শনীয় স্থানটি স্পর্শ করে না। এজন্যই স্পষ্ট উচ্চারণ হয় না। এ দোষ থেকে মুক্ত হতে গেলে প্রত্যেক বর্ণ উচ্চারণে জিভের নির্দিষ্ট ভঙ্গিটি জানা দরকার। এবং জিভকে সেই অনুসারে ভঙ্গি দিতে চেষ্টা করতে হবে, তা হলেই স্পষ্ট উচ্চারণ সম্ভব হবে।

অনেক সময় জিভ এত অবাধ্য থাকে যে এ সব চেষ্টা চালানও সম্ভব হয় না। তখন, জিভের ব্যায়াম করে জিভকে নমনীয় করে নিতে হয়।

১. জিভকে নমনীয় করতে হবে।
২. প্রত্যেক বর্ণ উচ্চারণে জিভের নিজস্ব ভঙ্গি আছে। জিভকে ঐ ভঙ্গি গ্রহণে বাধ্য করতে হবে।
৩. প্রত্যেক শব্দের পরে একটু সময় ছাড় থাকবে।
৪. বাক্যের শেষপদ যেন নিচু স্বরে বা ক্রমোক্ষীয়মান স্বরে উচ্চারিত না হয়।

আমরা জিভের ব্যায়াম সম্পর্কে পরে বলেছি। ধ্বনির উচ্চারণ-স্থান সম্পর্কে পড়তে গেলে উঁচুক্লাসের ব্যাকরণ বই দেখলেই চলবে। সুনীতিকুমার

চট্টোপাধ্যায়ের 'ভাষাপ্রকাশ বাঙলা ব্যাকরণ' (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত)[১] বিশেষভাবে সাহায্য করতে পারে।

উচ্চারণের বিশুদ্ধতা

লিখিত ভাষায় বর্ণগুলি আসলে আমাদের মুখের ভাষার এক একটি ধ্বনির প্রতীক। বাঙলায় বর্ণ সংখ্যা পঞ্চাশটি (১১+৩৯)। এই পঞ্চাশটি বর্ণ দিয়ে সমস্ত রকম ধ্বনি প্রকাশ করতে গিয়ে প্রায়ই অসুবিধা হয়। আমরা ঠিক যা বলি তা লিখি না। আবার যা লিখি তা উচ্চারণ করি না।

ব্যাপারটা উদাহরণ না দিয়ে বোঝা যাবে না। ধরা যাক একটি নাম অতুল বসু। যে বানান লিখেছি সে অনুযায়ী উচ্চারণ হওয়া উচিত অ+ত্+উ+ল+অ ব+অ+স্+উ। কিন্তু উচ্চাবণ করি ও+ত+উ+ল ব+ও+স+উ = ওতুল বোসু।[১]

আমরা লিখি পক্ক | প অ ক ব অ | অথচ উচ্চারণ করি প অ ক ক অ = পক্ক। একই বানান লিখি 'বেলা' কিন্তু উচ্চারণ করি ব এ ল আ (তীর অর্থে), বয়্যালআ ব্যালা (সময় অর্থে)। লিখি লক্ষ্মণ, অথচ উচ্চারণ করি 'ল ক্ খ ন'। লিখি 'ক'রে', উচ্চারণ করি 'কোরে'। তা হলে দেখা যাচ্ছে, বানান অনুযায়ী উচ্চাবণই বিশুদ্ধ উচ্চাবণ নয়।

বিশুদ্ধ উচ্চারণ বলতে আমরা প্রচলিত উচ্চারণ রীতিকেই বুঝি। অতএব বিশুদ্ধ উচ্চাবণ শিখতে গেলে একদিকে যেমন সকলের উচ্চাবণ শুনে তার থেকে বিশুদ্ধতা খুঁজে নিতে হবে, অন্যদিকে বাঙলা উচ্চাবণ রীতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জেনে নিতেও হবে। যে কোন ব্যাকবণ বইতেই মোটামুটি রীতিগুলির আলোচনা পাওয়া যাবে। সংক্ষেপে কয়েকটি সাধারণ রীতি বর্ণনা করছি।

স্বরবর্ণের উচ্চারণ রীতি

।। অ ।।

বাঙলায় 'অ' ধ্বনির উচ্চারণ বিবিধ রকম হয়ে থাকে। কোথায় কেমন হবে তা সতর্কভাবে অনুধাবন করা দরকাব। এখানে কয়েকটি মাত্র উদাহবণ দিলাম।

১. *স্বাভাবিক উচ্চাবণ* : 'অ'-এর স্বাভাবিক উচ্চাবণ Ball (বল) এব 'অ'-এর মত। এই উচ্চারণেব সূত্র :
   - O একাক্ষর শব্দের 'অ' সর্বদা শুদ্ধ :— চল্, বল্, জল্।
   - O সহ-অর্থে স প্রথমে থাকলে, অ—শুদ্ধ ।। সপুত্রক, সস্ত্রীক, সক্ষম।
   - O ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রথমে অক্ষরে অ—শুদ্ধ। (আসলে এখানে শব্দটি একাক্ষর) খশ খশ, মড় মড়, দপ দপ।

---

১. শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। ভাষাপ্রকাশ বাঙলা ব্যাকরণ (প্রথম সংস্করণ : কলি. বিশ্ববিদ্যালয় : ১৯৪২) পৃ. ৩২।

- আদিতে নঞ্ (নাই বা না)-অর্থক 'অ'-কারের উচ্চারণ স্বাভাবিক হয়। যেমন, অহিংসা, অচেনা, অতুল, অনর্গল, অসুখ। [এর ব্যতিক্রমও আছে। শব্দটি নাম হলে 'অ' ও-এর মত উচ্চারণ হয়।]
- 'আ'কারের আগের 'অ' শুদ্ধ থাকে। যেমন, কথা, সদা, শতাব্দী।
- 'সম'-এর সঙ্গে যুক্ত 'অ' এবং অনুস্বর বিসর্গের সঙ্গে যুক্ত 'অ'—শুদ্ধ। যেমন সমর্পণ, সংযোগ, শঙ্কর, অংশ, প্রাতঃকাল। [এর কিছু ব্যতিক্রম আছে সংকুল, সন্তুষ্ট।]

২. *ও-ধ্বনির কাছাকাছি উচ্চারণ :*

- ই, উ, ঋ বা য-ফলান্ত উচ্চারণের আগে 'অ'-কার' 'ও' ধ্বনির মত হয়। যেমন,
  অতি = ওতি, মণি = মোণি। হলুদ = হোলুদ। মসৃণ (=মোসৃণ) মধু = মোধু, প্রবৃত্তি = প্রোবৃত্তি। জন্য = জোন্য। বক্তৃতা (= বোক্তৃতা)
- জ্ঞ, ক্ষ, ন এর পরবর্তী অ-কার বহুক্ষেত্রে এরূপ হয়। যেমন,
  যজ্ঞ = যোজ্ঞ। রক্ষা—রোক্ষা।
- র-ফলা যুক্তবর্ণের সঙ্গে অ-যুক্ত থাকলে, সেই অ 'ও'-তে পরিণত হবেই। যেমন ভ্রম (= ভ্রোম), শ্রম (= শ্রোম), প্রমাণ (= প্রোমাণ)।
- ঐ ঔ-এর পর অ-ধ্বনি ওতে পরিণত হয়।
  দৈব = (দৈবো), শৈল (=শৈলো), গৌণ (= গৌণো) ।
  কিন্তু র-ফলার পর 'য়' থাকলে অ-বিকৃত হয় না। শুদ্ধ হয়। যেমন—ক্রয়, ত্রয়, ত্রয়োদশ।
- অভিশ্রুতি-জাত শব্দগুলির এ-কার বা ও-কারের পূর্ববর্তী অ-কার সংবৃত হয়। যেমন, বলিয়া > বলে = বোলে। জলা > জলো = জোলো বসিল> বসল = বোস্ল [প্রথমটি মূল শব্দ > অভিশ্রুতি-জাত লিখিত রূপ = উচ্চারণ।]
- অনেক বিশেষণ এবং ক্রিয়াপদের শেষ অ-কার সংবৃত হয়। ভাল (= ভালো)। মত (=মতো)। দেখ্ল (দেখলো)।
- নিজন্ত ক্রিয়াপদের শেষ 'অ'-কার ওতে পরিণত হয়। যেমন, করান (=করানো), খাওয়ান (খাওয়ানো), দেখান (দেখানো), মোছান (= মোছানো) ।।
- তর, তম, ক্ত প্রত্যয়যুক্ত শব্দের শেষের অ-ধ্বনি ও-র মত উচ্চারিত হয়। যেমন, মহত্তর (= মহত্তরো) প্রিয়তম (=

প্রিয়তমো) গৈ + ক্ত = গীত (গীতো) রক্ষিত (= রক্ষিতো)। কিন্তু এগুলি বিশেষ্য হলে তখন 'অ' বিকৃত হবে না—'ও' ত' নয়ই গীত রক্ষিত পালিত ।।

O প্রায় সব ক্রিয়াপদের শেষ অ, ও তে পরিণত হয়। দেখ (= দ্যাখো), খাইল (= খাইলো),

৩. *অনুচ্চারিত অ-কার* : বাঙলায় অনেক অ-কারান্ত শব্দের শেষ অ-কারটি উচ্চারিত হয় না। শব্দটি হসন্ত উচ্চারণ হয়।

O শব্দের শেষ অ-কারটি যুক্তাক্ষরের সঙ্গে যুক্ত না হলে গ্রস্ত হয়। যেমন, মন (মন্)। বালক (বালক্)। চালাক (চালাক্)। কিন্তু যুক্তাক্ষরের সঙ্গে অ-কারের স্বাভাবিক উচ্চারণ হয়। যথা, সত্য, বিঘ্ন, স্পষ্ট। এই নিয়মের ব্যতিক্রমও আছে।
যেমন সমস্ত তৎসম শব্দের শেষে ক্ত-প্রত্যয় জাত 'ত' থাকে, সে 'ত্'-এর পরবর্তী অ-কার গ্রস্ত হয় না। যেমন, নত, স্থিত, গলিত, ইত্যাদি।

O দ্বিমাত্রিকতার প্রভাবে বহুক্ষেত্রে শব্দের মধ্যস্থিত অ-কার লুপ্ত হয়। যেমন, কারসাজি (= কারসাজি)। বাড়তি = (বাড়তি)। কলসী (= কলসী)। আমলকী (= আমলকী)।

।। আ, ই, ঈ, উ, ঊ ।।

বাঙলায় সংযুক্ত বর্ণের পূর্বে থাকলে বা অনুস্বর বা বিসর্গের স-যুক্ত হলে, প্রায় সর্বত্র, বিশেষত কবিতায়, দীর্ঘস্বর তো দীর্ঘ হয়ই, হ্রস্বস্বরও দীর্ঘ উচ্চারণ হয়। যেমন, নিস্তার (= নি-স্তার)। ঈর্ষা (= ঈ-র্ষা)। উত্থান (উ-থান)। মনঃকষ্ট (মন-কষ্ট)। আংশিক (= আং-শিক)।

O বাঙলায় বহু দীর্ঘস্বররের হ্রস্ব উচ্চারণ হয়। যেমন, আদিম, ঈশান (ইশান)। ঊষা (= উ-ষা)।

O পরে অনুচ্চারিত অ-কার থাকলে পূর্বস্বর ঈষৎ দীর্ঘ হয়। যেমন, ইট (ঈ-ট)। উট (= ঊ-ট)।

ঋ, ৠ, ঌ :

বাঙলায় ৠ ও ঌ-এর ব্যবহার নেই। কেবল কয়েকটি সংস্কৃত ধাতুমূল (দৄ, গৄ, স্তৄ) দেখাবার জন্য সামান্য ও সীমাবদ্ধ ব্যবহার আছে। ঋ-কারের উচ্চারণ 'র-ই' বা 'রি'-র সঙ্গে অভিন্ন হয়। তবুও প্রাচীন রূপ বজায় রাখবার জন্য ঋ ব্যবহার হয় মাত্র। উচ্চারণ 'রি'ই থাকে। যেমন, ঋণ (= রিণ)। তৃতীয় (= ত্রিতীয়)। ঘৃত (= ঘ্রিত)। তৃণ (= ত্রিণ)।

।। এ ।।

বাঙলায় এ-কারের উচ্চারণ দুই রকম হয়—স্বাভাবিক ও বিকৃত।

১. বাঙলায় এ-কারে স্বাভাবিক উচ্চারণ অনেকটা ইংরাজী bell-এর 'e'-উচ্চারণের মত। যেমন, সে, কেন্দ্র, বেদ, বেদে, জেলে, বেশ, কেশ, হাসে, বসে, নরেন্দ্র ইত্যাদি।

২. এ-কারের বিকৃত উচ্চারণ ইংরাজী black-এর 'a'-র উচ্চারণের মত যেমন, এক (= অ্যাক্), গেল (= গ্যাল), যেমন (= য্যামন)। আধুনিক বাঙলায় বিশেষত চলতি বাঙলায় অনেকেই একারের বিকৃত উচ্চারণকে 'াা'-দ্বারা লিখে থাকেন। যেমন, গ্যাস, প্যান্ট, ধ্যাবড়া।

।। ও ।।

ও-বর্ণের উচ্চারণ go-এর 'o' ধ্বনির মত। সংস্কৃত ব্যাকরণ মতে 'ও' একটি দীর্ঘস্বর। বাঙলায় 'ও' কিন্তু হ্রস্ব উচ্চারিত হয়। যেমন, কোল, ঝোল, ভূগোল, লোক, কোন, লোপ। কিন্তু অনুস্বর, বিসর্গ বা যুক্তাক্ষরের পূর্ববর্তী ওকার দীর্ঘ হয়। যেমন, ওংকার (= ওংকার)। ওষ্ঠ (ওষ্ঠ)।

।। ঔ, ঐ ।।

এই দুইটি বর্ণই যৌগিকস্বর বা সন্ধ্যক্ষর। এদের উচ্চারণ মৌলিক বর্ণ দুইটির সম্মিলিত রূপ মাত্র। যেমন,—ঐ =অই : কৈ = কই। ঔ = অউ . বৌ = বউ।

ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ ও স্বরযন্ত্রের ব্যবহার

১. জিভের পিছন দিক ফুলিয়ে কোমল তালু স্পর্শ করে যে জিহ্বামূলীয় কোমল তালুঘটিত ধ্বনি সৃষ্টি করা যায়—ক-বর্গীয় বর্ণগুলির উচ্চারণ ঠিক তেমনি।

২. জিভের ডগা পাতলা এবং ছুচলো করে এনে নিচের পাটির দন্ত বা দন্তমূল স্পর্শ করে চ-বর্গ উচ্চারিত হয়। খেয়াল করলে দেখা যাবে, তখন জিভের ডগার সংলগ্ন অংশ ওপরের দন্তমূলকে খুব মৃদুভাবে স্পর্শ করেছে বা অল্পের জন্য করেনি।

৩. জিভের ডগা সামান্য উল্টে ওপরের পাটির দন্তমূল স্পর্শ করে ট-বর্গ উচ্চারিত হয়।

৪. জিবের ডগা আরও বেশি উল্টে অর্থাৎ প্রতিবেষ্টিত করে উচ্চারণ করতে হয় প্রতিবেষ্টিত বর্ণ ড় ঢ়।

৫. ওপর পাটির দাঁতের সঙ্গে জিভের ডগা লাগিয়ে যে সব ধ্বনি পাওয়া যায় বর্গীয় ত-বর্গের উচ্চারণ রীতি অনুরূপ।

৬. দুটি ঠোঁট বন্ধ করে বা নিচের ঠোঁটকে ওপরের ঠোঁটের খুব কাছে

উঁচু করে আনবার ফলে যে জাতীয় ধ্বনি সৃষ্টি হয় প-বর্গীয় সেই জাতের।

৭. জিবের ডগা ওপর পাটির দাঁতের গোড়া স্পর্শ করে র, ল ইত্যাদি উচ্চারণ করা যায়।

৮. জিহ্বার পাতা দ্বারা দন্তমূল স্পর্শ করে 'শ' উচ্চারিত হয়।

কয়েকটি বিশিষ্ট ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ রীতি

।। ঙ ।।

এটি কণ্ঠ্যবর্ণের নাসিক্য ধ্বনি। সংস্কৃতে এর উচ্চারণ ছিল সম্ভবহত গঁ-এর মত। বাঙলায় এর উচ্চারণ অনুস্বরের মত। এমন কি অন্য কণ্ঠ্যবর্ণ ক, খ, গ বা ঘ-এর সঙ্গে যুক্ত হলেও উচ্চারণের ব্যতিক্রম দেখা যায় না। যেমন, ব্যাঙ (= ব্যাং)। সঙ্গত (= সংগত)। ডিঙি (= ডিংই)। সঙ্কলন (= সংকলন)। শঙ্খ (শংখ)।

।। ঞ ।।

প্রাচীন বাঙলায় ঞ-এর উচ্চারণ সম্ভবত 'য়ঁ'-র মত ছিল। তাই 'লইয়া' অর্থে 'লঞা' লেখা হত। বর্তমানে যুক্তাক্ষর ভিন্ন ঞ-র ব্যবহার নেই। বর্তমানে চ, ছ, জ, ঞ-র পূর্বে এবং চ-ছ এর পরে ঞকে যুক্ত দেখা যায়।

- সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব বর্ণরূপে ঞ-র উচ্চারণ ন-এর মত। যেমন, চঞ্চল (= চনচল)। লাঞ্ছিত (= লানছিত)। গঞ্জনা (= গনজনা)। ঝঞ্ঝাট (= ঝনঝাট)। বাঞ্ছা (= বানছা)
- চ-এর পরে ঞ-র উচ্চারণ অনেকটা ন-র মত। যেমন, যাচঞা (= যাচনা)। কিন্তু জ-এর পরে ঞ-র উচ্চারণ এককালে ন এর মত থাকলেও বর্তমানে গ্ গঁ-এর মত উচ্চারণ হয়। যেমন, বিজ্ঞান (= বিগ্গাঁন)। যজ্ঞ (= যগ্গঁ)।

।। ণ ।।

এই বর্ণের প্রাচীন উচ্চারণ অনেকটা ড়ঁ-এর মত ছিল। কিন্তু বর্তমানে ন-এর সঙ্গে অভিন্ন। কিন্তু তৎসম বানানের প্রয়োজনে এই বর্ণ টিকে আছে। এ বিষয়ে ণত্ব বিধান দ্রষ্টব্য।

।। ড়, ঢ়, য় ।।

এই তিনটি বর্ণ সংস্কৃতে ছিল না। এই তিনটি বর্ণের মধ্যে ড় ও ঢ়-কে স্পর্শবর্ণের অন্তর্গত প্রতিবেষ্টিত বর্ণ বলে। এদের উচ্চারণ বেশ তরল অথচ অনেকটা 'র'-এর মত। যেমন, বাড়ি, আষাঢ়, বাড়ন্ত, খড়। শব্দের আদিতে কখনও ড়, ঢ়-এর ব্যবহার হয় না।

- 'য় বর্ণের উচ্চারণ অনেকটা 'ই-অ' বা ইংরাজী 'y-a'মত। যেমন, নিয়ম (= নিইঅম) ; কিন্তু সংস্কৃতে ঐ উচ্চারণের জন্য যে বর্ণ নির্দিষ্ট

ছিল তা 'য'। বাঙলায় য-এর উচ্চারণ জ-এর সঙ্গে অভিন্ন। যেমন, যদু (= জদু), যেমন (জেমন)। 'য' ফলারূপে যুক্ত হলে সাধারণত ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনটি দ্বিত্ব হয়। যেমন, বিদ্যা (=বিদ্দা)। রাজ্য (=রাজ্জ)। কিন্তু হ্-এর সঙ্গে য-ফলা যুক্ত হলে জ্ঝ-এর মত উচ্চারণ হয়। যেমন, বাহ্য (=বাজ্ঝ) সহ্য (সোজ্ঝ)। য-ফলা কোথাও কোথাও 'অ্যা'র মত উচ্চারিত্ হয়। যেমন, ব্যবহার (= ব্যাবহার), ব্যর্থ (= ব্যার্থ) ব্যগ্র (=ব্যাগ্র)।

।। শ, ষ, স ।।

বাঙলায় এই তিন বর্ণের উচ্চারণে কোন পার্থক্য রক্ষিত হয় না। তিন বর্ণেরই 'sh'-এর মত। যেমন, জিনিশ জিনিষ ও জিনিস। তবে, ঋ-কার, বা ব-ফলা যুক্ত হয়ে, ত-বর্গের সঙ্গে যুক্তাক্ষর গঠন করলে এই বর্ণত্রয়ের উচ্চারণ 's'(ছ)-এর মত হয়। যেমন মসৃণ (= মছ্রিণ)। বিস্তর (= বিছ্তর)।

তিন শ, ষ, স-এর পার্থক্য অবশ্য রক্ষা করা উচিত।

যুক্তাক্ষরের উচ্চাবণ বৈশিষ্ট্য

ঃ ক্ষ ঃ

ক ও ষ একত্রে যুক্ত হয়ে এই যুক্তবর্ণটি গঠিত হয়।

- কিন্তু বাঙলায় এই যুক্তাক্ষরের উচ্চারণ সাধারণত হয় 'ক খ'-এর মত। যেমন, ভিক্ষা (= ভিকখা)। লক্ষ্য (= লোকখ)।
- কিন্তু 'ক্ষ' যদি শব্দের আদিতে থাকে, তবে ঐ যুক্তাক্ষরের উচ্চাবণ দ্বিত্ব 'খ'-এর মত হয়। যথা, ক্ষণ (= খখন)। ক্ষীণ (= খখীণ)। ক্ষুধা (= খ খুধা)
- অন্য ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত হলে 'ক্ষ'-এর উচ্চারণ হয় খ-এর মতো। যথা—আকাঙ্ক্ষা (= আকাংখা)।

ঃ জ্ঞ ঃ

জ্ ও ঞ সম্মিলিত হয় 'জ্ঞ' যুক্তাক্ষর গঠিত হয়। কিন্তু বাঙলায় এর উচ্চারণ গ্যঁ। যেমন, আজ্ঞা (= আগ্ গাঁ বা আগ্যাঁ)। জ্ঞাতি (গ্যাঁতি)।

ঃ হ্ণ, হ্ন, হ্ম, হ্ল ঃ

এই কয়টি যুক্তাক্ষরের উচ্চারণে সর্বক্ষেত্রেই 'হ্' ধ্বনি পরে উচ্চারিত হয়। যেমন, পূর্বাহ্ণ (= পূর্বান্হ্)। জাহ্নবী (=জান্হবী)। ব্রাহ্মণ (ব্রাম্হণ)। প্রহ্লাদ (প্রল্হাদ)।

ঃ ম ফলা যুক্ত যুক্তাক্ষর ঃ

ম-ফলা যুক্ত যুক্তাক্ষরগুলির উচ্চারণ সাধারণত স্পষ্ট 'ম'-এর মত উচ্চারণ হয়। যেমন, কাশ্মীর (= কাশ্মীর)। উন্মাদ (= উন্মাদ)। শাল্মলী (= শাল্মলী)।

বহু বাঙলা শব্দের ম-ফলার ম-টি যে বর্গের বর্ণের সঙ্গে যুক্ত তারই অনুনাসিক ও দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়ে যায়। যেমন, আত্মা (= আত তাঁ)। মহাত্মা (= মহাত্ তাঁ)।

কোথাও কোথাও ম-ফলার উচ্চারণ সানুনাসিকে পরিণত হয় মাত্র —দ্বিত্ব হয় না। যেমন, স্মৃতি (সৃঁতি)।

ঃ য-ফলা যুক্ত যুক্তাক্ষর ঃ

শব্দের অন্তে বা মধ্যে য-ফলা থাকলে উচ্চারণকালে য-ফলাযুক্ত বর্ণের দ্বিত্ব হয় মাত্র। যেমন, বিদ্যা (= বিদ্দা)। বাক্য (বাক্ক)। সত্য (= সত্ত)।

- O হ-এর য-ফলা যুক্ত হলে হ্ এবং য-ফলা দুই-ই লুপ্ত হয়ে তার পরিবর্তে 'জ ঝ'-এর মত উচ্চারণ হয় যেথা, সহ্য (= সোজ্ঝ।) বাহ্য (বাজ্ঝ)

ঃ ব-ফলা যুক্ত যুক্তাক্ষর ঃ

বহু ব-ফলাযুক্ত বর্ণের উচ্চারণ স্বাভাবিক হয়। যথা, দিগ্বিজয়। আহ্বান। উদ্বাস্তু।

- O বহু ক্ষেত্রে 'ব'-ফলাটি অনুচ্চারিত থাকে। যেমন, উজ্জ্বল (= উজজল)। উচ্ছ্বাস (উচছাস)।
- O শব্দের প্রথম বর্ণ ব-ফলা যুক্ত হলে সাধারণত ঐ বর্ণে দ্বিত্ব উচ্চারণের অস্পষ্ট আভাস শোনা যায়। যথা, দ্বার = দদার। জ্বর = জ জর। ব-ফলা যুক্ত বর্ণটির পূর্বটি কখনও দ্বিত্ব হয়। যেমন, পক্ব = পকক। বিদ্বান = বিদাদান।

।। সারসংকলন ।।

এই সুদীর্ঘ আলোচনা সংক্ষেপ করা দরকার। মোট কথাগুলি এক করলে দাঁড়ায় ঃ

১। বাঙলা ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে স্পর্শ বর্ণগুলি পাঁচটি বর্গে বিভক্ত। এদের মূল বর্ণ ক্, চ্, ট, ত্, প্। বাকী বর্ণগুলি ঐ ধ্বনির সঙ্গে কখনও ঘোষতা, কখনও মহাপ্রাণতা বা কখনও আনুনাসিক্য যোগে গঠিত। এই কারণে উচ্চারণ খুব সতর্ক ভাবে না করলে অল্পপ্রাণ বর্ণ মহাপ্রাণ বর্ণে পরিণত হয় বা মহাপ্রাণ বর্ণ অল্পপ্রাণে পরিণত হয়। আবার ঘোষবর্ণ অঘোষবৎ বা অঘোষবর্ণ ঘোষবৎ উচ্চারণের প্রবণতা দেখা যায়। অতএব অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ সচেষ্টভাবে এই উচ্চারণগুলি অভ্যাস করবেন।

২। শ, ষ, স বর্ণের উচ্চারণে প্রায়ই বিশুদ্ধতা রক্ষিত হয় না। তালব্য শ ও দন্ত্য স এর ভেদ লুপ্ত করে অনেকে আবার সর্বত্র 'ছ'-এর

উচ্চারণ করেন। এই 'ছামবাজারের ছছিবাবুর' দল ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বিকার থেকে উচ্চারণ উদ্ধার করা উচিত।

৩। ঢ়, ড়, র বর্ণের উচ্চারণে বিশেষ পার্থক্য আছে। অনেকেই তিন 'র'-এর ভেদ রাখেন না! আশ্চর্য, বাঙলার একজন বিখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত গায়কের উচ্চারণে এই ভেদ দেখি না। সতর্ক হলে এ উচ্চারণ ত্রুটি মুক্ত হয়।

৪। চন্দ্রবিন্দু বা সানুনাসিক উচ্চারণ ঘটিত দুই রকম ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। কেউ এ জাতীয় উচ্চারণে চন্দ্রবিন্দুর বাহুল্য ঘটান, কেউ বা এজাতীয় উচ্চারণ সর্বত্র সযত্নে বাদ দিয়ে যান। দু-ই বর্জনীয়।

৫। বাঙলায় যুক্তাক্ষর বর্ণগুলির উচ্চারণরীতি সংস্কৃত থেকে ভিন্ন হয়ে গেছে। তাই বাঙলায় উচ্চারণ করতে গিয়ে যদি সংস্কৃতের অনুকরণ করা হয় তা শুদ্ধ বলে পরিগণিত হবে না। বাংলায় 'স্বামী' বলতে 'স্ ওয়া ম্ ঈ' উচ্চারণ চল্‌বে না। হবে 'সামী'। 'ব'-এর কোন রূপ চাপ আনতে গেলেই গ্রাম্য হয়ে যাবে। তা হয়ে যাবে 'সোয়ামী'র কাছাকাছি। সুনীতিবাবুর বইটি দেখুন।

৬। বাঙলায় বেশির ভাগ শব্দের অন্ত অকার উচ্চারিত হয় না—ওড়িয়ায় হয়। বাঙলায় বলি হাত, ভাত—ওড়িয়ায় বলা হয়, হাত, ভাত। কিন্তু তাই বলে যে সব শব্দই অন্ত অ-কার লুপ্ত হবে এমন নয়। বিদ্যাসাগর মশাই বর্ণ পরিচয়ের দুই খণ্ডেই অন্ত 'অ' সম্পর্কিত বিধিনিষেধের ইঙ্গিত দেওয়া আছে।

অনেক সময় ভুল ক্ষেত্রে অ-লুপ্ত করা হয়। কখনও বা উচ্চারিত হওয়া অ-কে লুপ্ত করা হয়। কোন আবৃত্তি-শিক্ষক বলে বেড়ান তৃণ (অ) উচ্চারণটি শুদ্ধ নয়, হব 'তৃণ্'। জানি না, কোন সূত্রে তিনি এ তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তবে শব্দটিতে অন্ত্য অ লুপ্ত হবে না। [পূর্বোক্ত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য]সাধারণভাবে তদ্ভব শব্দেই অন্ত্য-অ লুপ্ত হয়—তৎসম শব্দে হয় না।

৭। আবার অন্ত্যের অ লুপ্ত হয়, এমন শব্দও যখন সমাস-বদ্ধ শব্দের পূর্বপদ হয়, তখন সেখানে পূর্বপদের অ-কার লুপ্ত হয় না। সাধারণভাবে আমরা উচ্চারণ করি রূপ্ কিন্তু 'রূপবাণী' বলতে 'রূপ (অ) বাণী' বলা বিধিসম্মত। আকাশবাণী উচ্চারণে 'আকাশ্' উচ্চারণ করতে করতে আজ আমাদের কানকে সহ্য করিয়ে এনেছে। আজ 'আকাশ (অ)' বললেই বরং অস্বাভাবিক বোধ হয়।

ঠিক এমনি করে আকাশবাণী থেকে অনবরত বলা হচ্ছে 'লোক্‌গীতি' অথচ হওয়া উচিত ছিল 'লোক (অ) গীতি'। এখানে অবশ্য হিন্দী উচ্চারণের

প্রভাব ঘটেছে। এই নিয়ম অনুসারে 'দশ (অ) দিক, 'দুগধ ফেননিভ, 'বন (অ) জাত', 'শ্রম (অ) লব্ধ' উচ্চারণ করা উচিত। কিন্তু সুপ্রচলিত 'রেল বাজারকে' 'রেল (অ) বাজার', 'গাছ্ পাকা' কে 'গাছ্ (অ) পাকা', 'আকাশ্-গঙ্গা'কে 'আকাশ (অ) গঙগা' উচ্চারণ করা উচিত নয়।

৮। সমস্ত রকম আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক টান বাদ দিতে চেষ্টা করতে হবে। মোটামুটিভাবে মধ্যবঙ্গের উচ্চারণ রীতিই আজ বাঙলাভাষার উচ্চারণ রীতি বলে স্বীকৃত। এই কারণে পূর্ববঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ বা বীরভূম বাঁকুড়া অঞ্চলের টান উচ্চারণ-বিকার বলেই গণ্য করা হয়।

বাঙলায় উচ্চারণ দেখিয়ে একটি মাত্র অভিধান প্রচলিত আছে। সেটি দীর্ঘকাল অমুদ্রিত ছিল। এখন সাহিত্যসংসদ প্রকাশ করেছেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের এই অভিধান ব্যবহার করলে সুফল পাওয়া যাবে। এ ছাড়াও সুনীতিবাবুর পূর্বোল্লেখিত বইটিও ব্যবহার করা যায়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পূর্বোক্ত গ্রন্থ বা ড. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের 'স্বর ও বাকরীতি' দ্রষ্টব্য। বর্তমানে সাহিত্য সংসদ একটি উচ্চারণকোষও বের করেছেন।

শ্রোতার কর্ণগোচর করা

উচ্চারণের শুদ্ধতার পরেই অভিনেতা অভিনেত্রীর লক্ষ্য থাকবে তার কণ্ঠ শ্রোতার কর্ণগোচর করার দিকে। শ্রোতার কর্ণগোচর করতে গেলে মিনমিনে গলায় বিড়বিড় করে বললে চলবে না। কণ্ঠকে উচ্চগ্রামে তুলে, এমনভাবে বলতে হবে, যেন ওগুলি তার নিজেরই কথা। এই জন্য, কতদূর উচ্চে তুলব, সে বিষয়েও শিল্পীকেই সচেতন হতে হবে। গাঁক গাঁক করে চিৎকার করে শ্রোতার কানের বারোটা বাজিয়ে দিলে মোটেই তা শ্রুতিমধুর হয় না অতএব এ সম্পর্কে নীতি হবে না-জোর না-আস্তে। শ্রোতার কানে পৌঁছবার মত জোর হবে, কিন্তু তার বিরক্তি উৎপাদনের মত চেঁচান হবে না। মধ্যপন্থাই সেরা পন্থা

অনেক সময় সমাবেশ বড় হ'লে শব্দবর্দ্ধক-যন্ত্র বা মাইক্রোফোন ব্যবহার করা হয়। সভায় মাইক চালাবার এবং মাইকের সামনে বলবারও কতকগুলি রীতি আছে। সেগুলিও 'শ্রোতার কানে পৌঁছে দেবার রীতি'। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কোন সভা-সমিতিতেই এ নীতি পালন করতে দেখিনা। নীতিগুলি নিচে বলছি।

- মাইক এত উচ্চগ্রামে তোলা হবে না, যার ফলে শব্দ অস্বাভাবিক বেড়ে যায়। মাইকের কাজ হবে শব্দকে ঠিক ততটুকুই বাড়ান, যার ফলে শ্রোতার কানে পৌঁছায়মাত্র, বেশি দূর শব্দ ছড়াতে গেলে বিভিন্ন স্থানে একাধিক লাউডস্পিকার লাগাতে হবে। নইলে সেটা শ্রোতার কানকে পীড়িত করে।

○ মাইকের সামনে স্বাভাবিক কণ্ঠে অভিনয় করতে হয়। অনেকেই চেঁচান। ভাবেন, সমস্ত লোককে বুঝি বা চেঁচিয়েই শোনাতে হবে অথবা না চেঁচালে বোধ হয় মাইক তার আওয়াজ ধরতে পারবে না। এটা ভুলরীতি। মাইক স্পর্শকাতর যন্ত্র—সে সূক্ষ্ম শব্দও ধরতে পারে। এমন কি নিঃশ্বাসের শব্দও মাইকে ধরা পড়ে। এ জন্য অনেক সময় শব্দ-ঢালও ব্যবহার করা হয়। তাই মাইকের সামনে চেঁচান অনাবশ্যক। মাইকের সামনে উচ্চারণ অবশ্যই কেটে কেটে করতে হবে। নইলে 'শব্দজট' তৈরি হবেই।

অর্থ, ভাব ও সৌন্দর্যবোধ উপভোগে সাহায্য করা

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে কৌশলগুলি বর্ণনা করলাম, তাদের বলা যায় লক্ষ্যে পৌঁছাবার পাথেয়। এবার আমরা মূল লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা করব। এই লক্ষ্যে পৌঁছবার আকাঙক্ষাতেই সমস্ত আয়োজন। অতএব কেমন করে অতি সহজে শ্রোতার মনে বিষয়ের অর্থ ও ভাব সঞ্চারিত করা যায়, কেমন করেই বা ঐ অংশের ভাষাগত সৌন্দর্য শ্রোতার মনের সামনে উদঘাটন করা যায়, তার কৌশল জেনে নিতে হবে।

নাটকের দিক থেকে সংলাপ উচ্চারণে এই লক্ষ্যের গুরুত্ব অসাধারণ —বিশেষতঃ শ্রুতিনাটকে। কিছু শাব্দিক সংযোগ ছাড়া শ্রুতি নাটকের সবটাই নির্ভর করে সংলাপ উচ্চারণে। আবার, আমরা আগেই বলেছি, মঞ্চাভিনয়ের সব উপকরণ এমন কি কায়িক সাত্ত্বিক অভিনয়কেও বর্জ্জন করায় সংলাপ উচ্চারণের গুরুত্ব আরও বেড়েছে। সংলাপের প্রতিটি ধ্বনি নিখুঁত নিরিখে বিচার করে ভাবোদ্বোধক সংকেতটি উদ্ধার না করতে পারলে শ্রুতিনাটক সার্থক হতে পারে না।

তা হলে, শ্রুতিনাটকের সংলাপকে অভিনয়ের জন্য প্রয়োগ করতে অর্থাৎ নাটক রূপায়ন করতে, কোন কোন দিকে নজর দেব?

এক. নাট্যচরিত্র।।

অভিনয়ের একটা প্রধান কথা চরিত্র-সৃষ্টি। আবৃত্তির কাহিনীমূলক কবিতাতেও নাট্য-চরিত্র সৃষ্টির প্রয়োজন হয় না। তবে কোন কোন দীর্ঘ কাহিনীমূলক কবিতায় কবি সৃষ্ট সংলাপের ভিতর দিয়ে চরিত্রাভাস সৃষ্টি করা হয়। যেমন 'দেবতার গ্রাস' কবিতায় 'মৈত্র-মশাই'। লক্ষ্য করলে দেখবেন, আবৃত্তিকার দেবতার গ্রাস আবৃত্তি করতে গিয়ে কিন্তু সংলাপ কথনে ঐ মনোভাব ফোটান—চরিত্র নয়। তাতে কিন্তু আবৃত্তি খারাপ লাগে না। কিন্তু সংলাপকথন বা যাকে Diologue acting বলা হ'ত, তা শ্রুতিনাটকে প্রয়োগ করলে সার্থকতা আসবে না।

কিন্তু কিভাবে চরিত্র সৃষ্টি করা যাবে?

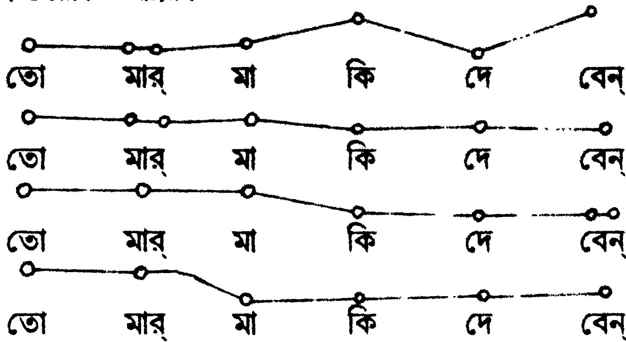
কোন নাট্যকারই কোন কাহিনীতে কোন চরিত্রেরই সামগ্রিক পরিচয় বর্ণনা করেন না। সমগ্র নাটকে আকারে ইঙ্গিতে চরিত্রটি সম্পর্কে যে সব তথ্য পাওয়া যায়, সেগুলি অবলম্বন করে খানিকটা সংযোজক কল্পনা মিশিয়ে মনে মনে একটা সমগ্র চরিত্র কল্পনা করে নিতে হয়। এই কল্পনায় চরিত্রটির শারীরিক, সামাজিক ও চারিত্রিক পরিচয় অবশ্য থাকবে। 'চন্দ্রশেখর' নাটকে মিরকাশিমের কতটুকু পরিচয় পাই? ঐ চরিত্রে রূপ দিতে হলে আমার মনের ভিতর সমগ্র মিরকাসিম যদি জাগ্রত না হয়, তবে শুধু ঐ সংলাপ বলে নাট্য চরিত্র ফুটতে পারেনা। শিল্পী অবশ্যই মনে মনে নাট্য-চরিত্র গড়ে নেবেন। এই চরিত্রের কথনভঙ্গি ও কণ্ঠস্বরের গাম্ভীর্য বা মৃদুতা অবশ্যই তখন শিল্পীর কাছে ধরা পরে। সংলাপ বলা মাত্র উপভোক্তার মনে চরিত্রের আদর্শ গড়ে উঠবে।

এমনভাবে মনে মনে নাট্য-চরিত্রের একটা সামগ্রিকরূপ কল্পনা না করে নিলে পোষাক-সাজসজ্জাদি মঞ্চনাটকের শিল্পীকে যে প্রেরণা দিয়ে নাট্য-চরিত্রে রূপ দিতে সাহায্য করে, শ্রুতিনাটকের শিল্পী সে জাতীয় প্রেরণা ব্যতিরেকে নাট্য-চরিত্রকে উপভোক্তার কাছে স্পষ্ট করতে পারবেন না। এই সামগ্রিক ভাবনা নাট্যচরিত্র সৃষ্টির প্রাণস্বরূপ।

সংলাপ বলবার সময় ঐ মানসিক চরিত্র ও পরিস্থিতিতে যেভাবে কথা বলতে পারতেন, সেই স্বরভঙ্গিই গ্রহণ করেন। অনেক সময় দেখা যায়, একই সংলাপ নানাভাবে বলা যায়—এক এক বলার অর্থ এক এক রকম হয়ে থাকে। যেমন, 'তুমি যাবে' এই বাক্যটি যদি কোন রকম ঝোঁক বা সুর প্রয়োগ না করে বৈচিত্র্যহীন উচ্চারণ করা যায়, তবে অনুজ্ঞা অর্থ বোঝায়— অর্থাৎ, 'আমার ইচ্ছা তুমি যাও'। কিন্তু ঐ বাক্যে তুমি সাধারণ স্বরে বলে কণ্ঠ নিচুতে নিয়ে ফের যদি উঁচুতে তোলা যায়, তবে অর্থ হয় জিজ্ঞাসার—অর্থ যাওয়াটা কি তোমার অভিপ্রেত? কিন্তু যদি 'তুমি যাবে'র প্রথম ও তৃতীয় অক্ষর উঁচু রেখে দ্বিতীয় ও চতুর্থ অক্ষর নিচু করা যায়, তবে তা হয়ে ওঠে হাস্যকর। বিষয়টি বোঝাতে চিত্রদেওয়া হ'ল।

তুমি যাবে = অনুজ্ঞা বোঝাতে
তুমি যাবে = জিজ্ঞাসা বোঝাতে
তুমি যাবে = অর্থহীন তাই হাস্যকর।

এই পর্যালোচনা থেকে বোঝা যায়, স্বরের আন্দোলনে বাক্যে এক ধরণের সুর সৃষ্টি হয়। এই স্বাভাবিক সুর বাক্যের অর্থ নির্দ্ধারণ করে। সুরের পার্থক্যে ভাবে, অর্থের পার্থক্য ঘটায়, তা বোঝাতে আমরা নিচে আর একটি বাক্যকে নানা অর্থে প্রয়োগ করছি। একই বাক্য গ্রহণ করার ফলে এই স্বর ও সুরের পার্থক্যে কেমনভাবে অর্থপার্থক্য ঘটায় তা আরও স্পষ্ট হবে।



প্রথম বাক্যে 'দে' শব্দে একটু দোলা লেগে পরে উঁচু হয়েছে। দেওয়া বিষয়েই সন্দেহ প্রকাশ পেয়েছে। তিনি দিতেও পারেন, না দিতেও পারেন। না দেওয়া বিষয়েই সন্দেহ। দ্বিতীয় বাক্যেও সন্দেহ। তবে দেওয়া বিষয়ে নয়। সন্দেহটা দেওয়ার বিষয়বস্তু নিয়ে। তৃতীয় বাক্যে সন্দেহ স্থাপিত হয়েছে 'মা' তে। অর্থাৎ অন্যেরা দিলেও তোমার মার দেওয়ায় সন্দেহ। প্রথম বাক্যের সঙ্গে পার্থক্য সূক্ষ্ম। প্রথম বাক্যে সন্দেহ মায়ে নয়। মায়ের দেওয়ায়। তিনি কাজ করে দিতে পারেন, সমর্থন করতে পারেন কিন্তু দেওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ আছে। চতুর্থ বাক্যে মা এবং বিষয় দুয়েই সন্দেহ। মার দেওয়ার সম্ভাবনা কম। দিলেও কি দেবেন— তা বলা যাচ্ছে না।

সামান্য স্বরের দোলায় অর্থের কত পরিবর্তন হয়, যে সম্পর্কে শ্রুতি-নাটকের শিল্পী অবশ্য অবহিত থাকবেন। স্বর ও সুরকে অব্যর্থ করতে তিনি নানা বাক্য নিয়ে তার সুর ঝোঁক ও দোলার পরিবর্তন করে করে কত বিশিষ্ট অর্থ উৎপন্ন করা যায়, তার পরীক্ষা করে অভ্যাস ও খেলা দুই-ই করবেন। বাক্যের অর্থদ্যোতক অব্যর্থতা সৃষ্টিতে এ খেলার ফলে কণ্ঠ অতি পরিণত হয়।

বাঙলায় অব্যয়ের ব্যবহারও গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময়, একটিমাত্র অব্যয়কে সুর দ্বারা নানা সার্থক অর্থে পরিণত করা যায়। আত্মপ্রস্তুতির জন্য শিল্পীরা যেমন এ বিষয়ে অভ্যাস করবেন, তেমনি সংলাপে প্রয়োগ করবেন।

উঁ ।। প্রশ্ন বোঝাতে উঁচু থেকে ক্রমোন্নত।

উঁ ।। 'তা বটে' বোঝাতে উঁচু থেকে ক্রমাবনত।

উঁ ।। 'কিন্তু' বোঝাতে উঁচু থেকে নামিয়ে আবার তোলা।

উঁ ।। বিরক্তি, বোঝাতে আকস্মিক দ্রুত উচ্চারণ।

উঁ ।। আপত্তি এবং নিষেধ বোঝাতে প্রলম্বিত মধ্য উচ্চারণ। —

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, আমাদের সাধারণ

কথাবার্তাতেও একটা সুর থাকে। এই সুরে বাক্যের অর্থে ভাবের রঙ লাগায়। অর্থ তখন আরও প্রত্যক্ষ আরও জীবন্ত হয়ে ওঠে।

এ সুরটি এত সহজ ও স্বাভাবিক যে, তাকে আমরা সুর বলে বুঝতেও পারি না। যেমন মুর্শিদাবাদের গ্রামাঞ্চলে বা বাঁকুড়ার গ্রামে গেলে আমরা আঞ্চলিক টান ছাড়াও একটা সুরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করি, কিন্তু আঞ্চলিক কেউ সেটা বুঝতে পারেন না, এ সুরটাও তেমনি। একে বর্জন করা সহজ নয় স্বাভাবিকও নয়। যদি চেষ্টাকৃত ভাবে এ সুর বর্জন করা হয়, তবে ভাষা হয়ে যাবে মরা—তখন বাক্যের অর্থভেদও অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে অতএব শ্রুতিনাটকের শিল্পীরা ঝোঁক নিয়ন্ত্রিত এই স্বর যেমন বর্জনও করবেন না, ঠিক তেমনি মাত্রাতিরিক্ত সুরের সংযোগ সম্পর্কেও সতর্ক থাকবেন।

নাটকের সংলাপের এক দিকে যেমন নাট্যচরিত্র সৃষ্টির চেষ্টা রাখতে হবে, ঠিক তেমনি অন্যদিকে রাখতে হবে তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে ভাব-অনুভাব এবং দ্বন্দ্ব প্রকাশের আয়োজন। বর্তমান সংলাপটি দ্বারা নাট্যকার বক্তার কাছে কোন মনোভাব প্রকাশ করতে চেয়েছেন, তা বোঝা আমাদের পক্ষে অনিবার্য। কিন্তু তা সমগ্র চরিত্র পরিকল্পনার পরিপন্থী হ'ল কিনা, তা ভাবাও একান্ত দরকার।

কারণ, একই সংলাপ একাধিকভাবে বলা যেতে পারে। কিন্তু এই বিভিন্নতার মধ্যে একটিই মাত্র নাট্যচরিত্রের পক্ষে উপযুক্ত। একটি সংযত-বাক আত্মনিমগ্ন চরিত্র একটি কথা যেভাবে বলে, একজন প্রগলভ চরিত্র সেভাবে বলে না। আবার একটি হিসেবী বা কুটিলচরিত্রও সেই একই কথা বলতে ভিন্ন ভঙ্গি গ্রহণ করে। শ্রুতিনাটকের সংলাপ উচ্চারণে এ সব সর্তকতা অবশ্য গৃহীত হবে। আর এভাবে কাণ্ঠ্য ধ্বনিকে অব্যর্থ ভাবদ্যোতক রূপ দিতে যে স্বল্প মহড়ায় স্ক্রীপ্ট দেখে দেখে পড়ে যে চরম রসোৎপাদন হয় না, বরং তাতে আদর্শ-নিষ্ঠ নাট্যকার নাট্যবিদদেরও যে বিরূপ করে তোলা হয়, তা পূর্বোদ্ধৃত নানা উদ্ধৃতি থেকেই প্রমাণ হবে।

অতএব শ্রুতিনাটকের শিল্পীরা এসব বিষয়ে সতর্ক হবেন।

৫

শ্রুতি নাটক ও শব্দসংযোজন

শ্রুতিনাটকের শব্দ-সর্বস্বতার কথা আমরা আগেই জেনেছি। মঞ্চের পর্দা উঠলেই দৃশ্যাপট ও আলোকাদি সহজেই নাট্যঘটনার স্থান-কাল পরিবেশ উপভোক্তাদের মনে সমুজ্জ্বল করে তোলে। আবার অভিনেতা অভিনেত্রীদের কায়িক ভঙ্গি ও অভিব্যক্তি তাদের মানসিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বকেও অভাসিত করে। শ্রুতিনাটকে এই দুই অভাবকেই পূরণের দায় শব্দ-শিল্পীকে গ্রহণ করতে হয়। এ শব্দ সংযোগ পরিচালক ও শব্দ-সংযোজন শিল্পী দ্বারা যৌথভাবে পরিকল্পিত, সংগৃহীত ও সংযোজিত হয়।

যে কোন সার্থক শ্রুতিনাটক শুনতে বসে যে কোন উপভোক্তা যত রকম ধ্বনি শ্রবণেন্দ্রিয়ে গ্রহণ করেন তার মুখ্য অংশ অভিনেতা অভিনেত্রীদের সংলাপ ও সংগীতাদি মাত্র। এ ছাড়া আর যত রকম শব্দ বা ধ্বনি শোনা যায় তা সবই শব্দশিল্পীর সংযোজন। এই শব্দ সংযোজন মূলত মঞ্চ-সজ্জার দর্শন-জনিত উপভোগের অভাব এবং শিল্পীদের কায়িক অভিনয়ের অনুপস্থিতির ক্ষতি পূরণ করে। এ ছাড়াও সমগ্র নাটকের বিচ্ছিন্ন দৃশ্যগুলিকে একটা নিটোল ঐক্যে বিধৃত করবার দায়িত্বও থাকে শব্দ-সংযোজক শিল্পীর ওপর। অর্থাৎ ভালভাবে বিচার করলে বোঝা যাবে, যোগ্য শব্দ সংযোজনই শ্রুতিনাটকের প্রাণ স্বত্ত্বাকে তুলে ধরে। সংলাপপ্রধান শ্রুতিনাটকের সংলাপকে প্রাণবন্ত ও বিচ্ছিন্ন দৃশ্যকে যুক্ত করে নিটোল করতে শব্দ-সংযোজন অনন্য ভূমিকা গ্রহণ করে। দৃশ্যান্তর বোঝাতেও ধ্বনি সংযুক্ত হয়।

এই আলোচনা থেকে বোঝা যাবে একটি শ্রুতিনাটকে ধ্বনি সংযুক্ত হয় তিন রকমের।

ক. দৃশ্যান্তর-সূচক ধ্বনি [পর্দা ওঠা পড়ার পরিপূরক]

খ. পরিবেশ-বোধক ধ্বনি [দৃশ্যপট আলোকাদির অভাবের পরিপূরক]

গ. ভাবাত্মক ধ্বনি। [কায়িক অভিনয়াদির পরিপূরক]

ক. দৃশ্যান্তরের ধ্বনি :

দৃশ্যান্তর বোঝাতে সাধারণত একটা বিশেষ ধরণের বাজনার গৎ ব্যবহার করা হয়। এর কোন নির্দ্দিষ্ট গৎ নেই। পরিচালক ও শব্দশিল্পী নিজেদের রুচিমত এই শব্দ সংযোজন করে থাকেন। তবে এই শব্দ কখনই দীর্ঘস্থায়ী হবে না। অতি সংক্ষেপে দৃশ্যান্তরের বোধ ধরে দিয়েই থেমে যাবে বা মিলিয়ে যাবে। সাধারণভাবে ৪/৫ সেকেণ্ডই যথেষ্ট।

সব দৃশ্যের শেষেই এমন ধ্বনি-সংযোজন সাধারণরীতি হলেও বিশিষ্ট পরিচালক এই একঘেয়েমির হাত থেকেও শ্রোতাকে অব্যাহতি দিতে চান। এজন্য কেউ কেউ প্রতিবারেই ভিন্ন ভিন্ন গৎ ব্যবহার করেন। তবে কোথাওই দৃশ্যান্তর ধ্বনি অতি তীক্ষ্ণ ও তীব্র হবে না। দৃশ্যান্তর পূর্ব মুহূর্তের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এ ধ্বনি যুক্ত হওয়া উচিত। কোন এক শ্রুতিনাটক প্রয়োজনায় দৃশ্যান্তরের জন্য ঢং করে একবার মাত্র বেল-বাজাতে শুনেছিলাম। বৈচিত্র্য হিসাবে মন্দ না হলেও এবং এজন্য খুব কম সময় ব্যয় হলেও আমার বোধ হয়েছিল, দৃশ্যান্তর ধ্বনি দৃশ্যগুলিকে একেবারেই ছিন্ন করে দিচ্ছিল, প্রযোজনার নিটোলতা বিঘ্নিত হচ্ছিল। পরিচালকগণ বিষয়টি ভাববেন।

কোথাও কোথাও দৃশ্যান্তর ধ্বনি পৃথকভাবে ব্যবহার না হয়ে পূর্বধ্বনি একটু তীব্র করে ক্রমে ফেড আউট, ফেড-ইন পদ্ধতিতেও দৃশ্যান্তর বোঝান যেতে পারে। এমন নতুনতর নীতি নিশ্চয়ই পরিচালক ও শব্দশিল্পী নির্দ্ধারণ করতে পারেন। তবে মনে রাখবেন দৃশ্যান্তর পট পরিবর্তনকেই বোঝাবে মাত্র— কখনই সামগ্রিক নিটোলতাকে ক্ষুণ্ন করবে না।

খ. পরিবেশ-বোধক ধ্বনি

ধ্বনি দ্বারা নাট্যঘটনার পরিবেশ যদি শ্রোতার মনে ফুটে না ওঠে তবে নাট্যঘটনা শুধু সংলাপে মোটেই পরিস্ফুট হয় না। মঞ্চ-নাটকে আলো ও দৃশ্যপট যে পরিবেশের মোহ বিস্তার করে, তার মধ্যে এসে অভিনেতা অভিনেত্রীরাও রীতিমত অনুপ্রাণিত হন। তাদের অভিনয় প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। শ্রুতিনাটকের শব্দ-শিল্পীও যদি শব্দসংযোজন-দ্বারা যোগ্য পরিবেশের আবহাওয়া তৈরী করতে পারেন, তবে শ্রুতিনাটকের শিল্পীরাও অনুরূপ প্রেরণা পায়। শ্রুতিনাটকের শিল্পীরা বিরূপ পরিবেশে নাট্যরূপ সৃষ্টির যে প্রতিজ্ঞা নিয়ে মঞ্চে বসেন, সে প্রতিজ্ঞাপূরণ সহজ ও প্রেরণাময় হয় যদি শব্দ-দ্বারা পরিবেশ যোগ্য ভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়। শ্রোতা ত' বিমুগ্ধ হনই।

সমগ্র পরিবেশকে বিশ্লেষণ করলে আমরা যে সব শব্দ পাই, তাদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এগুলি সবই লৌকিক বা বাস্তব-ধ্বনি।

এক. প্রাকৃতির ধ্বনি
দুই. মনুষ্য বা প্রাণী সৃষ্ট ধ্বনি
তিন. পরিবেশে স্থাপিত যন্ত্রের দ্বারা সৃষ্ট ধ্বনি।

এই তিন শ্রেণীর শব্দের চরিত্র সম্পর্কে বলাবার আগে, পরিচালক ও শব্দশিল্পীকে বিশেষভাবে সতর্ক করছি এই বলে যে, তাঁরা যখন শব্দ-পরিকল্পনা করতে পরিবেশ গঠন সম্পর্কে ভাববেন, তখন সূত্র তিনটি মনে রাখবেন। শব্দ অন্বেষণে সহায়তা হবে।

এক. প্রাকৃতিক ধ্বনি।

প্রায় প্রত্যেক পরিবেশেরই কিছু কিছু প্রাকৃতিক ধ্বনি আছে। বৃষ্টির আওয়াজ, বাতাসের মৃদু শব্দ থেকে তীব্র ঝড়ের শব্দ, শিশির পড়ার শব্দ, এমন কি তীব্র-নিস্তব্ধতাও প্রাকৃতিক-শব্দ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

দুই. মনুষ্য বা প্রাণী সৃষ্ট ধ্বনি।

প্রত্যেক পরিবেশেই এ জাতীয় ধ্বনি থাকে। পাখির ডাক, জনতার কোলাহল, যে কোন নেপথ্য সংলাপ ইত্যাদি এ জাতীয় শব্দ হিসাবে বিবেচিত হয়। আসলে নির্জন স্থান পৃথিবীতে কতটুকু! পর্বতের সুউচ্চ প্রদেশের নানা প্রকৃতিক শব্দ শোনা যায়—মনুষ্য বা প্রাণী সৃষ্ট শব্দ পরিবেশে না থাকলেও নাট্য-চরিত্রগুলি শব্দ উৎপাদন করে। কখনও বরফের উপর দিয়ে যাওয়ার শব্দ, পাথর কাটার শব্দ সেখানকার প্রাকৃতিক ধ্বনির সঙ্গে মিশবেই।

তিন. পরিবেশে স্থাপিত যন্ত্রে দ্বারা সৃষ্ট ধ্বনি।

এ জাতীয় ধ্বনি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রতি মুহূর্তে আমাদের চতুর্দ্দিকে যন্ত্রধ্বনি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। ঘরে পাখা ঘুরছে, রেডিও চলছে। রান্না ঘরে কড়াইতে তরকারী ছাড়ার শব্দ, খুনতি নাড়া, বাটনা বাটার শব্দ, বাইরে মোটরগাড়ি, সাইকেল, রিক্সা এমন কি গরুর গাড়ির শব্দও এ জাতীয় শব্দের অন্তর্গত। গোয়ালঘরে গরু দোয়ান হলে যে শব্দ ওঠে, খাওয়ার সময় চিবাবার যে শব্দ—তাকেও এই শ্রেণীর শব্দের অন্তর্গত করা হয়।

এই পারিপার্শ্বিক ধ্বনিগুলির সাহায্যে নাট্যঘটনার ঋতু ও সময়কে নির্দ্দেশ করা যায়। কল্পনা করা যাক, একটা বর্ষা কালের পরিবেশ রচনা করতে হবে। স্বভাবতঃ যে কোন রকম বৃষ্টি ঝরার শব্দ হবে প্রাথমিক নির্বাচন। অতি প্রাকৃতিক শব্দ। শব্দশিল্পী এব সঙ্গে মনুষ্য বা প্রাণীর সৃষ্ট ধ্বনি যোগ করতে যদি কোকিলের ধ্বনি যোগ করেন, তবে তা হবে বাস্তব-পরিপন্থী এবং হাস্যকর। কিন্তু যদি খানিকটা কুকুরের ডাক যোগ করেন, তবে তা হবে অনর্থক। বর্ষায় কুকুর ডাকে না, এমন নয়। কিন্তু তা কালদ্যোতক নয়। যে মুহূর্তে শব্দশিল্পী বৃষ্টি পড়ার শব্দের সঙ্গে ব্যাঙের ডাক যোগ করেন তখন তা হবে যেমন কালদ্যোতক, ঠিক তেমনি শব্দশিল্পীর নিখুঁত বাস্তবজ্ঞানের পরিচয়।

শব্দসংযোজনার দ্বার শুধু ঋতু নয়—দিন, রাত্রি এমন কি সকাল বিকালের পার্থক্যও বুঝিয়ে দেওয়া যায়। শঙ্খধ্বনি দ্বারা সমাগত সন্ধ্যাকে বা সূর্যবন্দনার স্তবপাঠ শুনিয়ে ঊষালগ্নকে প্রতিভাসিত করা যায়।

পারিপার্শ্বিক শব্দ সংযোজন দ্বারা স্থানিক-বৈশিষ্ট্যও চিহ্নিত করা যায়। না দেখিয়ে শুধু শব্দ শুনিয়েই বোঝান যেতে পারে স্থানটি গ্রাম কি শহর। শহর ও গ্রামের শাব্দিক-চরিত্র আলাদা। শহরের রাস্তার যানবাহন গ্রামের রাস্তার যানবাহন থেকে পৃথক। স্বভাবতঃ শাব্দিক-স্বভাবও পৃথক। দুই স্থানের

জনকোলাহলও এক নয়। শহরে কলকারখানার শব্দ, কলকাতায় ট্রামের ঘণ্টি, গলির মধ্যে, টানারিক্সার টুংটুং ধ্বনি—কলকাতাকে ফুটিয়ে তোলে। গ্রামের ফাঁকা মাঠে বাতাসের মৃদু শব্দ, সাধারণ বনানীর মধ্যে দু একটা পাখির ডাক, পড়ো ভিটে বা নিস্তব্ধ গ্রাম্য দুপুর বোঝাতে ক্লান্ত ঘুঘুর ডাক—গ্রামকে সুচিহ্নিত করে।

প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার এই যে স্থানিক এবং কালগত পরিচয় সম্বন্ধে পৃথকভাবে আলোচনা করলেও বহু ক্ষেত্রে এ দুটি একত্রে মিলেমিশে আসে। একই শব্দে দুটি বৈশিষ্ট্যই ফুটে ওঠে। যেমন ধরা যাক একটা শ্রুতিনাটকের দৃশ্য শুরু হল সুউচ্চ শৃগাল ধ্বনিতে। শ্রোতার মনে স্বভাবতঃ গ্রাম্য-সন্ধ্যা ফুটে উঠবে। আসলে একটি স্থানের শাব্দিক চরিত্র যেমন অন্য স্থানের শাব্দিক চরিত্রের সঙ্গে মেলেনা, ঠিক তেমনি একই স্থানের বিভিন্ন সময়ের শাব্দিক-চরিত্রও এক হয় না। নিখুঁত পর্যবেক্ষণশক্তি, দ্বারা শব্দশিল্পীকে এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করতে হবে। এবং ঐ শব্দ বৈশিষ্ট্যকে সুপরিকল্পিত ভাবে সংগ্রহ করে নাটকে যোগ করতে হবে। যোগ করবার সময় মাত্রা ও পরিমাণ, তীব্রতা ও স্থায়িত্ব সম্পর্কেও সজাগ থাকতে হবে। যদি শব্দশিল্পী এভাবে পারিপার্শ্বিকধ্বনি যুক্ত করতে পারেন, তবে সংলাপ ছাড়া এবং দৃশ্যপট ও আলো ছাড়াই নাট্য-ঘটনার স্থান ও কালকে স্পষ্ট করে তুলতে পারবেন। তখন সংলাপ ও শব্দে মিলে শ্রুতিনাটক পূর্ণ হয়ে উঠবে।

পরিবেশ বর্ণনার মধ্যে আরও কতকগুলি শব্দ আসে যেগুলি নাট্যকার নাট্যলিপিতে বলে দেন। এগুলি আসলে পারিপার্শ্বিকে স্থাপিত যন্ত্র বা মনুষ্য বা প্রাণীসৃষ্ট শব্দ। এ সব শব্দ সংযোজনের দায়িত্বও শব্দশিল্পীকে পালন করতে হয়। যেমন একটা বন্দুকের শব্দ, বা কাঁচের কাঁপ-ডিস ভাঙ্গার শব্দ, টেলিফোনে ক্রিং ক্রিং শব্দ বা গাছকাটার শব্দ।

এগুলি সহজ শব্দের উদাহরণ। কিন্তু অনেক সময় এসব ক্ষেত্রে জটিলতাও থাকে। নাট্যকারও এগুলির ইঙ্গিত দেন না। তিনি মূল শব্দের কথা বলেন, একটু চিন্তা করলেই দেখা যায় আপাত সরল ঐ শব্দের ইঙ্গিতের আগে পরে নানা শব্দ যোগ না করলে ঘটনাটি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠছে না। যেমন একটি লোক দরজায় বেল বাজালেন বা কড়া নাড়লেন। এই সরল বিষয়কে আগে ক্রমোস্ফুট পদশব্দ, কড়া নাড়া, দরজা খোলা এবং পুনরায় বন্ধ করার শব্দ যোগ করে বিষয়টাকে জটিল ও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা হ'ল।

অনেক সময় শব্দশিল্পীর ওপর পারিপার্শ্বিক শব্দের দ্বারা আরো জটিল বিষয় জ্ঞাপনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল সাজাহান নাটক লিখেছিলেন মঞ্চের জন্য—শ্রুতিনাটক হিসাব নয়। ধরা যাক, একেই শ্রুতিনাটক হিসাবে পরিবেশন করা হবে। কি করবেন দারার হত্যা দৃশ্যে। নাট্যকার যা ইঙ্গিত দিয়েছেন, তাতে ঘরে বাইরে নিয়ে গিয়ে খড়্গাঘাতে তাকে হত্যা করা হ'ল।

একে শব্দের দ্বারা কেমন করে প্রকাশ করবেন? মনে মনে শব্দদৃশ্যটি সাজান। কল্পনা করুন। দেখবেন, নানা শব্দ সংকেত ধরা পড়ছে। যেগুলি পরপর সাজালেই গোটা দৃশ্য পূর্ণ ও জীবন্ত হবে।

গ. ভাবাত্মক ধ্বনি :–

পারিপার্শ্বিক ধ্বনিগুলিকে অনেকে লৌকিক ধ্বনি বলে বর্ণনা করেন এগুলি লোকজীবন থেকেই উদ্ভূত। কিন্তু ভাবাত্মক ধ্বনিগুলি মোটেই লৌকিক বা বাস্তবধ্বনি নয়। সত্যজিৎ রায় মশাই 'পথের পাঁচালী'তে যেখানে সর্বজয়া স্বামীকে কন্যার মৃত্যুসংবাদ দিচ্ছে সেখানে রবিশঙ্করের সেতার বাজনা এবং সর্বজয়া যেখানে দুর্গাকে মারতে চেষ্টা করছেন আর দুর্গা পালাবার চেষ্টা করছে সেখানে ঢাকের বলির বাজনা যুক্ত করেছেন। এ ধ্বনিগুলির মোটেই কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। ওখানে কোথাও সেতারবাদক বা ঢাক ছিল না। তবে এ ধ্বনিগুলি এলো কিভাবে? এ জন্যই এ গুলিকে অলৌকিক ধ্বনি বলা হয়েছে—যেন আকাশ থেকে ঝরে পড়ল ধ্বনিগুলি।

কিন্তু কেন? যেখানে রায়মশাই শিল্পীদের মেকাপ পর্যন্ত বর্জন করেছেন, সেখানে এই অবাস্তবতাকে প্রশ্রয় দিলেন কেন? আসলে এগুলিই ভাবাত্মক ধ্বনি। কন্যার বিয়োগে সর্বজয়ার মনের যে অবরুদ্ধ বেদনা জমাট হয়ে ছিল, স্বামীর আগমনে ও স্পর্শে তা অকস্মাৎ গলে তীব্র প্রবাহের মত ধেয়ে এলো। আবার অভিভাবকের শাসনের তলায় শাসিত সন্তানের বুকে যে বেদনা জন্মে তা অসহায় ছাগ শিশুর বলির সঙ্গেই তুলনীয়। এই দুই ভাবকে উপভোক্তার বুকে ধরে দিতে ঐ দুই বিশিষ্ট শব্দ সংযোজন ভাবাত্মক শব্দ সংযোগের প্রকৃষ্ট উদাহরণ বলা যায়।

শব্দশিল্পী জানবেন যে ভাবমূলক শব্দ সংযোজনের দ্বারা নাটকের 'মুড' এবং স্টাইলকে প্রতিষ্ঠা করা যায়। হত্যার ষড়যন্ত্রে মুড বোঝাতে বজ্রপাত ও মেঘ গর্জনের শব্দ, উত্তেজক মনোভাবকে ফোটাতে দ্রুত সঞ্চারমান একটা ট্রেনের শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে।

সাধারণভাবে নাটকে দু'জাতের শব্দকেই মিশ্রভাবে ব্যবহার করা হয়। পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির মধ্যে শব্দশিল্পীর পর্যবেক্ষণ শক্তি ও বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় ফুটে ওঠে আর ভাবগত শব্দ সংযোজনের মধ্যে তাঁর শিল্পভাবনা ও কল্পনাপ্রবণ মনের অভিব্যক্তি দেখা যায়। বলা যায়, প্রথম জাতের শব্দ সংযোজনের মধ্যে শব্দশিল্পীর প্রাথমিক সিদ্ধি—আর দ্বিতীয় শ্রেণীর শব্দ যোজনায় ঘটে তার শিল্পলোকে উত্তরণ। এ কারণে অনেক শিল্পীই লৌকিক শব্দ যোজনার দিক থেকে অলৌকিক শব্দ যোজনায় গুরুত্ব দেন বেশি। অথচ লৌকিক শব্দ যোজনার দ্বারা নাটকের বাস্তব ভিত্তি যদি প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে নিরলম্ব ভাব কোন লোকেই উত্তীর্ণ হতে পারে না। শব্দশিল্পী কোন জাতীয় শব্দের প্রতিই পক্ষপাত দেখাবেন না। মনে রাখবেন তীক্ষ্ণ বাস্তববোধ,

পর্যবেক্ষণশক্তি দ্বারা যেমন লৌকিক ধ্বনি পরিকল্পিত হয়—ঠিক তেমনি নিখুঁত নাট্যবোধ ও নাট্য বিশ্লেষণ শক্তিই অলৌকিক ধ্বনি পরিকল্পনায় নিযুক্ত হয়। আর সমুচ্চ পরিমিতিবোধ ছাড়া কখনই এই দুই ধ্বনিধারা নাটকের সংলাপের সঙ্গে সুষমভাবে মিশ্রিত হয়ে একটা নিটোল ঐক্যে বিধৃত হতে পারে না।

শব্দ সংকেতের নিয়ন্ত্রণের নীতি ও কৌশল :

নাটকে ব্যবহৃত শব্দকে নানা দিক থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এই নিয়ন্ত্রণ যোগ্য দিক পাঁচটি।

১. পিথ, ২. গুণ বা জাতি ৩. ভলিউম, ৪. দিক, ৫. স্থায়িত্ব।

১. পিথ্ হচ্ছে কম্পাঙ্কজনিত শ্রবণযন্ত্রের প্রতিক্রিয়া। পিথের দ্বারাই একটা শব্দের ঘোষতা বা অঘোষতা বোঝা যায়। একই ঘণ্টাধ্বনি দ্রুত হলে এক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে বিলম্বিত হলে অন্য প্রতিক্রিয়া আনে। একই ঘণ্টা বা হুইসিল বা বন্দুকের শব্দ নানা পিথে সৃষ্টি করা যায়। নাটকের ঐ অংশের জন্য কোন পিথটি প্রয়োজনে তা শব্দশিল্পীকে পূর্বাহ্নেই নির্বাচন করে নিতে হবে।

২. শব্দগুলি জাতি বা গুণের দিক থেকেও পৃথক হয়। শব্দ কর্কশ হতে পারে, কোমল হতে পারে, হার্দ্য হতে পারে, তীক্ষ্ম হতে পারে। এক একটি শব্দের মৌল চরিত্র এক এক রকম হয়। বজ্রের শব্দ তার গরগর ধ্বনির গম্ভীরতায়, ঘড়ির শব্দ তীক্ষ্ণ রিণরিণিতে আর বন্দুকের শব্দ আকস্মিক বিস্ফোরণের মধ্যে চিহ্নিত। এদের এই সব জাতি বা গুণের (Quality) পরিবর্তন সাধন খুব সহজ ব্যাপার নয়। তবুও প্রয়োজন অনুপাতে কর্কশতা, হার্দ্যতা, কোমলতা বা তীক্ষ্ণতার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটান যেতে পারে।

৩. ভলিউম হচ্ছে শব্দের আপেক্ষিক প্রাবল্য। একই শব্দের চরিত্র স্থির রেখে তার ভলিউম কমান বা বাড়ান যায়। এ জন্য নাটকের প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ভলিউম্ কতখানি হবে সেটা ভাল করে বুঝে নেওয়া উচিত। কারণ সাধারণভাবে দরজার কড়া নাড়ার শব্দ বজ্রের শব্দের চেয়ে ক্ষীণতর। কিন্তু বদ্ধ ঘরে বজ্রের ধ্বনি যে ভলিউম্ নিয়ে প্রবেশ করবে, কড়া নাড়ার শব্দের ভলিউম হবে তার চেয়ে অনেক বেশী। অর্থাৎ ভলিউমের আপেক্ষিক হ্রাস-বৃদ্ধি পরিস্থিতি ও দূরত্বের ওপর নির্ভর করে। প্রত্যক্ষ-সৃষ্ট শব্দে এই দূরত্বের বোধ আনা খুবই কষ্টকর। মঞ্চের কোন প্রান্ত থেকে বন্দুকের শব্দ বা জনতার কোলাহল সৃষ্টি করলে তা উপযুক্ত ভলিউমে গিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করে না, বারম্বার মহড়া দিয়ে এবং পরীক্ষা করেও তা স্থির করা প্রায় অসম্ভব। তবে আজকাল ইলেকট্রনিক যন্ত্রাদি আবিষ্কারের ফলে ভলিউম কণ্ট্রোল সহজ হয়েছে। সংরক্ষিত শব্দ (রেকর্ডেড সাউণ্ড) প্রয়োগে এ অসুবিধা নেই।

নেপথ্য শব্দ সংযোগের সময় সেই সব শব্দের ভলিউমকে সাধারণভাবে অভিনেতাদের কথাবার্তার ভলিউমের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলতে হবে। এ সব

শব্দ কখনই অভিনেতৃবর্গের কণ্ঠস্বরকে ছাপিয়ে যাবে না, যদি না তেমন অবস্থা নাটকের জন্য পরিচালকের অভিপ্রেত হয়।

৪. শব্দের 'দিক' শব্দ সংযোগের সময় একটা মস্ত বড় লক্ষ্য রাখবার বিষয়। নাট্য-মুহূর্তের সব মায়া বিধ্বস্ত হয়ে যায় যদি শব্দটি উপযুক্ত দিক থেকে না-আসে। দোতলায় কাপ-ডিস ভাঙ্গার শব্দ যদি পাশ থেকে আসে অথবা ডান দিকের দরজায় কড়া নাড়বার শব্দ যদি বাঁদিক থেকে যুক্ত করা হয়, তবে তা হাস্যকর হয়ে ওঠে। অনেক সময় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়, সব শব্দ সংযোগের আয়োজন এক দিকে রাখবার ফলে। শব্দ সংযোগের নিয়ন্ত্রক যন্ত্রাদি এক দিকে না রেখে উপায় নেই। এক ব্যক্তি যখন তা নিয়ন্ত্রণ করবেন (সহকারী থাকলেও) তখন একস্থানে সব থাকাই বাঞ্ছনীয়। তবে শব্দের 'দিক' রক্ষার ব্যবস্থা কি হবে? এজন্য একাধিক লাউডস্পিকার সযত্নে স্থাপন করতে হবে। প্রত্যেক লাউডস্পিকারের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও থাকবে শব্দশিল্পীর হাতে। তা হলে তিনি এক জায়গায় বসেই সব দিক থেকে শব্দ ক্ষেপণ করতে পারবেন। এমন কি এই ব্যবস্থার ফলে নেপথ্যে একটি গাড়িকে ডান দিক দিয়ে প্রবেশ করিয়ে বাঁ দিক দিয়ে প্রস্থান করাবার আভাস সৃষ্টি করারও সম্ভব হবে।

৫. শব্দেব 'স্থিতিকাল' আর একটি গুরুত্বপূণ দিক। স্থিতিকাল কথাটির মধ্যে শব্দের শুরুর যথার্থ মুহূর্ত, ক্রমোবৃদ্ধি, চূড়ান্ত মুহূর্ত, ক্রমাবলুপ্তি এবং সমাপ্তি মুহূর্তেব ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে। যে কোন শব্দ সংযোগের সময় শব্দ-শিল্পীকে এই বিষয়গুলি পরিচালকের সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করে নিতে হবে। কতকগুলি শব্দেব স্থায়িত্বকাল মুহূর্তের। যেমন বন্দুকেব শব্দ, এর স্থিতিকাল আপনাতে আপনি সমাপ্ত। কিন্তু এ জাতীয় শব্দের সূচনা মুহূর্তটি গুরুত্বপূর্ণ। মারবার জন্য উৎসুক এবং মরবারজন্য প্রস্তুত অভিনেতারা নিতান্তই অসুবিধায় পড়বেন যদি বন্দুকের শব্দটি যথার্থ মুহূর্তে না হয়। হত্যাকারী বন্দুক তুলবার আগেই যদি শোনা যায় বন্দুকের শব্দ তবে অস্বস্তির কারণ ঘটে আরও বেশী। অতএব এ জাতীয় শব্দ সংযোগে নিখুঁত মুহূর্তটি সম্পর্কে শব্দ-শিল্পীকে সজাগ সতর্কতা রক্ষা করতে হবে।

আর এক শ্রেণীর শব্দ আছে, যার স্থায়িত্বকালের ব্যাপ্তি অনেকখানি। যেমন জনতার কোলাহল। এই কোলাহল ধ্বনি অবশ্যই পূর্বোক্ত পঞ্চপর্বে পরিকল্পিত হবে। কোথায় এর সূচনা, দ্রুত বা বিলম্বিত ক্রমোবৃদ্ধি, কোথায় এর চূড়ান্ত মুহূর্ত, বিলয়-পথ হ্রস্ব বা দীর্ঘ, অবলুপ্তি মুহূর্ত কোথায়, —এর প্রত্যেকটিকে সতর্কতার সঙ্গে অনুভব ও পরিকল্পনা, সৃষ্টি ও সংযোগের ব্যবস্থা করতে হবে।

নাটকের প্রয়োজনে মেটাতে শব্দের এই বৈশিষ্ট্যগুলির (পিথ, জাতি, ভলিউম, দিক ও স্থিতি) এককে অন্যের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে কমিয়ে বাড়িয়ে

যুক্ত করতে হয়। এ জন্য প্রয়োগের আগে শব্দ-শিল্পীকে গভীর ভাবে নাট্যমুহূর্ত বিশ্লেষণ ও পরিকল্পনা করতে হবে। এ ছাড়া বারবার মহড়া দিতে হবে নিখুঁত প্রয়োগের জন্য। মনে রাখা দরকার এ বিষয়ে তিনি তার পরিকল্পনা অবশ্যই পরিচালককে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নেবেন। কেন না, তিনি শুধুমাত্র শাব্দিক বিষয়েই চিন্তা করছেন কিন্তু পরিচালক চিন্তা করছেন সামগ্রিক নাটক সম্পর্কে। শব্দ-শিল্পীর শাব্দিক-পরিকল্পনা সমগ্রের সঙ্গে সমানুপাতিক হচ্ছে কি না, তা বিবেচনার ব্যক্তি পরিচালক। শব্দ-শিল্পী আত্মম্ভরিতার যদি এ দিকটি উপেক্ষা করেন তবে তিনি সমগ্র নাটককেও স্বখাতসলিলে ডুবিয়ে মার'বেন।

প্রত্যক্ষশব্দ ও সংরক্ষিতশব্দ ব্যবহার

শ্রুতিনাটকে লৌকিক বা অলৌকিক যে ধরণের শব্দই ব্যবহৃত হক না কেন তাদের সংরক্ষণ রীতির দিক থেকে দু দলে ভাগ করা যায়। এক দলকে বলা হয় তাৎক্ষণিক সৃষ্ট শব্দ বা প্রত্যক্ষ শব্দ (Live sound) অন্য দলকে বলা হয় সংরক্ষিতশব্দ (Recorded sound)। নামকরণ থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, প্রত্যক্ষ শব্দগুলি নাটকের প্রয়োজনীয় মূহূর্তেই সৃষ্টি করা হচ্ছে আর সংরক্ষিত শব্দগুলি পূর্বে সৃষ্ট শব্দসংকেত রূপে রেকর্ডে বা টেপ-রেকর্ডারে ধরে রাখা হয়েছে।

প্রত্যক্ষ-শব্দগুলি প্রতি অনুষ্ঠানেই নূতন করে সৃষ্টি করতে হয়, কিন্তু সংরক্ষিতশব্দ একবার রেকর্ড করে রাখলে আর অসুবিধা থাকে না। সংরক্ষিত শব্দ অনুষ্ঠান-নিরপেক্ষ ভাবে সমান। অনুষ্ঠান যেমনই হোক ঐ শব্দ সংকেতকে পরিবর্তন করবার কোন উপায় নেই। কিন্তু প্রত্যক্ষ শব্দের সুবিধা এই যে, অনুষ্ঠানের দিনের বিশেষ অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সামান্য ও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে নেওয়া যায়। আবার এক অনুষ্ঠানের প্রত্যক্ষ শব্দের ত্রুটি পরবর্তী অনুষ্ঠানে সংশোধন করা যায়। কিন্তু সংরক্ষিত শব্দ, শব্দোৎপাদনকারী যন্ত্রের ত্রুটি-বিচ্যুতি সহ একই রকম থাকে।

প্রায় সবরকম শব্দই প্রত্যক্ষভাবে সৃষ্টি করা যায় আবার সংরক্ষিতও রাখা যায়। তাই নাটকে কোন রকম শব্দ ব্যবহার করা হবে তা প্রথমেই স্থির করে নেওয়া উচিত। এই নির্বাচনের সময় দুটি দিকে নজর রাখা হয়। এগুলি হ'ল ১. পদ্ধতিটির প্রয়োগের সরলতা ২. উৎপাদিত শব্দের উপযুক্ততা। যেমন টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং বা কলিং বেলের শব্দের কথা ধরা যাক। একটা সাধারণ ইলেকট্রিক বাজার (buzzer) দিয়ে এ কাজ এত সহজে এবং উপযুক্তভাবে সৃষ্টি করা যায় যে এ ক্ষেত্রে সংরক্ষিত শব্দ প্রয়োগের চিন্তা অনুপযুক্ত। উল্টো দিকে দূরত্ব এবং ভলিউম ঘটিত নিয়ন্ত্রণ যেখানে অনিবার্য, সেখানে সংরক্ষিত শব্দই কার্যকর।

সংরক্ষিত শব্দ দু-রকম হয়। রেকর্ড ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বহু শাব্দিক-

সংকেতের রেকর্ড বিক্রির জন্য বাজারে ছেড়ে থাকেন। এগুলি সংগ্রহ করা সহজ এবং ব্যয়বহুলও নয়। কিন্তু অধিকাংশ সময় এগুলিকে নাটকের প্রয়োজনের সঙ্গে মেলান বড় কষ্টকর। এ জন্যই নাট্যসংস্থাগুলি নিজেরাই টেপ রেকর্ডারে রেকর্ডিং করে নেন। আবার যে সব শব্দ প্রত্যক্ষভাবে সৃষ্টি করা জটিল প্রক্রিয়া সাপেক্ষ বা উপযুক্ত স্বর-সৃষ্টি রীতিমত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপার (যেমন মোটর গাড়ির বা এরোপ্লেনের শব্দ) সে সব ক্ষেত্রে রেকর্ড ব্যবহার করাই উচিত।

শব্দ-সংযোগ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে শব্দ-শিল্পী তার যন্ত্র এবং রেকর্ডগুলি অবশ্যই বারম্বার পরীক্ষা করে নেবেন। কোন দাগধরা রেকর্ড বা অল্প-শক্তির স্পিকার অনেক সময় শব্দকে বিকৃত করে এবং শব্দকে নাটকের সঙ্গে যুক্ত করতে বাধা দেয়।

মোট কথা, শব্দ-শিল্পীকে তার কাজের জন্য একটা সূত্র তালিকা তৈরী করে নিতে হবে। এতে প্রতিটি শব্দের পিথ, জাতি, ভলিউম, দিক এবং স্থিতিকাল লেখা থাকবে। শব্দটি কিভাবে সৃষ্টি করা হবে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ শব্দ বা সংরক্ষিত শব্দ তাও লেখা থাকবে তালিকায়। যদি সংরক্ষিত শব্দ হয় তবে সেই রেকর্ড বা টেপ চিহ্নিত করে যন্ত্রে যুক্ত করে রাখতে হবে। এ বিষয়েও লেখা থাকবে সেই তালিকায়। কোন্ শব্দের জন্য কোন যন্ত্র ব্যবহার করা হবে তাও লেখা থাকবে। মোটকথা নিয়ন্ত্রণের সর্বপ্রকার ইঙ্গিত এই শব্দ-সূচীর অন্তর্গত হবে।

মনে রাখতে হবে, সঠিক শব্দ প্রয়োগের জন্য চাই সুস্থির মনন, গভীর পরীক্ষা, নিপুণ নিরীক্ষা এবং দীর্ঘ অনুশীলন বা মহড়া। মহড়ার দুটি পর্ব হবে। প্রথম পর্বে শব্দ-শিল্পী শব্দগুলি সাধারণ ভাবে সংরক্ষণ ও প্রত্যক্ষ সৃষ্টির আয়োজন করে নেবেন। দ্বিতীয় পর্বে অভিনয়ের সঙ্গে মেলাতে গিয়ে তাকে এই শব্দে কিঞ্চিত সংযোজন-বিয়োজন করতে হতে পারে। একেই বলা হয় সম্পাদন বা এডিটিং

এডিটিং-এর সময়েই শব্দ সামগ্রিক প্রয়োজনের সঙ্গে সমন্বিত হয়। এ সময়ে মঞ্চ, প্রেক্ষাংশের আকার ও আয়তন, অভিনেতাদের স্বর ও নাটকের প্রয়োজনের কথা একত্রে ভাবতে হবে। আগেই বলেছি, এ ব্যাপারে শব্দশিল্পী অবশ্যই বারংবার পরিচালকের সঙ্গে আলোচনা করে তার প্রত্যেকটি চিন্তাকে অনুমোদন করিয়ে নেবেন। এ বিষয়ে কোন আত্মম্ভরিতা একেবারে নাট্যনীতির বিরুদ্ধ। মনে রাখতে হবে নাটক যৌথ-শিল্প, পরিচালক তার মুখ্য নিয়ামক আর শব্দশিল্পী তার সহযোগী।

৬

শব্দসংকেত সংরক্ষণ

শব্দ-সংকেত-সংরক্ষণের প্রয়োজন।।

আমরা মাইক্রোফোন-অ্যামপ্লিফায়ার এবং লাউড-স্পিকারের যোগে শব্দ-সংকেতকে তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করে তৎক্ষণাৎ তাকে প্রবর্দ্ধন ও প্রচার করে থাকি। নাটকে প্রত্যক্ষশব্দগুলি (Live sound) এমনিভাবেই নাটকে যুক্ত হয়। কিন্তু সংকেত গ্রহণ এবং প্রচারের মধ্যে যদি কালগত ব্যবধান আনতে চাই তা হলে গৃহীত-সংকেত সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়। এই প্রয়োজন থেকেই সংকেত-সংরক্ষণরীতি বা রেকডিং-এর উদ্ভব হয়েছে।

শব্দ-সংকেত সংরক্ষণের আদি ব্যবস্থা হয়েছিল গ্রামাফোন রেকর্ডে। রেকর্ডিং-এর সময়ে মূলশব্দ যে তরঙ্গ সৃষ্টি করত, তা দিয়ে একটি ডায়াফ্রামকে কাঁপাবার ব্যবস্থা করা হ'ত। অনেকটা মাইক্রোফোনের ডায়াফ্রাম কাঁপাবার ব্যবস্থার মত। এই ডায়ফ্রামের সঙ্গে যুক্ত থাকত একটা সূক্ষ্ম শলাকা। এই শলাকার তলায় থাকত একটা ঘূর্ণায়মান প্লেট। এমন ব্যবস্থা করা হ'ত যে ডায়াফ্রাম-সংলগ্ন শলাকা প্লেটের বহিঃবৃত্তের কাছ থেকে কেন্দ্রের কাছে নির্দ্দিষ্ট স্থান পর্য্যন্ত আসতে যতটা সময় লাগত, একটা রেকর্ডে ঠিক ততক্ষণের শব্দসংকেত ধরে রাখা যেত।

এই রেকর্ডিং-এ জটিলতা ছিল বহু। প্রথম অবস্থায় এমন জিনিসে রেকর্ড করা হত যে রেকর্ডিং-এর সময় তা থাকত নরম, রেকর্ডিং শেষ হলেই তা কঠিন হয়ে যেত। পরবর্ত্তীকালে ছাঁচ প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় জটিলতা খানিকটা কমে যায়। তবু এ জন্য বিশেষ সংস্থা এবং বিশেষ কারিগরী দক্ষতার প্রয়োজন হ'ত। আজও রেকর্ডপ্লেয়ারের জন্য বিশেষ যে রকর্ড বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, তার রেকর্ডিং ব্যবস্থা প্রায় পুরান ব্যবস্থার মতই। এ জন্য ঘরে ঘরে রেকডিং-এর আয়োজন করা যায় না।

তাই এত দিন রেকর্ড-কোম্পানী বাজারবুঝে যে সব গান, নাটক ইত্যাদি রেকর্ড করে বাজারে ছেড়েছেন, আমাদের তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। কিন্তু আজ টেপ রেকর্ডার যন্ত্র আমাদের এই পরমুখাপেক্ষতা ঘুচিয়েছে। আজ ঘরে ঘরে যে কেউ আপন খুশি মত রেকডিং করতে পারেন। শুধু রেকডিং-নয় ঐ যন্ত্রে পুনঃপ্রচারেরও আয়োজন থাকে।

এ কারণে নাট্যদলগুলির কাছে টেপ-রেকর্ডার একটা মস্ত বড় হাতিয়ার। প্রয়োজনীয় শব্দকে সংরক্ষণ করে রেখে তাকে নিজের প্রয়োজন মত কাজে লাগাতে এ যন্ত্রের তুলনা নেই। গ্রামাফোন বা রেকর্ড প্লেয়ারের রেকর্ড তৈরী সম্পূর্ণভাবে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের করায়ত্ত। অতএব তার বিশদ আলোচনা অনাবশ্যক। কিন্তু টেপ-রেকর্ডার শুধু যে আমাদের আয়ত্বে তাই নয়, এ যন্ত্রের উপযোগিতাও প্রচুর। এ জন্য এ অধ্যায়ে আমরা টেপ-রেকর্ডার সম্পর্কে

সামগ্রিকভাবে এবং রেকর্ডপ্লেয়ারের পুনঃপ্রচার সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করব।

ক. ।। টেপ-রেকর্ডার ।।

নাম টেপ-রেকর্ডার হলেও এক কথায় এটিকে একটি শব্দ গ্রহণ, সংকেত সংরক্ষণ এবং পুনঃপ্রচারের যন্ত্র বলা যায়। যন্ত্রটির সমগ্র কাযক্রম ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

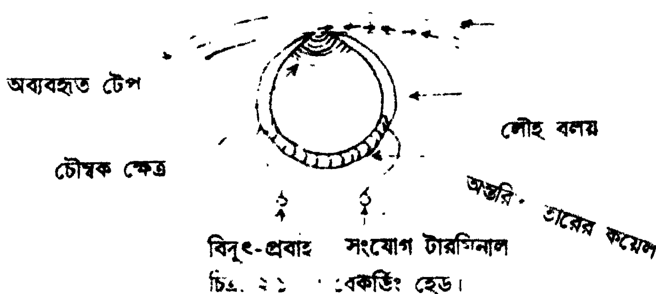
রেকর্ডিং টেপ বা ফিতে ।।

টেপ রেকর্ডারের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে ঐ টেপটি। এই টেপ আসলে প্লাস্টিক জাতীয় পদার্থে তৈরী করা হয়ে থাকে। ফিতেটার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে সর্বত্র এর সমবেধ। সাধারণতঃ এগুলি চওড়া হয় ১/৪ ইঞ্চি (বা ৬ মি. লি. মিটার)।

এই ফিতের ওপরে একটা জটিল যান্ত্রিক পদ্ধতিতে 'রজন' জাতীয় জিনিসের প্রলেপ (Lacquer) লাগান হয়। এ বিষয়ে সাবধানতা এই যে, এই প্রলেপ সর্বত্র সমান হওয়া দরকার। এবার এই প্রলেপ যুক্ত ফিতের দৈর্ঘ্য বরাবর একটা লৌহ যৌগ (সাধারণভাবে লৌহের অক্সাইড যৌগ) অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সূক্ষ্ম সূচের মত সরু করে যুক্ত করা হয়। এই লৌহ যৌগের লাইন এক ইঞ্চির হাজার ভাগের আনুমানিক ০.০৪ ভাগের সমান হয়।

রেকর্ডিং ও রিপ্রডিউসিং হেড ।।

রেকর্ডিং ও রিপ্রডিউসিং হেড আসলে একই রকম যন্ত্র। একটি যন্ত্র দিয়েই রেকর্ডিং ও রিপ্রডিউসিং-এর কাজ করা যায় বা একই রকম দুটি যন্ত্র ব্যবহার করা যেতে পারে।



চিত্র. ২১ রেকর্ডিং হেড।

রেকর্ডিং বা রিপ্রডিউসিং-এর জন্য আসলে ব্যবহার করা হয় একটা ইলেকট্রো-ম্যাগনেট। বালার মত আকারের একটা লোহার বাঁকা দণ্ডের প্রান্তদ্বয় খুব কাছাকাছি আনা থাকে। এই লৌহদণ্ডে (ক্ষীণশক্তি চুম্বক) জড়ান থাকে অন্তরিত তার। এই তারের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হ'লে লৌহদণ্ড চুম্বকে পরিণত হয়। এর চৌম্বক-ক্ষেত্র কেন্দ্রীভূত হয় প্রান্তদ্বয়ের কাছাকাছি।

ইরেজার ।।

রেকর্ড করা ফিতে থেকে রেকর্ড মুছে তাকে আবার রেকর্ড ধরার উপযুক্ত করে দেয় ইরেজার। ইরেজারও আসলে একটি ইলেকট্রো ম্যাগনেট। এর গঠন বৈশিষ্ট্যও ঠিক রেকর্ডিং হেডের মত। ব্যবহার বৈশিষ্ট্যে এটি ভিন্নভাবে কাজ করে এবং কাজের দিকে তাকিয়েই তার ঐ নামকরণ করা হয়েছে।

মাইক্রোফোন

টেপ-রেকর্ডারের সঙ্গে সর্বদাই একটি মাইক্রোফোন থাকে। এই মাইক্রোফোন শব্দ তরঙ্গকে বিদ্যুৎ তরঙ্গে পরিণত করে টেপের ওপর শব্দসংকেতকে ধরে রাখবার সুযোগ করে দেয়।

এ্যামপ্লিফায়ার

টেপ রেকর্ডারের মধ্যেও একটি উচ্চ-শক্তি সম্পন্ন বিশেষভাবে নির্মিত এ্যামপ্লিফায়ার থাকে। এ ক্ষেত্রেও মৃদু তড়িত চৌম্বকীয় আবেশকে জোরালো করবার কাজে এই যন্ত্রাংশটি সহায়তা করে থাকে।

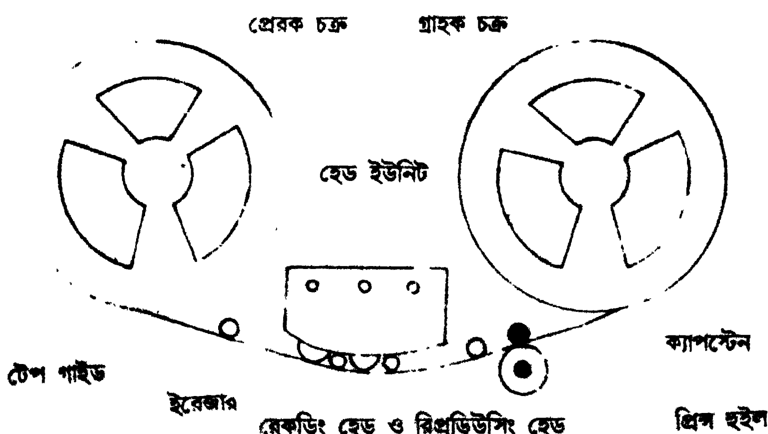
অন্যান্য যন্ত্রাংশ

একটা টেপ রেকর্ডারকে চালু রাখতে এ ছাড়াও মোটর, ক্যাপস্টেন, ফ্লাইহুইল, বিশেষ সুইচ ব্যবস্থা ইত্যাদি নানা আয়োজন যন্ত্রাংশের দরকার হয়।

কার্য-প্রণালী

টেপ রেকর্ডারের কার্য-প্রণালীকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এদের প্রথমটি হ'ল যান্ত্রিক দিক (mechanical), অন্যটি হ'ল ইলেকট্রনিক দিক।

টেপটাকে নিয়মিত গতিতে তড়িত চৌম্বকীয় দণ্ডের মুখের সামনে দিয়ে প্রবাহিত রাখাই টেপ-রেকর্ডারের যান্ত্রিক দিকের কাজ। গতির সামান্যতম



পরিবর্তন লক্ষণীয় শাব্দিক পরিবর্তন ঘটায়। কখনও শব্দ বিলম্বিত হয়, কখনও এত দ্রুত হতে পারে যে শুধু অবোধ্য শব্দজট শোনা যাবে। এই একই যন্ত্র

আবার টেপ-টাকে উচ্চ গতিতে বিপরীত মুখে গুটিয়ে দিতেও সাহায্য করে। ক্যাপস্টেনই টেপের গতিকে স্থির রাখে। ক্যাপস্টেনটা টেপকে একটা পিঞ্চ হুইলের সঙ্গে চেপে রাখে। ক্যাপস্টেনের ব্যাস এবং প্রতি মিনিটে তার ঘূর্ণন বেগই টেপের গতিকে স্থির করে। বাঁ-দিকের স্পুল থেকে চুম্বক মুখের সামনে দিয়ে টেপ চলে যায় ডান দিকে স্পুলে। ক্যাপস্টেন ও পিঞ্চ হুইল পার হলেই টেপটার টান একটু শিথিল হয় আর এই শিথিল টান টেপ গুটিয়ে দেয় ডান দিকের স্পুল। এই স্পুলটি একটা দ্বিতীয় মোটর দিয়ে চালান হয়, অথবা ক্যাপস্টেনের মোটর থেকেই একটা বেল্টের সাহায্যে ঘোরে স্পুলটি। বিপরীত মুখে গোটাবার সময় বাম স্পুলটা কখনও আর একটা মোটর দিয়ে চালান হয়, নতুবা এটাও একটা বেল্ট দিয়ে যুক্ত করা হয় ঐ মোটরের সঙ্গে। তবে তিন-মোটর ব্যবস্থাই বাঞ্ছনীয় ব্যবস্থা। টেপের দুই পাশ জুড়ে অনেকগুলো টেপ গাইড বসান থাকে। এর ফলে টেপটি এদিক ওদিক বেঁকে রেকর্ডিং বা পুনঃপ্রচারের সময় বাঞ্চিত পথের পরিবর্তন করতে পারে না। টেপটাকে ঠিক ঠিক চুম্বক মুখের সামনে রাখার সুব্যবস্থা করা যায় দুই উপায়ে। বাম স্পুল এবং ক্যাপস্টেনের ভিতরকার টান স্বাভাবিক ভাবেই টেপকে চুম্বক মুখের সঙ্গে সংযুক্ত রাখে। এ ছাড়াও কতকগুলি প্রেসার-প্যাডও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আবার প্রত্যেক টেপ রেকর্ডারেই চুম্বক মুখের কাছে একটা টেপ ইণ্ডিকেটর বা টেপ কাউন্টার থাকে। এই ইণ্ডিকেটার বা কাউন্টার ঠিক যেখানে রেকর্ডিং করতে হবে (যে বিশেষ ট্রাকে) সেই স্থানটিকে চুম্বকমুখে নির্দ্দিষ্ট করে দেয়।

এই যন্ত্রে ইলেকট্রনিক দিকটি গঠিত হয় একটা এ্যামপ্লিফায়ার, একটা রেকর্ডিং লেভেল কন্ট্রোলার আর একটা বিদ্যুৎ প্রবাহী সারকিট নিয়ে। বিদ্যুৎ প্রবাহ চালু করে রেকর্ডি এর সুইচ টিপলে, রেকর্ডিং এর জন্য নির্দ্দিষ্ট লৌহদণ্ড চুম্বকে পরিণত হয়। এখন মাইক্রোফোনের সামনের শব্দতরঙ্গ ডায়াফ্রামের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তা কেমন ভাবে বিদ্যুৎ সংকেতে পরিণত হয় তা আমরা জানি, এই বিদ্যুৎ সংকেত অতি মৃদু থাকে। এ্যামপ্লিফায়ার তাকে বাড়িয়ে পাঠিয়ে দেয় রেকর্ডিং হেডে। শব্দতরঙ্গের অভিঘাত জনিত কম্পন থেকে যে বিদ্যুৎ প্রবাহের বিচলন শুরু হয়েছিল তা রেকর্ডিং হেডেও পৌঁছে যাবে। ফলে রেকর্ডিং হেডের চুম্বকশক্তির হ্রাসবৃদ্ধি ঘটবে। এখন এই চৌম্বক বলরেখার ভিতর দিয়েই প্রবাহিত হচ্ছে লৌহ যৌগ ঘটিত টেপ। ফলে ঐ বলরেখার প্রভাবে টেপের উপরের লৌহযৌগের অণু-সজ্জা পরিবর্ত্তিত হবে এবং প্রতিমুহূর্ত্তে ঐ সজ্জা এক একটা বিশেষ রূপ নেবে। এরই মধ্যে সংরক্ষিত হবে শব্দসংকেত।

রি-প্রডিউসিং-এর আগে রেকর্ডেড় টেপকে ঘুরিয়ে রেকর্ডিং-এর

পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে। এবার টেপ রেকর্ডার চালু করলে এবং রি-প্রডিউসিং-এর জন্য নির্দ্দিষ্ট বোতাম টিপলে রি-প্রডিউসিং হেডের সামনে দিয়ে টেপ চলতে থাকবে। রেকর্ডেড্ টেপের ওপরের বিশেষ সজ্জা যুক্ত লৌহ যোগ রিপ্রডিউসিং হেডের চৌম্বক বলরেখার উপরে প্রভাব ফেলতে থাকবে। ফলে অন্তরিত তারের মধ্যে মৃদু চল-বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে, সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে এই চলবিদ্যুৎ হবে ফিতের ওপরের লৌহ্ যৌগের বিশেষ সজ্জার অনুরূপ।

এখন রি-প্রডিউসিং-এর বোতাম টেপা-মাত্র এ্যামপ্লিফায়ার-এর ইন-পুট এবং আউট-পুটের কানেকশন উল্টে যায়। ইন-পুট যুক্ত হয় রেকর্ডিং হেডের সঙ্গে আর আউট-পুট যুক্ত হয় লাউডস্পিকারের সঙ্গে। এখন মাইক্রোফোনে কোন কাজ থাকে না। এর ফলে রি-প্রডিউসিং হেডের সামান্য চল-বিদ্যুৎ প্রবেশ করে এ্যামপ্লিফারের ভিতরে এবং প্রবর্দ্ধিত হয়ে লাউডস্পিকারে প্রবেশ করে। লাউডস্পিকার এই বিদ্যুৎ-সংকেতকে রূপান্তরিত করে শব্দ তরঙ্গে।

পূর্ব চিত্র থেকে দেখা যাবে রেকর্ডিং হেডের আগেই ইরেজারের স্থান দেওয়া হয়েছে। যে কোন রেকর্ডিং-এর কালে এটি চালু থাকে। ফলে কোন রেকর্ড করা টেপের ওপর আবার রেকর্ড করতে হলে আগের রেকর্ডিং মুছে নিয়ে রেকর্ডিং-এর আয়োজন করতে হয় না। দুটি কাজ চলে একত্রে।

ইরেজার যে একটি ইলেকট্রো ম্যাগনেট সে কথা আগেই বলা হয়েছে। এটি যুক্ত থাকে মূল বিদ্যুৎ প্রবাহের সঙ্গে। ফলে এই বিদ্যুৎ চুম্বকের বলরেখার মধ্যে এলে টেপের ওপরের লৌহ্ যৌগের বিশেষ সজ্জা ভেঙ্গে যায় এবং স্বাভাবিক সজ্জা গ্রহণ করে। অর্থাৎ টেপটি আবার অব্যবহৃত টেপের মত হয়ে যায়। তাতে আর কোন শব্দ সংকেত থাকে না। তাতে আবার রেকর্ডিং করা যায়।

খ ।। রেকর্ড প্লেয়ার ।।

গ্রামাফোনের রেকর্ডের শব্দ সংকেতের ওপর পিন রেখে সেই পিনের সংলগ্ন ডায়াফ্রাম কম্পিত করে শব্দ সৃষ্টি করা হ'ত। এই সাউণ্ডবক্স যুক্ত থাকত একটা নল এবং বাক্সের সঙ্গে। ফলে ঐগুলির মধ্য দিয়ে শব্দ প্রবাহিত হয়ে রেজনেন্স-সৃষ্টি করে আরও বড় হয়ে উঠত। এতে কোন বিদ্যুৎ শক্তির প্রয়োজন হ'ত না।

কিন্তু রেকর্ড-প্লেয়ার বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্র। এজন্য এখন রেকর্ডের ওপর একটা পিন রেখে শব্দ সংকেতের যে কম্পন গ্রহণ করা হয় তাকে মাইক্রোফোনের মত বিদ্যুৎ-সংকেতে পরিণত করা হয়। ঐ বিদ্যুৎ সংকেত এ্যামপ্লিফায়ার হয়ে লাউডস্পিকারে গিয়ে চূড়ান্ত রূপ পায়। রেকর্ড-প্লেয়ারের সঙ্গে একটা মাইক্রোফোন এ্যামপ্লিফায়ার ও লাউডস্পিকার সংবলিত শব্দপ্রবর্দ্ধন ব্যবস্থার পার্থক্য যে এখানে সরাসরি শব্দ তরঙ্গের অভিঘাতে

ক্রিয়াটি চালু হয় আর এখানে ক্রিয়াটি চালু হয় সংরক্ষিত শব্দ-সংকেতের ওপর যান্ত্রিক উপায়ে পিন চালিয়ে। এ ছাড়া দুই-ব্যবস্থার মধ্যে কোন পার্থক নেই।

শব্দ-সংরক্ষণ বা রেকর্ডিং।।

আমরা শব্দ-সংরক্ষণ বলতে গ্রামোফোন বা রেকর্ডপ্লেয়ারের রেকর্ড তৈরীর কথা বলছি না, কেন না, আগেই বলেছি তা ব্যবসায়ী-সংগঠনের বাইরে আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা এখানে টেপ-রেকর্ডারে রেকর্ডিং-এর কথাই বলব।

টেপ-রেকর্ডারে ক্যাসেট ব্যবহারও করা যায়, স্পুলও ব্যবহার করা যায়। নাটকাভিনয়ে ব্যবহার করতে হ'লে ক্যাসেটের চেয়ে স্পুলই ব্যবহার করা ভাল। তা হলে শব্দ-সম্পাদন সম্ভব হয়। এ জন্য স্পুল ব্যবহার করবার কথা ভেবেই এখানে আলোচনা করা হচ্ছে।

রেকর্ডিং-এর প্রস্তুতি-পর্ব

১। প্রথমেই ভরা স্পুলটা বাঁদিকে আর খালি স্পুলটা ডানদিকে বসাতে হবে। খালি-স্পুলে দু-তিন পাক ফিতে আগেই জড়িয়ে নিতে হবে।

২। লক্ষ্য রাখতে হবে ফিতের যে পিঠে ল্যাকার লাগান আছে সেই পিঠটা যেন চুম্বকের মুখের দিকে থাকে।

৩। স্পুলের ঘূর্ণন বাড়ান কমানর যন্ত্রাংশটি উপযুক্ত স্থানে আছে কি না পরীক্ষা করে নিতে হবে।

৪। স্পুল-এর যে ট্রাকে রেকর্ডিং করা হবে বলে স্থির করা হয়েছে, সেই দিক ঠিক বসান হয়েছে কিনা, তা দেখে নিতে হবে।

৫। রেকর্ডিং শুরু করবার আগে টেপ-কাউন্টার থেকে দৈর্ঘ্য নির্দ্দেশক সংখ্যাটি লিখে রাখতে হবে। কোন একটা রেকর্ডিং শেষ হলেও সংখ্যাটি লিখতে হবে। এবার কোন খাতায় রেকর্ডিং এর বিষয়টাও যদি লিখে রাখা যায় তবে ঐ টেপ ব্যবহারে সুবিধা হবে।

৬। কোন কোন মেশিনের 'সেফটি লক' থাকে। রেকর্ডিং-এর প্রস্তুতির সময় দেখে নিতে হবে সেফটি লক খুলে নেওয়া হয়েছি কি না।

৭। সব কিছু আর একবার পরখ করে নিয়ে তবে রেকর্ডিং-এর জন্য বোতাম টেপা যেতে পারে।

রেকর্ডিং-এর ব্যাপারে আরও কতকগুলি সতর্কতা নেওয়া উচিত। যেমন, যে কোন রেকডিং শুরু করবার একটু আগে থেকেই টেপটি চালু করা উচিত। এ ভাবে রেকডিং শুরু করবার লাভ এই যে এতে টেপ পূর্ণ-গতি পেলে তবে রেকর্ডিং শুরু হয় আর যদি রেকর্ড করা টেপের ওপর রেকর্ড করা হয়ে থাকে তবে আগের ও পরের রেকর্ডের মধ্যে বেশ খানিক বিরতি পাওয়া যায়। রেকর্ডিং শেষ হবার একটু পরে বন্ধ করলেও দ্বিতীয় সুবিধা পাওয়া যায়। এর ফলে সম্পাদনার সুবিধা হয়।

রেকর্ডিং শুরুর একটু আগে মেশিন চালু করলে শুরু করবার বিশ্রী যান্ত্রিক শব্দটা সম্পাদনার সময় সহজেই বাদ দেওয়া যায়।

প্রত্যেক রেকর্ডিং-এর আগে রেকর্ডিং-এর একটা সূচক-বর্ণনা বলে রেকর্ড করে রাখা উচিত যেমন 'ষষ্ঠ পরিকল্পনার চতুর্থ গ্রহণ'। একটা পৃথক খাতায় সূচীপত্রও করে রাখা দরকার।

টেপকে সর্বপ্রকার চুম্বক-ঘটিত পদার্থ থেকে দূরে রাখতে হবে।

রেকর্ডিং-এর কৌশল ও সতর্কতা :

রেকর্ডিং-এর সময় বহুবিধ অবাঞ্ছিত পারিপার্শ্বিক শব্দ মূল-শব্দকে আবৃত করতে চায়। এই অবাঞ্ছিত শব্দ প্রতিরোধ করাই রেকর্ডিং-এর সময় মূল সমস্যা। সর্বপ্রকার সার্বিক ত্রুটিমুক্ত যে ঘর পারিপার্শ্বিকের সমস্ত রকম শাব্দিক প্রতিক্রিয়া মুক্ত, এমন শব্দ-নিরুদ্ধ (sound proof) ঘরেই রেকর্ডিং সব থেকে ভাল। সাউণ্ড-স্টুডিও ভিন্ন এ ব্যবস্থা আর কোথাও হওয়া সম্ভব নয়। তবে যে কোন পরিবেশে রেকর্ডিং-এর সময় প্রথম সর্তকতা এই যে, মাইক্রোফোন এমন জায়গায় রাখতে হবে যে, সে কখনই রেকর্ডারের সুইচ অফ্ অন্ করা বা অন্য কোন শব্দ শুনতে পাবে না।

এখন, রেকর্ডিং-এর জন্য সাউণ্ড স্টুডিও পাওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে আয়ত্তে মধ্যে যে সব ঘর আছে, তার ভেতর থেকেই যথাসম্ভব শব্দনিরুদ্ধ একটি ঘর বেছে নিতে হবে। দরজা জানালা বন্ধ করলে বাইরের শব্দ আরও কম প্রবেশ করবে। কিন্তু ঘরের রেজনেন্স এবং রিভারব্রেশন এখন কিছু বাধার সৃষ্টি করতে পারে। ঘরটি একেবারে ফাঁকা না হলে আসবাব পত্রাদি এ ব্যাপারে কিছু সহায়তা করবে। তবু মেঝেটা যদি কার্পেটে বা মোটা সতরঞ্চিতে ঢেকে নেয়া যায় তবে অনেকটা ভাল কাজ হবে। ঘরের দরজা জানালা এমন কি দেওয়ালের খানিকটাও যদি পর্দ্দা দিয়ে ঢেকে নেওয়া যায় তবে খুব ভাল ফল পাওয়া যাবে।

এ ব্যবস্থাও যদি না করা যায় তবে মাক্রোফোনের জন্য একটা ন'-দিক ঘেরা অর্থাৎ একদিক খোলা মোটা পর্দ্দার ঘর তৈরী করে নেওয়া যেতে পারে। খুব সহজেই এ ব্যবস্থা করা যায়। একটা কার্পেট মোড়া বা মোটা সতরঞ্চিতে ঢাকা মেঝের ওপর একটা টেবিল রাখা হল। টেবিলের ছাদের তিনদিক ঘিরে (অর্থাৎ বাংলা হিসেবে সাত দিক ঘিরে) ঝুলিয়ে দেয়া হ'ল মোটা পর্দ্দা। টেবিলটা এবার এক মুখ খোলা কাপড়ের ঘরে পরিণত হ'ল। টেবিলের ছাদে কাপড় রইল না। কিন্তু তাতে এমন কিছু ইতর বিশেষ হবে না। কারণ, কাঠও মোটামুটি ভাল শব্দশোষণ ক্ষমতা রাখে।

রেকর্ডিং-এর জন্য সময় নির্বাচনেও সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। সাধারণভাবে গভীর রাত্রে পারিপার্শ্বিকের অবাঞ্ছিত শব্দ কম থাকে। এজন্য গভীর রাত রেকর্ডিং এর জন্য সবচেয়ে প্রশস্ত সময়। তবে সবসময় গভীর

রাত্রে ব্যবস্থা করা যায় না। এজন্য দিনের মধ্যেও এমন সময় বেছে নিতে হবে, যখন পারিপার্শ্বিক কোলাহল ও অ-বাঞ্ছিত শব্দ থাকে কম।

রেকর্ডিং-এর জন্য বহুমুখী মাইক্রোফোন ব্যবহার না করাই বিধেয়। বহুমুখী মাইক্রোফোন চারদিকের বহু অ-বাঞ্ছিত শব্দ ধরে নেয়। একমুখী মাইক্রোফোন এ দিক থেকে অ-বাঞ্ছিত শব্দ বাতিল বাঞ্ছিত-স্বর উপযুক্ত গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণের পক্ষে আদর্শ।

শব্দ উৎস থেকে একটি বিশেষ দূরত্বে মাইক্রোফোন রাখতে হয়। সাধারণভাবে এই দুই-এর মাঝে দূরত্ব একফুট (৩০০ মি. মি.) হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে মৃদুভাষী কোন কোন বক্তার পক্ষে এই দূরত্ব কমিয়ে পাঁচ-ছয় ইঞ্চির (১২৫-১৫০ মি. মি.) মধ্যেও আনতে হতে পারে। এ ক্ষেত্রে একটা অসুবিধা এই দেখা দেয় যে বক্তার নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দও মাইকে ধরা পড়ে এবং সে স্বর ডায়াফ্রামে এসে প্রায় একটা ঝড়ের মত গর্জনে পরিণত হয়। মাইক্রোফোনের অক্ষরেখা (axis) একটু বাঁকা করে, বক্তার মুখকে সামান্য পাশ করে বসালে এ ত্রুটির হাত থেকে অনেকটা রক্ষা পাওয়া যায়। এই অসুবিধা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য একটা বায়ু-ঢাল (wind shield) ব্যবহার করা যায়। বায়ু-ঢাল আসলে একটা ঢাকনি। কখন একটা মোজা জাতীয় আবরণ দিয়ে মাইক্রোফোন ঢেকে দেওয়া হয় কখনও এর সামনে যোগ করা হয় এমন একটা চোঙ যার চার দিক ঘেরা আছে রবার, স্পঞ্জ জাতীয় শব্দ শোষক পদার্থে। এর ফলে বাতাসের সাঁই-সাঁই শব্দের হাত থেকে সম্পূর্ণ রক্ষা পাওয়া যায়। খোলা জায়গায় রেকর্ডিং করতে হলে বায়ু-ঢাল অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। এতে অসুবিধাও সামান্য ঘটে। মূল শব্দকে বায়ু-ঢাল কিছু পরিমাণে শুষে নেয়।

শব্দ উৎস থেকে বক্তা যদি খুব বেশী দূরে থাকেন, তবে শব্দের 'স্বাস্থ্য' বেশ কিছু পরিমাণে ক্ষীণ হয়ে ধরা পড়ে। কারণ এতে 'বেস-রেসপন্স' আপাত ভাবে কমে যায় অর্থাৎ সরাসরি আগত শব্দ এবং প্রতিফলিত শব্দের অনুপাত লঘু হয়ে যায়। যদি শব্দে দূরত্ববোধ সৃষ্টিই অভিপ্রেত হয়ে থাকে তবে একমুখী মাইক্রোফোনের মরা-দিকটার দিকে বক্তা একটু সরে গেলেই হবে। কয়েক ইঞ্চি মাথা সরালেই স্বরে অনেক দূরত্বের প্রতিভাস আনা যাবে। এজন্য বক্তাকে ছুটে দূরে যাবার দরকার নেই বা নিজের কণ্ঠ স্বরকেও চাপা বা অন্যতর ভাবে দূরত্ব-সূচক করবার দরকার হয় না। মাইক নিজেই সে কাজ করে দেয়।

সাধারণ কৌশল ও সতর্কতাই এখানে বর্ণনা করা হল। দেখা যাবে এই কয়েকটি কৌশল অবলম্বন করে সতর্কতা সহ কাজ শুরু করে ক্রমে আরও কৌশল ও সতর্কতা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সঞ্চিত হবে।

৭

শব্দমায়া সৃষ্টি

সংলাপ ছাড়া শ্রুতিনাটকে যে সব শব্দ সংযুক্ত করা হয় তার বেশির ভাগ শব্দই তাৎক্ষণিক শব্দ নয়, সংরক্ষিত শব্দ। তাৎক্ষণিক শব্দ ব্যবহারে সময়, মাত্রা ইত্যাদি রক্ষা করার নানা সমস্যা থাকায় অনেক সময়ই ওগুলিও রেকর্ড করে রাখা হয়। ভাবাত্মক শব্দগুলিকে তাৎক্ষণিকভাবে সৃষ্ট করা গেলেও রেকর্ড করে রাখাই ভাল।

পারিপার্শ্বিক ও প্রাকৃতিক শব্দগুলি সবসময় প্রকৃতি ও পরিবেশ থেকে সংগ্রহ করা যায় না। বাতাসের শব্দ প্রকৃতি থেকে গ্রহণ করে পরিবেশন করতে গেলে অনেক সময় ব্যাঘ্র গর্জনে পরিণত হয়। বন্দুকের আওয়াজ পরিণত হয় কামান-দাগার শব্দে। এ সব কারণে বহু শব্দই কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করা হয়। নিচে আমরা এমন কতকগুলি শব্দ মায়া সৃষ্টির কৌশল বর্ণনা করছি।

১. প্রাকৃতিক শব্দাদি

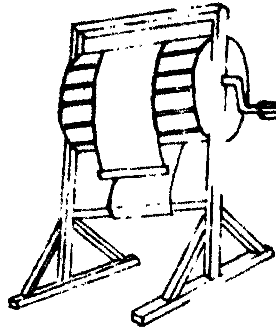
বাতাস ঝড় :

বায়ুর বেগের তারতম্যে বাতাসকে নানারকম নাম দেওয়া হয়। প্রত্যেক রকম বেগের বাতাসের শব্দ বিভিন্ন। কিন্তু বায়ুবেগ কমই হোক আর বেশিই হোক তার রেকর্ড করা দুরূহ ব্যাপার। আমরা বায়ুবেগকে শোষণ করে নেবার জন্য মাইক্রোফোনের সামনে বায়ু-ঢাল ব্যবহার করি। সামান্য নিশ্বাসের বাতাস মাইক্রোফোনে বিভৎস সিংহ-নাদ বয়ে আনে। ফলে বাতাসের শব্দের রেকর্ডিং এর কথা শব্দ-শিল্পীরা চিন্তা করেন না। এ জন্য একটা সামান্য (কিন্তু অসামান্য ফলপ্রদ) বায়ুযন্ত্র তৈরী করে নেওয়া যেতে পারে।

এই 'বায়ুযন্ত্র' আসলে একটি কাঠের ড্রাম। এই ড্রামটির গায়ে খানিকটা ফাঁকে ফাঁকে একটা করে কাঠের বাতা মারা থাকে। ড্রামটা একটা কাঠের মেরুদণ্ডের ওপর ঘোরাবার ব্যবস্থা করা হয় এবং স্বভাবতঃ ঐ মেরুদণ্ড বা ধুরোকে বসাবার জন্য একটা স্ট্যাণ্ড দরকার হয়। এবার বেশ বড় সড় (ড্রামের চারদিকে ঘুরিয়ে আনা যেতে পারে, এই মাপের চেয়ে কিছু বড়) একটুকরো ক্যাম্বিসের এক প্রান্ত ড্রামের তলার দিকে কোথাও এঁটে, অন্যপ্রান্ত একটা কাঠের রডের সঙ্গে যুক্ত করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

এবার এই অবস্থাতেই যদি ড্রামটিকে ঘোরানো যায় তাহলে ড্রামের ওপরের

কাঠের বাতার সঙ্গে ক্যাম্বিসের মৃদু ঘষায় যে শব্দ উৎপন্ন হবে তা মৃদু বাতাসের শব্দের বিভ্রম সৃষ্টি করবে।



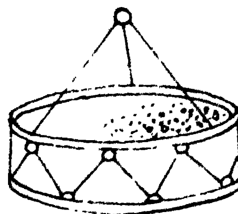
চিত্র।। বায়ু যন্ত্র।

এই যন্ত্রে ড্রামের ঘূর্ণনবেগ এবং ক্যাম্বিসের ওপর চাপের তারতম্য ঘটাবার ব্যবস্থা করা আছে। এই গতিবেগ ও চাপের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়ে তীব্র ঝড় থেকে সামান্য বাতাস বয়ে যাওয়ার শব্দ পর্যন্ত সৃষ্টি করা যায়।

অনেকে আবার এই ড্রামের সঙ্গে সাইকেলের চেন প্যাডেল গিয়ার ইত্যাদি লাগিয়ে নেন। এর ফলে গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ আরও সহজ হয়ে যায়। ক্যাম্বিসের খোলা প্রান্তে একটা লিভার ব্যবস্থা করে নিলে চাপ কমান বাড়ানও সহজ হয়ে যায়। এই যন্ত্র নির্মাণে ব্যয় বেশি নয়।

বৃষ্টিপাত :

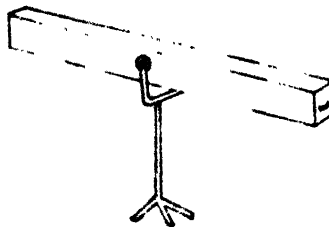
বৃষ্টির শব্দ তৈরী করবার জন্য নানা রকম পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়ে থাকে। একটি পদ্ধতি হচ্ছে একটা ড্রাম বা ট্রের ওপর শুকনো মটরদানা, কলাই বা লোহার ছোট ছোট বল গড়াবার ব্যবস্থা করা। ড্রাম বা ট্রের বদলে কাগজের বাক্সও ব্যবহার করা যেতে পারে। ড্রাম বা কাগজের বাক্সের গভীরতা যত বেশী বেশী হয়, শব্দ সেই পরিমাণে গভীর হয়ে থাকে। তবে এই দানাগুলি ক্রমাগত গড়িয়ে গড়িয়ে একটানা শব্দ সৃষ্টি অবশ্যই অভ্যাস সাপেক্ষ। উপযুক্ত মহড়ায় প্রস্তুত না হয়ে এ শব্দ সৃষ্টি করতে গেলে ব্যর্থ হতে হবে।



চিত্র : বৃষ্টিপাত

অনেক সময় বৃষ্টিপাতের শব্দ সৃষ্টির জন্য 'বৃষ্টি-যন্ত্র' তৈরী করা হয়ে থাকে।

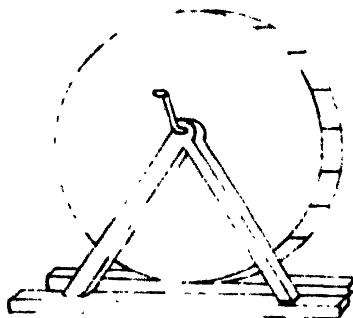
বৃষ্টি-যন্ত্র অনেক রকম হয়। প্রত্যেক রকম বৃষ্টিযন্ত্রই আসলে পূর্বসূত্রকে কাজে লাগিয়ে ঘোরান ব্যবস্থাকে উন্নততর করার উপায় মাত্র। বলা যায় এগুলি পূর্বতন ব্যবস্থারই ক্রমোবিকাশ।



চিত্র : বৃষ্টিপাত ২

প্রথম প্রকার বৃষ্টি-যন্ত্র আসলে ফুট তিনেক লম্বা আধ ফুট প্রশস্ত এবং আধফুট উচ্চতা বিশিষ্ট একটা কাগজের বাক্স। এর ঠিক দেড় ফুটের জায়গায় একটা ধুরো লাগাবার ব্যবস্থা আছে এবং তা একটা স্ট্যাণ্ডের ওপর রাখবার ব্যবস্থা আছে। এর ভেতরে শুকনো মটর দিয়ে এদিক ওদিক গড়াবার ব্যবস্থা করা যায়। ধুরো এবং দাঁড়া থাকায় গড়ান ব্যবস্থাটা সুনিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়।

দ্বিতীয় বৃষ্টি-যন্ত্রে কাগজের চৌকো লম্বা বাক্সের পরিবর্তে একটা গোল বাক্স তৈরী করা হয়। এটিও দাঁড় করান ওবং প্যাডেল দিয়ে ঘোরাবার ব্যবস্থা করা



চিত্র : বৃষ্টিপাত ৩

থাকে। এর ভিতরেও মটরদানা জাতীয় জিনিস দেওয়া হয়। ঘোরাবার ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত হওয়ায় এতে একটানা বৃষ্টির শব্দ তৈরী করা সহজতর হয়ে থাকে।

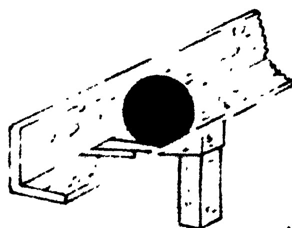
বাঙলাদেশের গ্রামাঞ্চলে যে সব নাট্যদল অভিনয়ের আয়োজন করেন তাঁদের জন্য আমরা এক অতি সহজ পদ্ধতি বর্ণনা করছি। এজন্য দরকার হয় একটা বস্তা আর খানিকটা গ্রীজ প্রুফ কাগজ। এই কাগজটি মাইক্রোফোনের সামনে একটা নলের আকারে একদিক উঁচু একদিক নীচু করে ধরা হয়। বস্তাটা রাখা হয় নীচু দিকের তলায়। এবার নলের উচু মাথায়

মোটাদানার চিনি ফেলা হতে থাকে। এই চিনি কাগজে পড়ে গড়িয়ে চলে যায়। এই শব্দ মাইক্রোফোনের ঠিক বৃষ্টির শব্দের মত লাগে।

একদল খুঁত খুঁতে পরিচালক এ সব শব্দে খুশী হন না। তাঁরা হোজ পাইপে জল এনে একটা ফুটোওয়ালা পাইপের ভিতর দিয়ে চালান। এই পাইপের এক মুখ থাকে বন্ধ। অতএব হোজপাইপের জলের তোড় নিয়ন্ত্রণ করলেই পাইপে আসা জলের তোড় কমান বা বাড়ান যায়। এখন প্রয়োজন মত বেগে জল ফেলা হয়। ঐ জল জলাধারে পড়ে, জলে জল পড়ার শব্দ সৃষ্টি করে। যদি টিনের ওপর জল পড়ার শব্দ সৃষ্টি করতে হয়, তবে ঐ জলধারার তলায় কাত করে এক টুকরো ঢেউ খেলান টিন রাখা হয়। টিনের তলায় অবশ্যই ফাঁপা কাঠের নল রাখতে হবে। তা হ'লে নলের মাধ্যমে যে রেজনেন্স সৃষ্টি হবে তাতে শব্দটা আরও নিখুঁত হবে। এ ব্যবস্থায় অনেক আয়োজন করতে হয় বলে অনেকেই এই ব্যবস্থা এড়িয়ে যান। তবু সন্দেহ নেই, এটিই বৃষ্টির শব্দ সৃষ্টির নিখুঁততম পথ।

বজ্রপাত ও মেঘগর্জন

বৃষ্টিপাতের শব্দের মতই মেঘগর্জন ও বজ্রপাতের শব্দের রেকর্ডও বাজার থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে শুধুমাত্র সহজতর কৃত্রিম উপায়ে ঐ শব্দ সৃষ্টির সম্ভবনা থাকায়। পুরোন নাট্যমঞ্চে একটা ফাঁক ফাঁক কাঠের গড়ান পথে কামানের গোলার মত লোহার বড় বল গড়িয়ে দিয়ে বজ্রপাত ও মেঘগর্জনের শব্দ-সৃষ্টি করা হ'ত। বলটা ফাঁকগুলিতে আহত হয়ে যে শব্দ উৎপাদন করত তার দ্বারা বজ্রপাত এবং গড়িয়ে যাওয়ার সময়কে মেঘ গর্জন বলে মনে হত। এতে অসুবিধা হ'ত এই যে যতক্ষণ পর্যন্ত বল গড়াত ততক্ষণ শব্দ বন্ধ হ'ত না এবং নির্দ্দিষ্টজায়গায় ফাঁক থাকায় বজ্রপাতের সময়টা একেবারে নিয়মিত হ'ত। ফলে শব্দ-সংযোগ হ'ত বড়ই কৃত্রিম। পরবর্তী কালে একটি সহজতর উপায় তৈরী করা হয়েছিল।

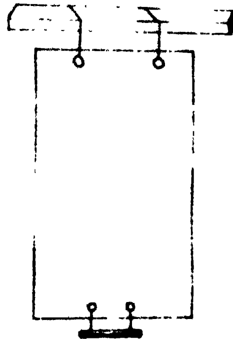


চিত্র।। বজ্রপাত ও মেঘগর্জন (১)

এটা ছিল একটা কাঠের গাড়ি। এর চাকাগুলো মসৃণ গোল হ'ত না, হ'ত পলতোলা অনিয়মিত আকারের। গাড়ি বোঝাই করা হ'ত এবড়ো-খেবড়ো

পাথরের চাঙর দিয়ে। এবার কাঠের মঞ্চের ওপর দিয়ে এই গাড়ি টানলেই মেঘ গর্জনের আওয়াজ পওয়া যেত। গাড়ির এক প্রান্তের উঁচু চাকা এবং অন্য প্রান্তের নীচু চাকা এক সঙ্গে মেঝের সংস্পর্শে এলেই গাড়িটা ঝাঁকুনি খেয়ে এমন একটা শব্দ করত যে মনে হ'ত বুঝি বা সত্যই আকস্মিক বজ্রপাত হ'ল।

বর্ত্তমান কালে এর বাইরেও সহজতর উপায়ে মেঘ-গর্জনের শব্দ সৃষ্টি করা হয়। এজন্য এক টুকরো গ্যাল্‌ভানাইজড় লোহার চাদর (টিনের নয়) দরকার। খুব বড় দৈর্ঘ্যের না হ'লেও কাজ চলে। তবে এই চাদরের আয়তন ৪'× ২' বর্গফুটের চেয়ে কম না হওয়াই ভাল। এই চাদরের এক প্রান্ত ধরে কাঁপালেই মেঘ গর্জন ও বজ্রপাতের শব্দ পাওয়া যায়। একে একটা স্থায়ী রূপ দিতে গেলে এবং ব্যবহারে যোগ্যতা বাড়াতে গেলে এই চাদরটিকে একটি দণ্ড ও হাতলের সঙ্গে যুক্ত করতে হয়। দণ্ডটির সঙ্গে চাদরটি সরু এবং শক্ত তার দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। চাদরের তলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় একটা হাতল। এবার দণ্ডটা কোথাও স্থিরভাবে ঝোলাবার ব্যবস্থা করে তলার হাতলে চাপ দিতে থাকলেই বজ্রপাত ও মেঘগর্জনের শব্দ হতে থাকবে।



চিত্র।। বজ্র-চাদর।

এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে চাদরের দৈর্ঘ্য এবং বেধের ওপর শব্দের গাম্ভীর্য নির্ভর করে। অনেকে এ জন্য একাধিক রকম দৈর্ঘ্য ও বেধ বিশিষ্ট একাধিক চাদরের ব্যবহার করে থাকেন।

একটা বড়-সড় প্লাই-উডের টুকরো ব্যবহার করেও এই একই ফল পাওয়া যায়। একটা বড় লোহার ড্রাম দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে তাতে বিগ্‌-ড্রাম বাজাবার প্যাড়ওয়ালা কাঠি দিয়ে ঘা মারলেও বজ্র গর্জনের শব্দ পাওয়া যায়।

সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাস ও তরঙ্গভঙ্গ

এ সব শব্দের জন্য নানাবিধ রেকর্ড বাজারে চালু আছে। তবে বৃষ্টির শব্দের জন্য যে গোল ড্রাম তৈরীর কথা বলা হয়েছে তাকে বিশেষভাবে ব্যবহার

করে সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছাস ও তরঙ্গ-ভঙ্গের শব্দ পাওয়া যায়। এ জন্য যন্ত্র চালাবার পদ্ধতিটি ভিন্ন। সমান বেগে ক্রমাগত চালান হবে না। বেশ জোরে ঘোরান শুরু করে এক পাক ঘোরাবার কালের মধ্যেই গতি মৃদু করে আনতে হবে। এবার একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বিপরীত মুখে খানিকটা ঘুরিয়ে ক্রমে শব্দটা আধ পাকের মধ্যে থামিয়ে দিতে হবে ক্রমোক্ষীয়মান লয়ে। এর পদ্ধতিটা হবে নীচের সূত্রের মত।

জোরে শুরু ক্রমে আস্তে এক পাক + ঝাঁকুনি + উল্টো পাকে ক্রমে আস্তে আধ পাক + সামান্য বিরতি এবং পুনরাবৃত্তি।

পুকুরে স্নান, জলে ঝাঁপ, জল ঢালা, সাঁতার কাটা।

এ সব শব্দ প্রয়োজন মত নিজস্ব রেকর্ডিং রুমে তৈরী করে নেওয়াই ভাল। বড় বাথটবে আকাঙ্ক্ষিত শব্দ তৈরী করা যায়। একটা ছোট ছেলে জলে লাফ দিয়ে পড়লে, সেই শব্দ রেকর্ডিং-এর পর একজন বয়স্ক লোকের পুকুরে ঝাপ দেওয়ার শব্দের অনুভব আনে। নদীতে ঝাঁপ বোঝাতে ওর সঙ্গে নদীর ছলছল্ শব্দ মেশাতে হয়। স্নানের শব্দ তৈরী করতে গেলে ঐ টবের জলে ছেলেটি গা ডলা, ডুব দেওয়া ইত্যাদি কাজ করে শব্দ সৃষ্টি করবে। হাত দিয়ে জল টেনে সাঁতার কাটার আওয়াজ তৈরী করা যায়।

কলসী থেকে জল ঢালা, গ্লাস থেকে জল ঢালা ইত্যাদি শব্দের জন্য মাইক্রোফোনের সামনে ঠিক ঐ কাজগুলি করেই শব্দ সংকেত ধরে [illegible] যেতে পারে। অনেক হরবোলা মুখে এ সব শব্দ খুব সুন্দর ভাবে [illegible] পারেন। অনেক সময় মুখে সুন্দর লাগলেও প্রবর্দ্ধিত হয়ে মাইকে শব্দগুলি আদৌ ভাল লাগে না। এ জন্য যে কোন শব্দ-সংকেত গ্রহণের পরেই ফলাফল পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত।

২. পশু পাখীর শব্দ

পাখীর ডাক

দু একটা বিশেষ পাখীরডাক ছাড়া সবরকম পাখীর ডাকের আওয়াজই রেকর্ডে পাওয়া যায় বা মুখে তৈরী করা যায়। বহু রকম পাখীর ডাকের রেকর্ড আছে। একক ডাক বা সমবেত ডাক সবই রেকর্ড পাওয়া যায়।

পাখীর ডাকের মত শব্দ হয় এমন অনেক বাঁশী কিনতে পাওয়া যায়। এমন কয়েকটা বাঁশী কয়েক জন একত্রে বাজালে অনেক পাখীর আওয়াজ বলে বোধ হয়।

নাটকের মঞ্চ নির্দ্দেশনায় যদি বিশেষ পাখীর নামোল্লেখ করা থাকে তবে প্রথমেই সেই পাখীর ডাকের রেকর্ড খোঁজা ভাল। প্রকৃত পাখীর ডাকটা ভাল করে শুনলে অনেক হরবোলা তা সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিতে পারেন। মুখের কাছে

একটা বালতি ধরলে শব্দটা জোরাল হয়।

পেঁচার ডাক নকল করবার একটা সহজ পদ্ধতি হলে হাতের মুঠো পাশাপাশি জড়ো করে দুই বুড়ো আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে জোরে ফুঁ দেওয়া। একটু অভ্যাস করলে শব্দটা নিখুঁত হয়। দূরের ট্রেনের হুইসিলের শব্দ শোনাতে এই ভাবে শব্দ তৈরী করা যায়।

পাখীর ডানা ঝটপটানি :

কোন কোন নাটকে পাখীর ডানা ঝটপটানির শব্দের প্রয়োজন হয়। এই শব্দ সৃষ্টি করা এমন কিছু জটিল নয়। অথচ নাট্যবিদ্ স্তানিস্লাভস্কি বিপদে পড়েছিলেন এই শব্দ নিয়ে। আকস্মিকভাবে ফ্যানের হাওয়ায় খবরের কাগজ উড়ে গিয়ে তার মনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে কৌশলটি। আজ আমরা কেই চিন্তার ফসলকেই 'সহজ' বলে বর্ণনা করছি।

একটা খবরের কাগজ ভাঁজ করে এক কোণা ধরে ঝুলিয়ে অন্য হাতের আঙ্গুল দিয়ে ডাইনে-বাঁয়ে নাড়াতে থাকলে এই শব্দ পাওয়া যায়। একটা টেবিল-ফ্যান চালিয়ে তার ব্লেডগুলোর মধ্যে একটা পোষ্টকার্ড আলতোভাবে ধরে রাখলেও এই একই ফল পাওয়া যায়।

ঘোড়ার খুরের শব্দ :

ঘোড়ার খুরের শব্দ বহু ঐতিহাসিক নাটকে প্রয়োজন হয়। কিন্তু এ সংযোগ করতে গেলে প্রথমেই ভেবে নিতে হবে কোন পথে ঘোড়া ছুটেছে। কিছুদিন আগে কি একটা হিন্দী ছবিতে দেখলাম বালিয়াড়ির পথে একদল লোক ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে, কি তার টগবগ শব্দ। হায়রে। পরিচালক একবারও ভাবলেন না যে বালিতে ঘোড়ার খুরের আঘাত লেগে অমন শব্দ ওঠে না। আমাদের শব্দ-শিল্পী অবশ্য এ বিষয়ে সতর্ক হবেন।

শক্ত বা পাথুরে পথে ঘোড়া ছুটে চললে যে টগবগ শব্দ হয়, তা অনায়াসে নকল করা যায় দু টুকরো নারকেল মালা দিয়ে। নারকেল মালার শীর্ষস্থান



ফুটো করে তাতে করতালের মত দুটো দড়ি পড়িয়ে নিতে হবে। দু হাতে দুটি দড়ি ধরে তাল মত শক্ত মেঝেতে ফেলা-তোলা করলেই খুব সুন্দর

ঘোড়ার টগবগানি তোলা যায়।

আমি একজন শব্দ সংযোজককে এমন চারটে মালা একত্রে ব্যবহার করতে দেখেছি। তিনি দুটি এক ফুট কাঠির মাথায় বেঁধেছেন চারটি মালা। এবং কাঠি দুটির মাঝখানটা হাতের তিন আঙ্গুলের কায়দায় এমন ভাবে ধরেছেন যে মাঝের আঙ্গুল স্থির রেখে অন্য দুই আঙ্গুলের চাপ একটু কমিয়ে বাড়িয়েই পর্যায়ক্রমে মালা দুটি ফেলা ও তোলার কাজ করছেন। দু হাতে চালিয়ে তিনি জুড়ি গাড়ির ঘোড়ার পায়ের শব্দ এত সুন্দর তুললেন যাতে মুগ্ধ হয়েছিলাম।

এভাবে মালা-চালনা রীতিমত অভ্যাস সাপেক্ষ। তবে শুধু অভ্যাস করলেই হবে না, তার আগে ঐ শব্দ রীতিমত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। কারণ ঘোড়ার খুরের আওয়াজ সব সময় একরকম হয় না। গতির সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজের পরিবর্তন ঘটে। ঘাসের চাবড়ার ওপর ঘোড়ার পায়ের শব্দ শক্ত কুসন চেয়ারের ওপর হাতের মুঠি ঠুকে তোলা যেতে পারে। এর সঙ্গে ঘোড়ার নাসিকা ধ্বনি, নিশ্বাস ফেলার শব্দ ইত্যাদি যোগ করে ব্যাপারটাকে আরও স্বাভাবিক করে তোলা যায়। এ সব শব্দ সৃষ্টি খুব সহজ। ঠোঁট দুটি শিথিলভাবে রেখে মাঝ দিয়ে জোরে ঠেলে বাতাস বের করে দিলে যে কেউ ঘোড়ার নাসিকা ধ্বনির অনুকরণ করতে পারন। এর সঙ্গে যদি ঘোড়ার সাজের ঠকমকি, চাকার গড়গড় শব্দ ইত্যাদি যোগ করা যায়, তবে বিষয়টি আরও জীবন্ত হয়ে ওঠে। একটা মাটির কলসির মধ্যে কয়েকটা পয়সা ফেলে ঝাঁকালে ঘোড়ার সাজ থেকে ওঠা শব্দের আভাসও পাওয়া যায়।

অন্যান্য জীবজন্তুর শব্দ :

অন্যান্য জীবজন্তুর নানা রকম ডাকের নানা রকম রেকর্ড পাওয়া সম্ভব। একটা বিদেশী কুকুরের ডাকের রেকর্ডে শুনেছিলাম একটা গাড়ি চাপা পড়া একটা শেষ মরণ চিৎকারও রেকর্ড করা হয়েছে। এই বিস্তৃত পরিধির রেকর্ড সংগ্রহ ও নির্বাচনই এ বিষয়ে সাধারণ রীতি। না হলে শব্দ-শিল্পীকে তাঁর ব্যক্তিগত বুদ্ধি ও কল্পনাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে ঐ ধরণের শব্দ সৃষ্টির আয়োজন করে নিতে হবে। আমরা নীচে কয়েকটি সংকেত দিলাম।

একটা ভপু জাতীয় বাঁশী (তূর্য শিঙ্গা) বুনো হাঁসের শব্দ বা গাধার ডাকের আওয়াজ সৃষ্টিতে কাজে লাগান যায়। একটা মস্ত রবারের নলের ভিতর দিয়ে জোরে বাতাস বের করে (অর্থাৎ ফুঁ দিলে) নানা রকম ধ্বনি সৃষ্টি সম্ভব।

৩. মনুষ্য-সৃষ্ট শব্দাদি :

জনতার কোলাহল

মনুষ্য সৃষ্ট যে সব শব্দ নাটকে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়, তার মধ্যে জনতার কোলাহল সবচেয়ে বড় স্থান জুড়ে আছে। জনতার উল্লাস উচ্ছ্বাস, সমর্থন থেকে চিৎকার প্রতিবাদ, ধিক্কার এমন কি হল্লার শব্দও রেকর্ড হিসাবে

কিনতে পাওয়া যায়। কিন্তু মজার কথা এই যে এসব রেকর্ডের কোনটাই নাটকের প্রয়োজনের সঙ্গে ঠিক ঠিক মিলে যায় না। এ জন্য জনতার কোলাহল সৃষ্টিতে এই সমস্ত রেকর্ডের শব্দকে আবহ সঙ্গীতের মত নেপথ্যে রেখে একদল লোককে উপযুক্ত মহড়া দিয়ে প্রস্তুত করে নেপথ্যে জনতার ভূমিকায় অভিনয় করাতে হয়। দুয়ে মিলে নাটকের প্রয়োজনের উপযুক্ত হয়।

অনেক সময়েই মঞ্চাধ্যক্ষ জনতার ধ্বনির জন্য হাতের কাছে যাকে পান তাকে ডেকে নিয়েই জোড়াতালি দিয়ে কাজ সারেন। এ জন্য প্রায়ই দেখা যায় ভাল সংগঠনও প্রস্তুতি-মহড়ার অভাবে জনতা দৃশ্য মার খায়। জনতার তীব্র কোলাহলের জায়গায় দু-একজন লোকের অক্ষম চেঁচামেচি অনেক সময় পরিচালকের অবহেলা ও অদূরদর্শিতার পরিচয় তুলে ধরে। আবার খুব বেশি লোকও নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যায়। জনতা দৃশ্যের ব্যাপ্তিকাল সম্পর্কে জনতার অভিনেতাদের স্পষ্ট ধারণা থাকে না। যখন সুরু হবার কথা তার আগে বা পরে শুরু হয়। থামার সময়েও ঘটে একই ঘটনা। এসব কিছু ঘটে প্রস্তুতি এবং শৃঙ্খলাবোধের অভাবে। জনতার কোলাহল রীতিমত মহড়া ও পূর্ব প্রস্তুতি ভিন্ন ব্যর্থ হতে বাধ্য।

মঞ্চাধ্যক্ষ, পরিচালক এবং শব্দ-শিল্পীকে মনে রাখতে হবে যে যত রকম নেপথ্যধ্বনি নাটকে ব্যবহৃত হয়, তার ভেতর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে জনতা ধ্বনি। এ জন্যই ঐ সময়ে মঞ্চে প্রয়োজন নেই এমন সব অভিনেতাকেই এ ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজন হ'লে অন্য নেপথ্য শিল্পীরাও এতে যোগ দেবেন—কিন্তু এরাও নির্বাচিত হবেন মঞ্চের অভিনেতাদের মতই। যদি শুধুমাত্র একটা ধ্বনি দেওয়াই জনতার কাজ না হয় তবে মহড়ার সময়েই জনতা দলে একজন নেতা বা নিয়ন্ত্রা নির্বাচন করে নিতে হয়। নাটক সম্পর্কে তার সঠিক ধারণা থাকবে এবং ঐখানে জনতার ভূমিকা ব্যাখ্যা করে সকলকে বুঝিয়ে দেবেন এবং সকলকে দিয়ে প্রথমে পৃথক পৃথক ভাবে এবং পরে সমবেত ভাবে ঐ ভূমিকার মহড়া দেবেন। মোটকথা একটা অর্কেষ্ট্রা দলের মত তিনি সবগুলি কণ্ঠকে নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার করে বাঞ্ছিত ধ্বনি তৈরী করবেন।

এজন্য মহড়ার সময়েই তিনি কতকগুলি সাংকেতিক ভঙ্গি তৈরী করে নেবেন যা দেখেই জনতার দল বুঝবে 'সুরু কর', 'স্বরতোল' 'আরও তোলো', 'চূড়ান্ত পর্যায়ে এসো,' 'এবার নীচু কর', 'এবার থাম।'

জনতার অভিনেতারা নিজে থেকে কিছুই করবেন না। এই সংকেত অনুসারে তাকে কাজ করতে হবে।

এখন জনতার দলের সাধারণ চেঁচামেচির মধ্যেও যদি কারো কথা বিশেষভাবে শোনান দরকার হয়, তবে সে দায়িত্ব একজন বিশেষ শিল্পীকে

দিতে হবে এবং তাঁকেও পূর্ব থেকে কতকগুলি সংকেত শিখিয়ে রাখতে হবে যাতে তিনি বুঝতে পারেন কোথায় তাঁকে শুরু করতে হবে, কণ্ঠ সপ্তমে তুলতে হবে, কোথায় কণ্ঠকে নামাতে হবে।

জনতার মুখে যখন কোন ভাষা দেওয়া নেই তখন ভাবটাই প্রধান। জনতার দুঃখ কি বেদনা, প্রশংসা নাকি ধিক্কার, উদ্বেগ কি আগ্রহ সেটা বোঝা গেলেই হল। তবে আগে থেকে স্থির করে জনতার মুখে কথা বসাতে পারলে জনতার চরিত্র আরও সুন্দর ফুটে ওঠে।

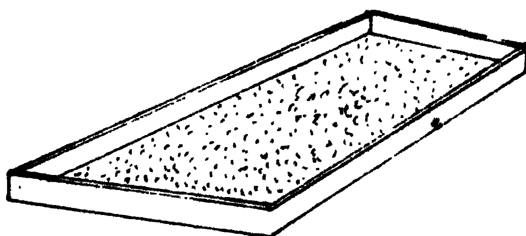
টেপ-রেকর্ডারের ব্যবস্থা থাকলে উপযুক্ত মহড়ার পর একবার জনতার ধ্বনির রেকর্ড তৈরী করে রাখলে সবচেয়ে ভাল হয়।

পদধ্বনি :

বহু নাটকেই মঞ্চের অভিনেতার অভিব্যক্তির জন্য নেপথ্যের পদধ্বনি একটা অত্যাবশ্যক শব্দ সংযোজনা। কিন্তু বহু পরিচালকই এ বিষয়টি উপেক্ষা করেন। কোথাও বা অভিনেতা মঞ্চের মেঝেতে পা দাপিয়ে পদধ্বনি সৃষ্টির ব্যর্থ প্রয়াস পান। এর কোনটিই সুষ্ঠু নাট্য -প্রযোজনার উপযুক্ত নয়। পদধ্বনির নানারকম রেকর্ড পাওয়া যায়। কৃত্রিম উপায়ে পদধ্বনি সৃষ্টির উপায়ও আছে। আমাদের মনে রাখতে হবে ঘাস বা কার্পেটের ওপর দিয়ে হাঁটলে কোন শব্দের প্রয়োজন হয় না। যদি কাঠের ওপর দিয়ে হাঁটে তাহলে একটা কাঠের পর বা মঞ্চের মেঝে যদি কাঠের হয়, তার ওপরেই ভাল মোটা জুতোর সোল পা ফেলার মত ফেলে পদধ্বনি সৃষ্টি করা যায়। তবে যদি আগন্তুক কাঁকর ভরা পথমাড়িয়ে আসেন তবে তার পদশব্দ ভিন্নভাবে করা যায়। সৈন্যদলের কুচকাওয়াজের শব্দ তৈরী কবার কথা যেখানে বলা হবে, আমরা এ পদ্ধতিটি যেখানে বর্ণনা করব।

সৈন্যদলের কুচকাওয়াজের শব্দ :

এক সময় কয়েকজন নেপথ্য সহায়ক উইংসে গায়ে হাত দিয়ে মৃদু মৃদু এবং নিয়মিত থাপড় দিতে থাকতেন এবং তার শব্দকেই সৈন্যদলের কুচকাওয়াজের শব্দ বলে চালান হ'ত। এ শব্দটা কুচকাওয়াজের শব্দ থেকে



একেবারে পৃথক, তা বোধ হয় না। তবে ঠিক কুচকাওয়াজের শব্দ বলে মেনে নিতেও ইচ্ছে হয় না। তবু পেশাদারী মঞ্চে তাকেই চালান হ'ত।

এ জন্য পরবর্তীকালে কুচকাওয়াজের শব্দের জন্য একটা যন্ত্র তৈরী করা হয়। এ জন্য ফুট ছয়েক লম্বা দেড় ফুট চওড়া এবং অন্ততঃ ইঞ্চি চারেক উঁচু একটা কাঠের ট্রে তৈরী করা হয়। এর তলাটায় কিছুনা দিলেও চলে তবে ব্যবহারের সুবিধার জন্য একটা আবরণ দেওয়া যেতে পারে। এবার ঐ ট্রেটিমেঝেতে রেখে নুড়িপাথর দিয়ে বোঝাই করে দিতে হবে। এখন প্রয়োজন মত তিনজন লোক (এমন মাপে তৈরী যে সামনে পিছনে তিনজন দাঁড়াতে অসুবিধা হবে না) এতে দাঁড়িয়ে কুচকাওয়াজ করলেই মনে হবে একদল সৈন্যমার্চ করছে। এর সঙ্গে রাইফেল ড্রিলিং এর শব্দও যোগ করা যায়। এদের হাতে এজন্য ৩" × ৫" প্রান্ত বিশিষ্ট একটা করে কাঠের লম্বা টুকরো দিতে হবে। এরা প্রয়োজন মত পায়ের তালের সঙ্গে কাঠের টুকরোগুলির নুড়ির ওপর ঠুকবেন। তা হ'লেই রাইফেল ড্রিলিং এর শব্দ বলে মনে হবে। এরা যত মৃদু ধীর পদক্ষেপ করবেন, ততই মনে হবে সৈন্যদল দূরে চলে যাচ্ছে।

একটা কাঠের বা কাঠবোর্ডের বাক্সে মটর দানা বা ক্ষুদে নুড়ি নিয়ে ছন্দ মত গড়াতে পারলেও সৈন্যদলের মার্চের আওয়াজ পাওয়া যাবে। এ পদ্ধতি পাওয়া শব্দ কিন্তু পূর্বের পদ্ধতি থেকে পাওয়া শব্দের মত অত যথার্থ নয়। যাই হোক এ পদ্ধতিতে যিনি সৈন্যদলের কুচকাওয়াজের শব্দ সৃষ্টি করবেন, তাঁকে হিসেব বুঝে মাইক্রোফোন যন্ত্র নিয়ে দাঁড়াতে হবে। যদি সৈন্যদল মার্চ করতে করতে চলে যেতে থাকে তবে তিনিও ক্রমেই পিছিয়ে যেতে থাকবেন আর যদি সৈন্যদল এগিয়ে আসতে থাকে তবে তিনি দূর থেকে ক্রমেই কাছে আসতে থাকবেন। অবশ্য একমুখী মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে ক্রমে মরা দিকে সরে বা মরা দিক থেকে সরে এসেও—এগুলো বোঝান যেতে পারে।

এই নুড়ি ভরা কাঠের ট্রে এর ওপর যে কেউ মৃদু পদক্ষেপ করলে কাঁকুড়ে পথে পদক্ষেপে শব্দ সৃষ্টি করা যাবে।

শিশুর কান্না :

কচি-শিশুর কান্না অনেক নাটকের নেপথ্যে ধ্বনি হিসাবে প্রয়োজন হয়। এ জন্য প্রকৃতই কোন শিশুর কান্না টেপ রেকর্ডারে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। অনেক হরবোলা শিশুর কান্নার নানা রকম এবং হুবহু নকল করতে পারেন। এ দুটি পথের কোন পথই যদি ব্যবহার করা না যায় তবে আর একটা পথের সন্ধান দেওয়া যেতে পারে। বাজার একরকম অতি সস্তা বেলুন বাঁশী কিনতে পাওয়া যায়। বাঁশীটার ফুঁ দেবার মুখে একটা বেলুন বাঁধা থাকে। এবার উল্টো দিক থেকে ফুঁ দিয়ে বেলুনটা ফুলিয়ে নিয়ে হাওয়াটাকে বাইরে যেতে দিলেই বাঁশী বাজে এবং যতক্ষণ বেলুনে হাওয়া থাকে বাঁশী বাজতে থাকে এই বাঁশীর মুখ হাতের তালু দিয়ে বন্ধ করে এবং খুলে অবিকল শিশুর কান্নার আওয়াজ

তৈরী করা যায়। শিশু-হত্যাকারী শিশুর কণ্ঠরোধ করছে এমন পরিস্থিতি লোমহর্ষক ভাবে সার্থক করা যায় এই বাঁশী দিয়ে।

৪।। বারুদ-বিস্ফোরণ ইত্যাদি

যুদ্ধ :

যুদ্ধ ইত্যাদির জন্য আবহ-সংগীতের মত যে ছেদহীন শব্দ-প্রবাহ দরকার, তার জন্য বাজারের প্রচলিত রেকর্ড ব্যবহার করাই ভাল। তবে যদি রেকর্ড ইত্যাদি সংগ্রহ করা না যায় তবে শব্দ শিল্পীকে যুদ্ধের শব্দ প্রত্যক্ষভাবে সৃষ্টি করতেই হয় আর এক্ষেত্রে তিনি তাঁর শিল্পী সত্তার উদ্ভাবনী শক্তিকে ষোল আনা কাজে লাগাবার সুযোগ পান।

যুদ্ধের শব্দের মধ্যে বহু একত্রে সংমিশ্রিত হয়। শব্দ-শিল্পী নাটকের যুগ কাল ও পরিবেশ অনুযায়ী ব্যবহৃত অস্ত্রাদি এবং তার ফল অনুমান করে এই শব্দ-সমবায় গঠন করেন।

অনেক সময় ফাঁকে ফাঁকে কথা থাকে। এসব ক্ষেত্রে রেকর্ড করা শব্দের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথা সুপার-ইমপোজ করে টেপরেকর্ডারে ধরে নেওয়াই ভাল।

গোলাগুলি ও বিস্ফোরণ :

এই একটি শিরোনাম দিয়ে আমরা অনেক কিছুকে একত্রে বোঝাতে চাইছি। মাইন, মর্টার, শেল, গ্রেনেড, বোমা এমন কি ডিনামাইট বা গান-কটনের শব্দকেও এরই মধ্যে ধরা হয়েছে। এতগুলিকে একত্রে ধরবার কারণ এই যে, এগুলি নাটকে প্রায় একই রকমভাবে সৃষ্টি করা হয়।

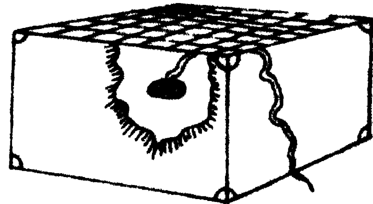
এই সমস্ত শব্দকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। কতকগুলি ঘটে খুবই কাছে, কতকগুলি দূরে। দূরের শব্দ সৃষ্টি খুবই সহজ একটা বেস্ ড্রাম-এর চামড়ার টান একটু ঢিল করে দিয়ে মৃদু আঘাত করলেই দূর থেকে ভেসে আসা কামানের শব্দ বলে মনে হবে। বেস্ ড্রাম না পাওয়া গেলে একটা খালি চায়ে পেটি দিয়েও এ কাজ চলবে।

তবে কাছের শব্দ হ'লে ড্রাম বা চায়ের পেটিতে কাজ দেবেনা। তখন বিদ্যুত-প্রবাহে জ্বালাবার এক ধরনের পটকা কিনতে পাওয়া যায়, তাই ব্যবহার করতে হবে। এ পটকা নানা আকারের হয়। ঠিক কি ধরনের শব্দ প্রয়োজন তা জানালে দোকানীই উপযুক্ত পটকা নির্বাচন করে দেবেন। এই পটকা ফাটাবার ব্যবস্থা হবে হয় সরাসরি বিদ্যুৎ-প্রবাহ থেকে নয় তো ৪ ভোল্টের ব্যাটারী থেকে।

নিরাপত্তার জন্য কতকগুলি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। এই পটকাগুলো মঞ্চের বাইরে কোথাও মোটা সিটের তৈরী ড্রামের মধ্যে ফাটাবার ব্যবস্থা করতে হবে। এর মুখে রাখতে হবে জালের তৈরী একটা

ঢাকনি, কখনই টিনের ডাকনি নয়। বিস্ফোরক শব্দ বাতাসে যে প্রবল চাপের সৃষ্টি করে তার শক্তি বড় কম নয়। সে শক্তিতে ড্রামের ঢাকনি খুলে গিয়ে ভিন্নতর বিপদ ঘটাতে পারে। যে সারকিটে সঙ্গে পটকাগুলো যুক্ত থাকবে তাতে ১০ অ্যাম্পেয়ার ফিউজ থাকা দরকার। এই পটকা যেখানে ফাটান হবে তার কাছে কেউ থাকবেন না। সম্ভব হলে এর জন্য একটা মঞ্চ সংলগ্ন পৃথক ঘর ব্যবহার করতে হবে।

খরচ বাঁচিয়ে শুধুমাত্র অভিনয়ের দিন পটকা না ফাটিয়ে মহড়া থেকেই এই অভ্যাস করা দরকার।



চিত্র।। বিস্ফোরণ শব্দ সৃষ্টিতে সতর্কতা।

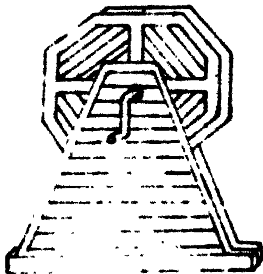
ফাঁকা কার্তুজ ভরে সট-গান যদি কোন জলের ট্যাঙ্কের মধ্যে ফাটা যায় তবে কাছের বোমাদি বিস্ফোরণের শব্দের সার্থক অনুকরণ হয়। জলের ট্যাঙ্কের ভিতরে শব্দটা ধ্বনি-প্রতিধ্বনি মিলিয়ে আরও তীব্র হয়ে ওঠে। এ পদ্ধতি নিরাপদও বটে। তবে ফাঁকা কার্তুজ প্রায়ই শব্দ করে না। এ জন্য দুই ব্যারেলে তো কার্তুজ বোঝাই করতেই হবে, পাশে আরও একটা সট-গান প্রস্তুত করে রাখা উচিত। সবধানে পটকাও ট্যাঙ্কের মধ্যে ফাটান যেতে পারে, তবে এর একমাত্র অসুবিধা এই যে ঐ পটকায় সঠিক মুহূর্ততে শব্দ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না—একটু আগে পরে হবেই।

বিস্ফোরণের শব্দের সহগ আরও অনেক শব্দ ও ক্রিয়া বিস্ফোরণের বিভ্রমকে আরও নিখুত ও জীবন্ত করে তোলে। দেওয়ালের ভাঙ্গা টুকরো জানালা দরজায় ছিটকে লাগতে পারে, হঠাৎ হাওয়ার দাপটে দরজা জানালা খুলে যেতে পারে বা বন্ধ হতে পারে।

কাছের বিস্ফোরণের ফলে অন্য ঘরবাড়ি দুদ্দাড় শব্দে ভেঙ্গে পড়ছে এ শব্দ সংযোগ করা যেতে পারে। এজন্য একটা যন্ত্র ব্যবহার করা যায়। ইংরাজীতে তার নাম Avalanche Machine বাঙলায় একে বলা যেতে পারে ধ্বস-নামানো শব্দসৃষ্টির যন্ত্র।

ধ্বস-নামানো শব্দ-যন্ত্র প্রকৃত পক্ষে একটা আট কোনা কাঠের শক্ত বাক্স। এটা একটা স্ট্যাণ্ডের ওপর দাঁড় করান থাকে আর এটাকে ঘোরাবার ব্যবস্থা থাকে। এখন এই বাক্সটি খুলবার একটা দরজা আছে। এই দরজা দিয়ে বাক্সের ভিতরে বেশ বড় বড় ইট পাথর ফেলে দেওয়া হয় (আয়তনের সিকিভাগের

চেয়ে বেশি)। এবার যন্ত্রটা ঘোরালে ইট পাথরগুলো একে অন্যের সঙ্গে সংঘর্ষে এবং বাক্সের গায়ে আঘাত হেনে যে শব্দ সৃষ্টি করে তাকে বাড়ি ধ্বসে পড়া, পাহাড়ে ধ্বস নামা ইত্যাদি ক্রিয়ার শব্দ বলে বিভ্রম সৃষ্টি করান যায়।



বিস্ফোরণের সময় শেল ইত্যাদির ছুটে যাওয়ায় নানা রকম শব্দ হয়। কখনও হুইসিলের মত, কখনও 'বোঁও ও' গোছের। এ সব শব্দও এর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

কামানের শব্দ :

কামানের শব্দ তৈরী করবার জন্য মূলতঃ পূর্ব-বর্ণিত পদ্ধতিগুলির মধ্যে যে কোনটি ব্যবহার করা হয়। এরও দূর ও নিকটের শব্দের পার্থক্য আছে।

বন্দুকের শব্দ :

বন্দুকের শব্দের জন্য সাধারণতঃ ফাঁকা কর্তুজ ব্যবহার করা হয়।

এতে সুবিধা এই যে গুলির সঙ্গে পিস্তলের নল দিয়ে ধোঁয়াও বার হতে দেখা যায়। কিন্তু অসুবিধা এই যে অনেক সময় প্রয়োজনের খাতিরে অভিনেতারা এত কাছে থাকবেন যে ফাঁকা-কার্তুজ ব্যবহারও তখন নিরাপদ নয় অথবা এমনও তো হতে পারে যে, যে যুগের কাহিনী বর্ণনা করা হচ্ছে তখন পিস্তলে কার্তুজ ব্যবহারই হ'তনা। এ সব কারণে মঞ্চে অভিনেতাকে ডামি পিস্তল দিয়ে নেপথ্যে শব্দ-শিল্পীকেই শব্দ সংযোগ করতে দেওয়া ভাল। তিনিও যদি ফাঁকা কার্তুজ ব্যবহার করেন তবে অবশ্যই বিকল্প ব্যবস্থা রাখবেন কেন না ফাঁকা কার্তুজ প্রায়ই শব্দ করে না।

পিস্তলের শব্দ অন্যভাবেও তৈরী করা যায়। কোন শক্ত কুশনের ওপর বেত দিয়ে জোরাল আঘাত করলে ঐ শব্দ পাওয়া যায়। প্লাইউড বা টানটান করে রাখা ক্যানভাসের ওপর বেতের আঘাতেরও ঐ শব্দ পাওয়া যায়।

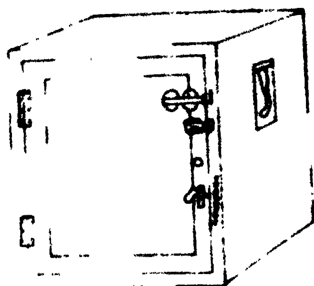
অনেক দূরের পিস্তলের আওয়াজ শোনাতে গেলে একটা টিনের ওপর লাঠি দিয়ে মৃদু আঘাত করা যেতে পারে। টিনের কম্পনের ফলে পারিপার্শ্বিকের ভিন্নতর শব্দের আভাস আসবে। প্লাইউডের পর আঘাত করলে আরও দূরান্বিত শব্দের আভাস দেওয়া যায়।

৪ বিবিধ শব্দ

ঘরের দরজা সংক্রান্ত শব্দ :

দরজায় কড়া নাড়া, দরজা খোলা বন্ধ বা আধুনিক লকিং, ছিটকানি খোলা বা লাগানর শব্দ ইত্যাদি দরজা সংক্রান্ত নানা রকম শব্দ নাটকে বিশেষ

প্রয়োজন হয়। এ জন্য সাধারণভাবে মঞ্চের কাছাকাছি একটা দরজায় এ সব শব্দ তৈরী করা যেতে পারে। কিন্তু সব সময়ে মঞ্চের পাশে যে এমন ঘর দরজা থাকবে এমন তো কথা নেই। এ জন্য বিকল্প ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়।



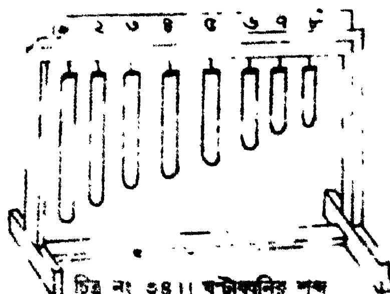
চিত্র।। দরজা সংক্রান্ত শব্দ সৃষ্টির যন্ত্র।

এ জন্য একটা ছোট যন্ত্র তৈরী করে নেওয়াই ভাল। যন্ত্রটি আর কিছু নয়—একটি কাঠের বাক্স। এই বাক্স প্লাইউড দিয়ে তৈরী না করাই ভাল। বিশেষ করে দরজাটি হবে শক্ত কাঠের তৈরী। বাক্সটির আয়তন কমপক্ষে (৩'× ২'× ১') হওয়া উচিত। এর দরজায় কব্জা, কড়া, হাতল, রিম্‌লক সবই লাগান থাকবে। ফলে দরজা সংক্রান্ত সব শব্দই নিখুঁত ভাবে পাওয়া যাবে। বাক্সটি রেজনেন্স বক্সের কাজ করে শব্দটাকে ব্যবহার করবার মত শক্তিশালী করে দেবে।

নানা রকম ঘণ্টাধ্বনি, চার্চ বেল ইত্যাদি :

নাটকে নানা রকম কাজে ঘণ্টা-ধ্বনি প্রয়েজন হয়। আমাদের দেশের নাটকে চার্চবেলে-এর প্রয়োজন তত বেশি নেই। ইউরোপের নাটকে চার্চ বেলের প্রয়োজন খুবই। তবে আধুনিক কালে বাঙলা নাটকেও নানা মুড সৃষ্টিতে চার্চ-বেল ব্যবহার করা হচ্ছে।

ঘড়ির শব্দ আর চার্চের শব্দায়মান ঘণ্টার শব্দ তৈরীর পদ্ধতি একই। এ জন্য একটা চৌকো ফ্রেম স্ট্যাণ্ডের ওপর দাঁড় করাবার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এই ফ্রেমের ওপরের বাহু থেকে ক্রমান্বয়ে ছোট হয়ে যাওয়া আটটা ধাতব



চিত্র নং ৩৪।। ঘন্টাধ্বনির শব্দ

নল ঝুলিয়ে দেওয়ায় ব্যবস্থা করা হয়। এই ধাতব নল ব্রাসের হলেও চলবে।

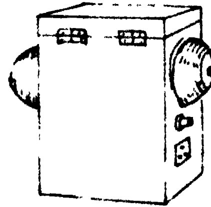
ইলেকট্রনিকের দোকান, লোহা লক্কড়ের দোকান বা পেতলের দোকান থেকে এই নল পাওয়া যেতে পারে।

এক একটা নলের দৈর্ঘ্য কত বড় হবে তা পরীক্ষা করে বের করে নিতে হবে। যত বড় হবে নল, তার কম্পনাঙ্ক হবে তত কম, যত ছোট হবে কম্পনাঙ্ক হবে তত বেশী। নলগুলোর এক প্রান্তের আধ ইঞ্চি নীচে একটু সরু ফুটো করে নিতে হবে। ঐ ফুটোর ভিতর দিয়ে সুতো ঢুকিয়ে নলগুলোকে ক্রম অনুসারে ঝুলিয়ে দিতে হবে। নিয়ন্ত্রণের সুবিধার জন্য ওপরে একটা টিনের পাত বা কাঠের ফলক মেরে তাতে ক্রমিক সংখ্যা লিখে রাখতে হবে যাতে শব্দ-শিল্পী নির্দিষ্ট ক্রম অনুযায়ী আঘাত করতে পারেন। একটা কাঠের দণ্ডের গায়ে নরম প্যাড লাগিয়ে তা দিয়ে আঘাত করে শব্দ তোলা যাবে।

আজকাল ছোটদের খেলনার জন্য বাজারে এ জাতীয় বাজনা কিনতে পাওয়া যায়। দামেও সস্তা। ঐ খেলনা সংগ্রহ করে সহজে কাজ চালান যেতে পারে।

টেলিফোনের শব্দ :

আধুনিক নাটকে টেলিফোনের শব্দ খুবই দরকার হয়। টেলিফোনের শব্দ এবং কলিংবেলের শব্দের মধ্যে নাটকে খুব একটা পার্থক্য করা হয় না। আজকাল স্প্রিং-এর ঘন্টি পাওয়া যায় তা দিয়ে সহজে কাজ চালান যেতে পারে। আরও নিখুঁত করবার জন্য একটা বেল-বাক্স তৈরী করা হয়।



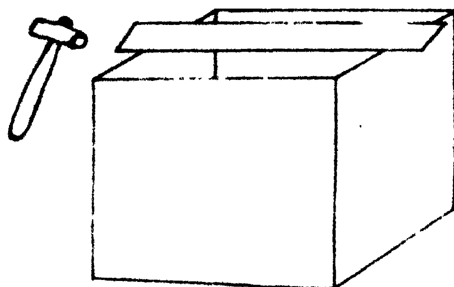
চিত্র।। টেলিফোন, কলিংবেল-এর শব্দের ব্যবস্থা

বেল বাক্স মস্ত বড় নয়। এর ভিতরে ব্যাটারী রাখবার ব্যবস্থা থাকে আর দুপাশে লাগান থাক দুটি বেল। দুটি বেল লাগাবার কারণ, যদি একটি বেল কোন কারণে না বাজে তবে দ্বিতীয়টি ব্যবহার করা যাবে। বাক্সের গায়েই পুস থাকে। সেটি ঠেলেও বাজান যেতে পারে আবার এমন ব্যবস্থা করা যায় যাতে তার লাগিয়ে পুসটাকে অনেক দূরে নিয়ে যাওয়া যায়।

বাক্সটি এখানে রেজোনন্সের কাজ করে। এর ফলে স্প্রিং ঘন্টার চেয়ে এতে শব্দটা আরও নিখুঁত হয়।

কাঁচ ভাঙার শব্দ :

বিস্ফোরণের ধাক্কায় কাঁচ ভাঙ্গে। আতঙ্ক বিভীষিকা ইত্যাদির প্রতিক্রিয়া দেখাতে হাতের কাপ-ডিস ফেলে ভেঙ্গে ফেলা হয়। নেপথ্যে কাঁচ ভাঙ্গার নানা শব্দও প্রয়োজন হয়। এ জন্য নিত্য কাঁচ ভাঙ্গার দরকার নেই। খুব সহজেই এ শব্দ তৈরী করা যায়।



চিত্র।। কাঁচ ভাঙ্গার শব্দ।

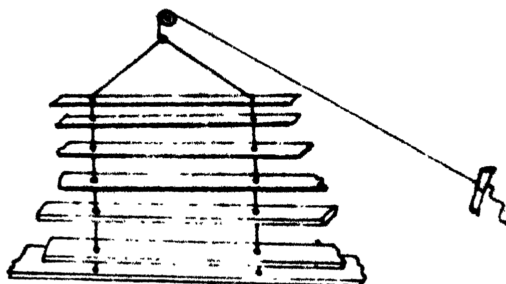
অনেক কাঁচ এক সঙ্গে ঝন্ ঝন শব্দে পড়ে যাচ্ছে বোঝাতে একটা কাগজের বাক্স বা ঝুড়ি থেকে আর একটা ঝুড়ি যা বাক্সে কতকগুলো টুক্‌রো কাঁচ ফেলে দিয়ে শব্দ সৃষ্টি করা যায়। অল্প দু-একটা কাঁচ ভাঙ্গছে বোঝাতে অল্প কাঁচ নিয়ে ঐ একই প্রক্রিয়া করা যেতে পারে। কয়েক টুক্‌রো স্টিলের(ছয় বর্গ ইঞ্চির মত মাপের) পাত শক্ত মেঝের ওপরে ফেলেও ঐ শব্দ পাওয়া যায়।

একটা সাধারণ কাঠের বাক্সে ভেতরটা প্যাড দিয়ে মুড়ে ওপরে এক টুক্‌রো কাঁচ রেখে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করলেও কাঁচ ভাঙ্গার ঝন্‌ঝন্ আওয়াজ পাওয়া যায়।

গাছকাটা বা কাঠে কাঠে ধাক্কা লাগানর শব্দ :

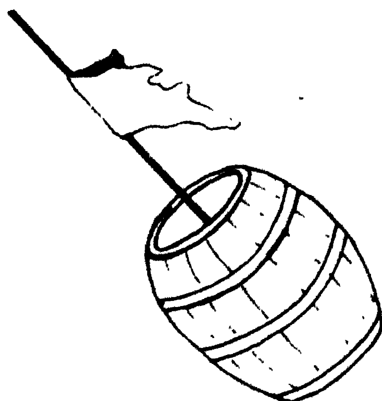
এ শব্দ তৈরী করাও খুবই সহজ। ছ' সাত টুক্‌রো (২' × ৬" × ১") কাঠ সংগ্রহ করে প্রত্যেক কাঠের দুই প্রান্তে একটা করে ফুটো করা হবে। ফুটোর ভিতর দিয়ে একটা করে কাঠ পরাতে হবে আর একটা করে গিঁট দিতে হবে। প্রত্যেক গিঁট পরের গিঁট থেকে অন্তত হাতখানেক তফাতে থাকবে। এইভাবে সবকটা কাঠ গাঁথা হয়ে গেলে দড়ি দুটো একটু ঢিল করে একত্রে গিঁট দিতে হবে। এই দড়িটা একটা পুলির ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে এনে কোথাও বেঁধে রাখতে হবে। যখন প্রয়োজন তার আগে খুলে হাতে ধরে রাখতে হবে সময় এলে এমনভাবে সুতোয় ঢিল দিতে হবে যাতে একের পর একটা কাঠ গিয়ে মেঝেতে সশব্দে আঘাত করে। এর ফলে যে শব্দ উঠবে তাই

বাঞ্ছিত এফেক্ট তৈরী করবে। অপেক্ষাকৃত ছোট এবং মোটা কাঠের টুকরো নিলে, একটা ফুটো এবং একটা দড়িতেও কাজ হবে।



চিত্র।। কাঠে আঘাত লাগা, গাছকাটা ইত্যাদি শব্দের যন্ত্র।

এ জাতীয় কত শব্দ যে প্রতি মুহূর্তে আমাদের নানা কাজ থেকে ফুটে উঠছে তার হিসাবনিকাশ নেই। দরজা খুলতে গিয়ে এমন শব্দ হয়, যন্ত্র খুলে এমন শব্দ পাওয়া যায়, চেয়ার টানলে এ জাতীয় শব্দ ওঠে, কোন কিছু ঘষটে টানলে একই শব্দ হয়। গরুর গাড়ির চাকা, ঘানি ইত্যাদি থেকে এরকম শব্দ ওঠে। আরও অজস্র উদাহরণের উল্লেখ করা যেতে পারে।



চিত্র।। না রকম ক্যাঁচকোঁচ শব্দ তৈরীর যন্ত্র।

এই কারণে শব্দ-শিল্পী এই যন্ত্রটি হাতের কাছে মজুত রাখবেন। এটি ঢাকের মত একটি কাঠের ড্রাম। এর এক মুখে আঁটা থাকবে পাতলা থ্রি প্লাই কাঠ। এই কাঠের মাঝখানে একটা ফুটো করে তার ভিতর দিয়ে একটা শক্ত সুতো বা ব্যাডমিনটন খেলার র‍্যাকেটের স্টিং পরিয়ে দিতে হবে। ব্যাপারটা হবে অনেকটা একতারার মত। এই সুতো বা স্ট্রিং-এর গায়ে বেশ রজন ঘষে

খরখরে করে রাখতে হবে। এবার একটা পাতলা চামড়া দিয়ে ঐ সূতোর ওপরে ঘষলে টানলে নানা রকম আওয়াজ পাওয়া যাবে। সূতোর টান এবং ঘষার কৌশলে এ যন্ত্রে নানা প্রয়োজনীয় শব্দ তৈরী করা যায়। প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার এই যন্ত্রে 'বাঘের ডাক'ও তোলা যেতে পারে।

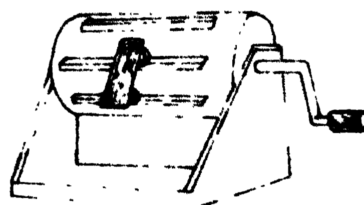
একটা বাঁশের ভাল বাকারি আধ-ভাঙা করে মুচড়ে মুচড়েও নানা রকম কঁাচ কোচ আওয়াজ করা যায়। বাংলা দেশের গ্রামাঞ্চলের এক শব্দ শিল্পীকে অতি নগণ্য বস্তুতে এক অসাধারণ ফলপ্রসূ শব্দযন্ত্র তৈরী করতে দেখেছিলাম। তিনি বেশ মোটা একটা বাঁশে বাকারি চৌকোণা করে কেটেছিলেন। ওটা লম্বায় ছিল হাত খানেক। তলার দিকে খানিকটা ছিল হাতলের জন্য গোল। চৌকো জায়গাটিতে আর একটা বাকারি তিনি নারকেলের কাতা দিয়ে বেঁধেছিলেন। এই বাঁধার জায়গাটি ছিল তেল দিয়ে ভেজান। তিনি হাতল ধরে ওপরের বাঁধা বাকারীটা চরকির মত ঘুরিয়ে গরুর গাড়ির ক্যাঁচ কোচ, বাঁশের বেড়ার গেট খুলবার শব্দ, বাঁশের সাঁকো দিয়ে পারাপার হবার শব্দ নৌকোর দাঁড় টানবার সময়ে নৌকো আর দাঁড়ের ঘষাঘষির শব্দ ইত্যাদি কত কি শব্দই না তৈরী করলেন। সেই শব্দ-শিল্পীর উদ্ভাবনী দক্ষতায় মুগ্ধ হয়েছিলাম।

রেলগাড়ীর শব্দ :

ট্রেনের এফেক্টের বহু রেকর্ড বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। কিন্তু আগেই বলেছি, বাজারে রেকর্ড অনেক সময়েই নাট্য-মুহূর্তের প্রয়োজন মত হয় না। হয়ত' নাটকে ট্রেন স্টেশনে ঢোকা এবং ছেড়ে যাওয়ার মধ্যে যে নাট্য-ক্রিয়া আছে তার জন্য ৫ মিনিট সময় দরকার কিন্তু রেকর্ডে আছে মিনিট খানেক। এমন হ'লে মাঝে হুকার ইত্যাদির শব্দকে বাড়িয়ে পাঁচ মিনিট সময় পূরণ করে নিতে হবে। এ জন্য অন্ততঃ দুটি রেকর্ড প্রয়োজন হবে। প্রথম রেকর্ডটিতে ঐ শব্দ শেষ হবার আগেই দ্বিতীয়টি চালিয়ে নিতে হবে। এ্যাম্প্লিফায়ারের একই মুহূর্তে প্রথমটি বন্ধ দ্বিতীয়টি চালাতে হবে। এভাবে আগে থেকেই সম্পাদিত শব্দ টেপ রেকর্ডার দিয়ে তুলে রাখা যেতে পারে।

অনেক সময়ে গোটা এফেক্টটাই জীবন্ত সৃষ্টি করা যেতে পারে। অবশ্য সমস্ত ব্যাপারটা বড়ই জটিল। এক সঙ্গে বহুবিধ শব্দ সৃষ্টি ও সমন্বিত করা দরকার ; দরকার একটা সুগঠিত ভাল-নেপথ্য দল। নেপথ্য দলের নেতা বাস্তব পরিবেশ থেকে বা অনুরূপ রেকর্ড থেকে প্রথমে শব্দকে বিশ্লেষণ করে নেবেন। তাঁকে প্রয়েজনীয় শব্দের স্বরূপটি সুন্দর ভাবে বুঝে নিতে হবে। মালগাড়ী এবং যাত্রীগাড়ীর শব্দের মধ্যে পার্থক্য আছে। গতির কমাবাড়ার ফলেও পার্থক্য সৃষ্টি হয়। পরিবেশগত পার্থক্যও কম নয়। ফাঁকা মাঠে একরকম শব্দ হয়, ব্রীজ পার হওয়ার সময় শব্দ হয় ভিন্ন রকম ; ট্রেন যখন সজোরে এক স্টেশনে না থেমে পার হয়ে যায়, তখন হয় এক রকম শব্দ আর যখন

স্টেশনে থামে তখন হয় অন্যরকম। অতএব দলনেতা ট্রেনের পরিবেশ-গতি ইত্যাদি বিচার করে প্রয়োজনীয় শব্দ পরিকল্পনা করে নেবেন পূর্বাহ্নেই।



চিত্র ।। রেলগাড়ির শব্দ তৈরীর যন্ত্র

ট্রেনের মূল শব্দ সৃষ্টির জন্য একটা যন্ত্র তৈরি করা যেতে পারে। এটি মূলতঃ একটি কাঠের তৈরী ড্রাম। এই ড্রাম-এর দুই মুখের ঠিক মাঝখানে দুটি দণ্ড লাগিয়ে ধুরোর ব্যবস্থা করা হয়। ঐ ধুরো বসিয়ে দেওয়া হয় একটা দাঁড়ার ওপর। ধুরোর সঙ্গেই হ্যাণ্ডেল লাগান থাকে। ফলে ড্রামটিকে ইচ্ছেমত ঘোরান যায়।

এখন এই ড্রামটার ওপরে একটা ধাতব-চাদর জড়ান থাকে। এই চাদরটার দু জায়গায় প্রায় একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ইঞ্চি খানেক চওড়া দুটো জায়গা কেটে রাখা হয় অথবা দু জায়গায় দুটি কাঠের বাতা মেরে রাখা হয়। এবার ট্রেন যাওয়ার শব্দের জন্য একদিকে ঘোরাতে হবে এই ড্রামটা আর সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর চেপে ধরতে হবে একটা ছোট্ট দু-চাকা-ওয়ালা গাড়ি। ইউরোপীয় নাট্যশালায় আর গাড়ি তৈরী করে না। ব্যবহার করে একটা স্কী জুতো। এর ফলে চাকা ঘুরবার গরগর শব্দটি সুন্দর পাওয়া যায়। ড্রাম ঘোরার ফলে এমন একটা যান্ত্রিক শব্দ ওঠে যা চাকা ঘোরার অনুগ ধ্বনি। গাড়ির চাকা যখন কাঠের বাতায় বা ধাতব পাতে কাটা খাদে বাধা পেয়ে আবার সহজ পথ পায় তার ফলে যে ঘট-ঘট শব্দ সৃষ্টি হয় তা লাইনের জোড় পার হওয়ার শব্দের অনুরূপ।

আর এক রকম ভাবে গাড়ীচালাবার শব্দ তৈরী করা যায়। এ জন্য মেঝের ওপর ইঞ্চিখানেক চওড়া ও প্রয়োজন মত লম্বা আধ ইঞ্চি উঁচু কয়েকটা কাঠের বাতা পেরেক দিয়ে এঁটে রাখতে হয়। এই পথে চালাতে হয় বাগান তৈরীর রোলার।

ট্রেনের হুইসিলের অনুকরণ করবার উপযুক্ত বাঁশী কিনতে পাওয়া যায়। বোতলের মুখে ফুঁ দিলেও ঐ রকম আওয়াজ হয়। প্রয়োজনে বোতলের

ভেতরে আংশিক জল ভরে শব্দের ঘোষতা কমিয়ে বাড়িয়ে উপযুক্ত শব্দ তৈরী করে নেওয়া যায়। অর্গান-পাইপ থেকেও ঐ শব্দ পাওয়া যায়।

ইঞ্জিনের বায়ু বের হবার ঘীস্ ঘীস্ আওয়াজ তৈরী করাও কঠিন ব্যাপার নয়। দুটো শিরীষ কাগজ পাশাপাশি ঘষলেই এ শব্দ পাওয়া যায়। কার্ডবোর্ডের বাক্সে শুকনো মটর দানা বা চাল ভরে ছন্দ-মাফিক ঝাঁকালেও একই ফল পাওয়া যাবে। মনে রাখতে হবে ট্রেনের গতি যত বাড়ে এই শব্দও তত দ্রুত হয়ে অবশেষে একটা একটানা শব্দে পরিণত হয়।

এখন, আগেই বলেছি এই শব্দসৃষ্টি করতে একটা গোটা দল সমবেত ভাবে কাজ করা দরকার। এতগুলি শব্দ একত্রে এবং পর্যায়ক্রমে সংযুক্ত করতে তৎপর নেতা এবং কর্তব্য-সচেতন সহযোগী প্রয়োজন।

কোন স্টেশনের সামনে দিয়ে যখন গাড়ি চলে যায় এবং স্টেশনে গাড়ি না থামে, তখন স্টেশনে দাঁড়িয়ে গাড়ির যে শব্দ শোনা যায়, তা ভিন্ন রকম। তখন যে গম্ গমে ভাবটা আসে ঠিক তা তৈরী সম্ভব না হলেও তার আভাস আনা যায়। ঐ শব্দগুলি যদি একটা (বা কয়েকটা) খালি বিস্কুটের টিনের সামনে বা বজ্রচাদরের সামনে করা যায় তা হ'লেই ঐ গম-গমে ভাব অনেকটা সৃষ্টি হয়।

উড়োজাহাজ ঃ

উড়োজাহাজের নানা অবস্থার নানা রকমের শব্দের রেকর্ড কিনতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে সমস্ত রকম উড়ো জাহাজের সবরকম শব্দ পাওয়ার জন্য স্ট্যাণ্ডার্ড ইলেকট্রিককাল এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী একটা যন্ত্র তৈরী করেছেন। আমাদের দেশে এ সব নেই। তবে আমাদের দেশে গ্রামে গঞ্জে শহরে বহু মানুষ মুখে এ সব শব্দ তৈরী করতে পারেন। এক টুকরো কাগজ এবং একটা চিরুণী এ শব্দ সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

টেপরেকর্ডারের ভূমিকা ও ব্যবহার ঃ

নাটকে শব্দ প্রয়োগের জন্য সংরক্ষিত শব্দের ক্ষেত্রে টেপরেকর্ডারের বিরাট ভূমিকা আছে, বলাই বাহুল্য। যে রেকর্ডিং যন্ত্রে শব্দ সংরক্ষিত হবে তার শক্তি মান, যে ফিতে ব্যবহার হবে তার গুণগত মান ও ধারণ ক্ষমতা, এইগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়তঃ রেকর্ডিং যে স্থানে করা হবে তাকে অবাঞ্ছিত শব্দ থেকে মুক্ত রাখাও খুব জরুরী। তৃতীয়তঃ মনে রাখতে হবে টেপরেকর্ডারের ভলিউম নিয়ন্ত্রণ এবং যন্ত্রটিকে শব্দের উৎসের কাছে বা দূরে সংস্থাপন দিয়ে শব্দমায়া সৃষ্টিতে নানা বৈচিত্র্য ও বাঞ্ছিত এফেক্ট তৈরী করা যায়। এর জন্য শব্দযন্ত্রীকে টেপরেকর্ডারের ব্যবহার বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ হতে হবে।

টেপরেকর্ডারে গৃহীত শব্দ প্রেক্ষাগৃহে শোনাতে গেলে এ্যামপ্লিপায়ার ও লাউডস্পীকার প্রয়োজন। এদের গুণগত মান যেন সৃষ্ট শব্দের মানকে প্রভাবিত না করে এ বিষয়ে শব্দযন্ত্রী যেমন নজর রাখবেন তেমনি এদের প্রয়োগবিধিও শব্দযন্ত্রীর জানা দরকার। তা না হলে সৃষ্ট শব্দ-মায়া যোগ্য ফল উৎপাদন করতে পারবে না।

৮

শব্দসংযোজন সংকেতলিপি

শ্রুতিনাটকে শব্দসংযোজনের নানা দিক সম্পর্কে আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি। কিন্তু ঐ সব রীতি নীতিতে সৃষ্ট শব্দপরিকল্পনা ও সংযোজন চিন্তা যদি এক সংকেত লিপিতে লিপিবদ্ধ না করে নেওয়া হয়, তা হলে অনেক পরিকল্পনাই এলোমেলো হয়ে যায়। সবটা মাথায় রেখে কাজকরা সহজ নয়। সংকেতলিপি একারণে শব্দ সংযোজকের শুধু পথপ্রদর্শকই নয়—অনিবার্য সহায়ক।

আবার সংকেতলিপি তৈরী করা অর্থই মানসিক পরিকল্পনাকে একটা লিখিত রূপ দেওয়া। আর লিখিত রূপ চোখের সামনে থাকলে নিজ পরিকল্পনারও সমালোচনা করে নানা ত্রুটি ও অপূর্ণতা ধরা যায় আর তাই অনায়াসেই অনুষ্ঠানের আগে এই পরিকল্পনা সংশোধন করা যেতে পারে। দেখা যায় অনেক সময় তিন/চার বাব সংশোধন করেও চুরান্ত সংকেতলিপি প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।

সংকেতলিপি প্রস্তুতির আগে শব্দশিল্পী অবশ্যই নাটক ভাল করে পড়বেন এবং নাটক সম্পর্কে নোট নেবেন। দৃশ্য সংখ্যা অনুসারে নাট্যঘটনার স্থান, কাল, নাটকে শব্দ সংকেতের জন্য নাট্যকার প্রযুক্ত নির্দ্দেশ এবং নাটকের বিভিন্ন অংশের ভাব সম্পর্কে শব্দশিল্পীর ধারণা লিখে নেবেন। এর পরেই পরিচালকের সঙ্গে শব্দ-শিল্পীর প্রথম আলোচনা বৈঠক হবে। উভয়ে নাটক উপস্থাপনার লক্ষ্য ও উপস্থাপন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মতামত বিনিময় করে একটা ঐক্য মতে পৌছাবেন। সে অনুসারে গোটা নাটকের শব্দ সংযোজনের একটা সামগ্রিক ছক তৈরী করে বসবেন দ্বিতীয় বৈঠক।

এই বৈঠকে শব্দশিল্পী কিভাবে নাট্যঘটনার স্থান কালের শব্দ সংকেত আনছেন, কেমন করে লেখকের নির্দ্দেশকে বিশদ শব্দ রূপ দিচ্ছেন, কেমন করেই বা ভাবাত্মক বা অন্যতর শব্দসংযোজন করে পূর্ণ ও জীবন্ত করে তুলতে চাইছেন নাটক—তা বিশদভাবে বলবেন পরিচাককে। পূর্ব আলোচনায় ঐকমত প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকলে এ সময়ে সাধারণতঃ খুব একটা মত পার্থক্য ঘটে না। তবে যদি মতপার্থক্য ঘটে, তবে দুজনেই কেন অপরেরটা পছন্দ করছেন না এবং কেন তারটাকে সমর্থন করছেন তা বিশদভাবে বলবেন। মনে

রাখবেন, এখানে নিজেকে অভ্রান্ত প্রমাণের জেদের বদলে নাট্যরসের নিটোলতা সম্পাদনে কোন মত বেশি কার্যকর তা নির্দ্ধারণে উভয়ের আগ্রহ থাকলে অনায়াসে মিটে যায় বিরোধ। তাতে যদি বিরোধ না মেটে তবে অবশ্যই শব্দশিল্পীকে পরিচালকের মত মেনে নিতে হবে। দৃশ্যান্তর ধ্বনি সম্পর্কেও এখানেই পরিকল্পনা করে নিতে হবে। এরপরই শব্দসংযোজক শব্দসংগ্রহ শুরু করতে পারেন। মনে রাখবেন শব্দ-সংগ্রহ খুব সহজ ব্যাপার নয়।

অভিনেতা-অভিনেত্রীরা যতই প্রস্তুত হতে থাকবেন, ততই আমরা নাট্যঘটনার উপস্থাপনার সময় সম্পর্কে অবধারণা করতে পারব। এ সময়ে একেবারে স্টপওয়াচে সময়ের মাপ নেবেন। এই মাপ স্পষ্ট ও প্রায় নিখুঁত না হলে শব্দসংযোজন পরিকল্পনা শেষ করা যায় না। অর্থাৎ এই সময়েই শব্দ-শিল্পী ঠিক কোথায়, কতখানি দীর্ঘ বা কত স্বল্প সময়ের জন্য কোন মাত্রার শব্দ প্রয়োগ করবেন, তার চূড়ান্ত ছক প্রস্তুতির দিকে এগুতে পারবেন। এবার আমরা লিপি প্রস্তুতির প্রত্যক্ষ কাজে লিপ্ত হতে পারি।

সংকেতলিপির প্রথমেই নাটক ও নাট্যদল সম্পর্কে তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করে রাখতে হয়। নাটকের নাম, নাট্যকার, নাট্যসংস্থার নাম, নাটকটি কত অঙ্ক কত দৃশ্যের, মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা এবং ঐদল নাটকটি অভিনয় করতে কত সময় নিয়েছিল, তা এই অংশে লিখে রাখতে হয়। এ অংশ দলিলের কাজ করে। শব্দশিল্পী এই সংকেতলিপি অবশ্য সঞ্চয় করে রাখবেন। নাটকের নাম ও নাট্যকারের নামে মূলনাটকের পরিচয় পাওয়া যায়। নাট্য সংস্থার নাম দ্বারা শিল্পায়নের পরিচয় পাই। বহু বৎসর পর ঐ সংস্থা ঐ নাটক মঞ্চায়নের উদ্যোগ নিতে পারে। তখন এই লিপিই তাদের পুরোনো প্রডাক্সনের স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেবে। একই নাটক একই সংস্থা পরিচালক পরিবর্তন করিয়ে মঞ্চস্থ করবার আয়োজন করলেও এ লিপি কাজে লাগে। নতুন পরিচালক এটি বিশ্লেষণ করে নিজ রীতি নির্দ্ধারণ করতে পারেন। একই শব্দশিল্পী ঐ নাটকই অন্য প্রতিষ্ঠান মারফৎ করালে, যেখানে অবশ্য ভিন্নরীতি প্রয়োগ করবেন। এসব কাজে পুরোণ সংকেতলিপি একদিকে যেমন প্রথমেই নাটকটির আদল এনে দেয়, তেমনি পরিবর্তনের সহায়ক হয়। আর, একই সংস্থা একইভাবে বহুবার অভিনয় করতে থাকলে সংকেতলিপি হয় সমতারক্ষার চাবিকাঠি।

শব্দশিল্পী ইচ্ছে করলে, একটা নতুন 'কলাম' তৈরী করে ঐ নাটকটি যে যে তারিখে, যে যে স্থানে, যে যে মঞ্চে ও উপলক্ষ্যে মঞ্চস্থ করেছিল, তার হিসাবও রাখতে পারেন। এ তথ্যাদি পিছনের পাতাতেই করা ভাল। আমরা এ পাতার পিছনে এজন্য একটা ছক তৈরী করে দিলাম।

মূল-ছকের প্রথম স্তম্ভে লিখতে হয় শব্দের ক্রমিকসংখ্যা। একটি নাটকে

পাঁচটি অঙ্ক এবং পঁচিশটি দৃশ্য থাকতে পারে। শব্দশিল্পী কিন্তু প্রতি অঙ্কে শব্দের ক্রম বদলাবেন না। প্রথম অঙ্কে দশটি শব্দ যোগ করার ব্যবস্থা হয়ে থাকলে, দ্বিতীয় অঙ্কের শব্দের ক্রম এগার থেকে শুরু হবে। অঙ্ক দৃশ্য ও শব্দক্রম চিহ্নিত করবার পদ্ধতি দুটি। প্রথম রীতি অনুসারে প্রতিটি শব্দের ক্রমের আগে অঙ্ক-দৃশ্য লেখা হয়। যেমন, ১/১/১, ১/১/২, ১/১/৩, ১/১/৪...... ১/২/৬, ১/২/৭, ১/২/৮........ ১/৩/৯ ইত্যাদি। অন্য রীতি অনুসারে অঙ্ক-দৃশ্য লিখে তার তলায় ঐ অঙ্ক দৃশ্যের শব্দগুলির সংখ্যাপাত করা যায়। মনে রাখবেন, দৃশ্যান্তরের সংকেত সম্পর্কে লিখে রাখতে হবে দৃশ্যের শেষে।

দ্বিতীয় স্তম্ভে নাটকের কোন স্থানে শব্দটি যুক্ত হবে তা নির্দ্দিষ্টভাবে লিখে রাখতে হয়। যেমন ৩য় পৃষ্ঠায় শশাঙ্কের '..................'সংলাপের পর। এখানে সংলাপটি লিখে রাখতে হবে।

তৃতীয় স্তম্ভে লিখতে হয় শব্দটির পরিচয়। যেমন, বৃষ্টিপাতের শব্দ (ঝির্ ঝিরে), ব্যাঙের ডাক ইত্যাদি কোথায় থামবে, কোথায় মিলিয়ে যাবে, সে সম্পর্কেও সংকেত থাকবে এখানে।

চতুর্থ স্তম্ভে থাকে ধ্বনির স্বরূপের কথা। ধ্বনির স্বরূপ তাৎক্ষণিক ও সংরক্ষিত এই দুই রকম হতে পারে। স্বরূপটি যদি তাৎক্ষণিক হয়, তবে কে কিভাবে ঐ সংকেত করবেন, তা যান্ত্রিক সংকেতের কলামের ওপর দিয়ে ধ্বনির স্থায়িত্বের দাগের এদিক পর্যন্ত স্থান জুড়ে লিখে রাখতে হবে।

পঞ্চম স্তম্ভ মূলতঃ সংরক্ষিত সংকেত সম্পর্কে। লক্ষ্য করুন একে মূলতঃ দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। আসলে সংরক্ষিত শব্দ হয় দু রকম। এক. টেপরেকর্ডারে, দুই. রেকর্ডে। প্রত্যেকটি যন্ত্র চালাতে গেলেই আবার দুটি দিকে নজর রাখতে হয়। প্রথমতঃ নির্দ্দিষ্ট শব্দটি বের করা দ্বিতীয়তঃ নির্দ্দিষ্ট বেগে চালান।

টেপ বা রেকর্ড নির্দ্দিষ্ট বেগে না চালালে শব্দের ভূমিকা বদলে যায়। এজন্য আগেই গতিবেগ ঠিক করে রাখতে হয়। টেপের ক্ষেত্রে শব্দ সূচনা ও সমাপ্তির সংখ্যা লিখে রাখতে হয়। রেকর্ডের A, B দুটি পিঠ হয়। প্রত্যেক পিঠে ৪/৫টি শব্দ সংকেত থাকে। এজন্য রেকর্ডের ক্ষেত্রে পিঠ ও ক্রম A3 বা B4 জাতীয় সংকেত লিখে রাখা দরকার। কাজের সময় নইলে অসুবিধা দেখা যায়।

শব্দের স্থিতি কাল, বারবার মহড়া দিয়ে স্থির করে নিতে হয়। এজন্য স্টপওয়াচ অবশ্য ব্যবহৃত হবে। নাট্য প্রযোজনার আগে একেবারে ঘড়ি ধরে নির্দ্দিষ্ট সময় মেপে একটি ভিন্ন টেপে বা প্রদর্শনীর দিনের টেপে তুলে রাখলে কাজ সহজ হয়। প্রত্যেক শব্দের পর খানিকটা সাদা টেপ থাকা উচিত। একটা টেপে ক্রম অনুসারে সব শব্দ রেকর্ডিং করে নিলে আরো ভাল হয়।

গম্ভীরতার মাত্রা সাধারণভাবে শব্দ সংক্রমণের সময়েই স্থির করে নেওয়া হয়। পরিবেশণের সময় মাইক্রোফোনেই এটা কমান বাড়ান যায়। যা হোক, এটা লিপিবদ্ধ করে রাখা উচিত।

মন্তব্যের ঘরে শব্দশিল্পী নিজের প্রয়োজনের কথা লিখে রাখবেন। এ মন্তব্য বস্তুতঃ আত্মসতর্কীকরণ মাত্র।

এই লিপি না থাকলে শব্দশিল্পীর পক্ষে নাটকে শব্দনিয়ন্ত্রণ অসম্ভব হয়ে পড়বে।

ধ্বনি সংযোজন সংকেতলিপি

নাটকের নাম.......................... নাট্যকার .... নাট্য সংস্থার নাম ....

অঙ্ক.......দৃশ্য.......। নাটক বা পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠা সংখ্যা .... মোট সময় .... পরিচালকের নাম ....

শব্দের ক্রমিক সংখ্যা	নাট্য ঘটনায় শব্দ সংযোজনের স্থানের সংকেত	শব্দের স্বরূপ	ধ্বনি সৃষ্টির রীতি	যন্ত্রের সংকেত				ধ্বনির স্থায়িত্ব	পারিপার্শ্বের মাত্রা	মন্তব্য
				টেপ রেকর্ডার		রেকর্ড				
				টেপের সংখ্যাসূচী	গতিবেগ	পিঠ ও ক্রম	গতিবেগ			

মঞ্চায়ন তথ্য

তারিখ	স্থান	মঞ্চের নাম	উপলক্ষ্য	নাটক সম্পর্কে দর্শক মন্তব্য

৯

শ্রুতি নাটকের পরিচালনা ও মঞ্চায়ন

এতক্ষণ আমরা যে সব আলোচনা করেছি তার ঠারেঠোরে একটি খাঁটি শ্রুতিনাটক পরিচালনা ও মঞ্চায়ন সম্পর্কেও বলা হয়েছে। এই অধ্যায়ে আমরা শ্রুতিনাটক পরিচালন ও মঞ্চায়ন সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনা করব।

আধুনিক নাট্য প্রযোজনায় পরিচালককে সার্বিক পরিকল্পনা ও রূপায়ণের একক দায়িত্ব দেওয়া হয়। নাটকের অন্যান্য দিক, অভিনয় ইত্যাদি নানা দিকের দায় নানা জনকে দেওয়া হতে পারে, তারা নানা বিষয়ে ভাবতে পারেন। কিন্তু তা পরিচালকের অনুমোদন ছাড়া নাটকে যুক্ত হতে পারে না। কারণ, তিনিই সামগ্রিক পরিকল্পনা রূপায়ন করছেন। সেই সামগ্রিক ভাবনার সঙ্গে যা যুক্ত নয়, তা তিনি অনুমোদন করবেন না। এই রীতি মান্য করবার ভিতর দিয়েই নাটকের সামগ্রিক ঐক্য গড়ে ওঠে।

এর অর্থ এই নয় যে সর্বময় কর্তৃত্ব নিয়ে পরিচালক অপরের প্রতি উপেক্ষা দেখাবেন। আসলে পরিচালক তার ব্যক্তিত্ব ও চিন্তার গভীরতা দিয়েই অন্যদের আনুগত্য অর্জন করবেন। একটা নাটক সুষ্টুভাবে প্রয়োগ করে বাঞ্ছিত নাট্যরস উৎপাদন সহজকথা নয়। পরিচালক নিজ বুদ্ধিতে ষোলআনা সার্থক এ দম্ভ না রেখে, নাট্যদলের অপরকেও চিন্তা করে থাকলে, তার চিন্তার ফল সহানুভূতির সঙ্গে শুনবেন পরিচালক, শেষ পর্যন্ত সে মত গৃহীত না হতেও পারে, তবু তিনি তা শুনবেন। কে জানে তার চিন্তায় পরিচালকের চিন্তার বাইরে কিছু ধরা পড়তে পারে নতুন কথা— যা নাট্যরসকে আরও নিখুঁত করে তুলতে পারে। অপরের মত উপেক্ষা করলে, এ মঙ্গলজনক পন্থা আবিষ্কারের সুযোগও হারিয়ে যায়।

পরিচালক অপরের মত সমগ্র নাট্যপরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করবেন। নিজ মতও এভাবে যাচাই করবেন। নাট্যদ্বন্দ্ব বা নাট্যকাহিনী কৌতূহলোদ্দীপকতা বজায় রেখে ক্রমশ পরিণতিমুখী নাট্যরসোদ্বোধক হবে কিনা, সেটাই হবে পন্থা-নির্দ্ধারণের উপায়। চরিত্রগুলি পরিস্ফুটনের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে পরিচালককে। সমগ্র চরিত্রের বিকাশ ও পরিণতির সূত্রেই তার সংলাপের কাঠ্য-স্বরূপ নির্দ্ধারিত হবে। এই সঙ্গে নানা শাব্দিক সংযোগের কথাও তিনি চিন্তা করে রাখবেন। নাটকের পাত্রপাত্রী নির্দ্ধারণ, শব্দশিল্পীর কর্তব্য নির্দ্ধারণ ইত্যাদির পূর্বেই পরিচালক নিজমনে নাটকের পূর্ণরূপ স্থির

করে নেবেন। নিশ্চয়ই ঐ রূপই নাটকের শেষ ও চূড়ান্ত রূপ নয়। কিন্তু নাটক নির্বাচন ও প্রথম সকলকে নিয়ে নাটক-পাঠের আগেই পরিচালকের মানস প্রস্তুতি সেরে নিতে হবে। না হলে প্রথম দিন থেকেই শিল্পীরা নিজ নিজ বুদ্ধি মত আত্ম-প্রস্তুত হতে থাকলে দেবনারায়ণ গুপ্ত কথিত Individual performecc হয়ে যাবে—এমন প্রয়োজনাকেই পার্থপ্রতিমবাবু বলেছেন 'অলস কালবেলায় কবিতা পোড়ানর উৎসব।'

মহড়ার প্রথম দিন : নাটক পাঠ ।।

পরিচালক প্রথম দিনে সব শিল্পীকে একত্রিত করে তার নিজস্ব রীতিমত একটা আদর্শ নাট্যপাঠ দেবেন। এ পাঠের দায়িত্ব পরিচালককেই নিতে হবে। নাটকপাঠের আগে পরিচালক সমগ্র নাটকের কথাবস্তু সংক্ষেপে বলে নেবেন। তিনি সমগ্র নাটকে কিভাবে কি রস ও কি বক্তব্যে শেষ করতে চান তাও ব্যাখ্যা করে নেবেন। আসলে একই নাটক বিবরণের স্টাইলে ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্যে উপনীত হতে পারে। পরিচালক নিজে কোথায় কোন উপলব্ধিতে পৌঁছে দিতে চান, তা বুঝিয়ে নিয়ে নাটকপাঠ শুরু করা উচিত।

কোন কোন পরিচালক, নাটক-ব্যাখ্যার এই ব্যাপারটি নাটক পাঠের পরে করতে চান। নাটক সম্পর্কে ধারণা না গড়ে নাটকের তাৎপর্য ব্যাখ্যাকে তারা ঘোড়ার আগে গাড়ি জোতা বলে থাকেন। নাটকপাঠের পর তাৎপর্য ব্যাখ্যা একদিক থেকে সুরীতি। কিন্তু ব্যাখ্যা আগে করে নাটক পরে পড়লে পরিচালকের মানসিকতা অনুভব সহজ হয়। শ্রোতারা ঐ আলোতেই নাটককে বিচার করতে পারেন। পরে তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলে শ্রোতার অনুভূতি ও তাৎপর্য মেলানর মধ্যে এমন কতকগুলি ফাঁক ঘটে যায়, যা বস্তুতঃ হওয়ার কথা নয়। আসলে শ্রোতার মনে পাঠের স্মৃতি যেখানে একটু শিথিল সেখানেই তাৎপর্য সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দেয়। যা হোক পরিচালক নিজে যেভাবে সুবিধা বোধ করবেন, সেভাবেই নাটকপাঠের আগে বা পরে নাটকের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করবেন।

এই পর্বেই পরিচালক নাট্যচরিত্র গুলির শারীরিক, সামাজিক ও মানসিক পরিচয় ব্যাখ্যা করে দেবেন। শারীরিক পরিচয়ে তার বয়স, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বোঝা যাবে, সামাজিক পরিচয়ে বোঝা যাবে তার Status. আর মানসিক পরিচয়ে বোঝা যাবে তার স্বভাব, মনের গঠন। আমাদের সংকলিত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পরিবারিক' গল্পের 'রত্না' চরিত্রটিকে ধরা যাক। রত্না সবল-স্বাস্থ্য, সুন্দরী যুবতী। সামাজিক পরিচয়ে মধ্যবিত্ত পরিবারের বিধবা-কন্যা। কিন্তু মানসিক পরিচয়ে অনুচ্ছ্বসিত, সংযত অথচ প্রবল আত্মমর্যাদা-সম্পন্ন নারী। প্রয়াতস্বামীর সন্তান ও স্বপ্ন তার কাছে একদিকে তীব্র সত্য, অন্যদিকে পরমেশের প্রতি ভালবাসা তার মনের নবদিগন্তের উদ্ভাস। শশাঙ্কের অন্তরঙ্গতা

লাভের আকাঙ্ক্ষা তার আত্মমর্যাদায় প্রতিহত। এই নারীর অনুচ্ছ্বসিত প্রেম, সন্তানের প্রতি ভালবাসা ও কর্তব্য এবং তীব্র আত্মমর্যাদাবোধ সৃষ্টি করেছে নাট্যদ্বন্দ্ব। স্বভাবতঃ নাট্যচরিত্রের এই ভাব ও ভাবনা পরিচালক প্রথম দিনেই এঁকে না দিলে শিল্পী পরিচালক কি চাইছেন, তার সন্ধান পাবেন কি করে? পরিচালক নাট্যদ্বন্দ্ব কোথায় কিভাবে ক্রমোদ্দীপ্ত হয়েছে, কোথায় ক্লাইম্যাক্স ইত্যাদিও এ দিনেই ব্যাখ্যা করবেন।

অভিনেতা-অভিনেত্রী নির্বাচন ॥

যেহেতু নাটকটি শ্রুতিনাটক, তাই পরিচালক অভিনেতা-অভিনেত্রী নির্বাচনে তাদের কণ্ঠস্বরের দিকেই নজর দেবেন। কণ্ঠস্বর নির্বাচনে দুটি দিকে নজর রাখা দরকার। এক. কণ্ঠস্বর হবে চরিত্রানুগ দুই. কণ্ঠস্বরগুলির মধ্যে থাকবে বৈচিত্র্য। অর্থাৎ প্রথম সূত্রানুসারে কোন চরিত্রের সংলাপ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই চরিত্রটি নারী কি পুরুষ, যুবক কি বৃদ্ধ কি শিশু ইত্যাদি ফুটে উঠবে। দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে নাটকের সবগুলি চরিত্রের স্বরের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকবে। এটা শ্রুতিনাটকের ক্ষেত্রে একটা বিশেষ পালনীয় নীতি।

অনেক সময়, নানা কারণে একই ব্যক্তিকে একাধিক চরিত্রে অভিনয় করতে হয়। এমন ক্ষেত্রে বয়সাদি অনুসারে স্বরভঙ্গির পরিবর্তনে সমর্থ ব্যক্তিকেই নির্বাচন করতে হয়। মূল চরিত্রটির জন্য স্বাভাবিক কণ্ঠ ও অন্য চরিত্রের জন্য নিয়ন্ত্রিত কণ্ঠ ব্যবহার করার আয়োজন থাকা উচিত। পরিচালক এভাবেই ভূমিকা বণ্টন করবেন না।

মহড়ার ব্যবস্থা

একটি শ্রুতিনাটক মঞ্চস্থ করবার আগে নিয়মিত মহড়া হওয়া প্রয়োজন। প্রথম অবস্থায় অভিনেতা-অভিনেত্রীরা স্ক্রীপ্ট বা মুদ্রিত নাটক দেখেই মহড়া দিতে পারেন। কিন্তু অনতিবিলম্বে স্ক্রিপ্ট বা মুদ্রিত নাটক দেখা বাদ দিতে হবে। অভিনেতা-অভিনেত্রীর পার্ট মুখস্থ রাখা নাটকের শিল্প হয়ে ওঠার প্রথম শর্ত। পরিচালক এ বিষয়ে অত্যন্ত দৃঢ় হবেন।

যে অভিনেতা বা অভিনেত্রীর পার্ট মুখস্থ হয়নি, তাঁকে পার্টের জন্য চোখ ও মন নিযুক্ত রাখতে হয় ঐদিকে—তিনি সমগ্র মন কখনই অভিনয়ে ঢেলে দিতে পারেন না—তা তিনি যত বড় গ্ল্যামারসম্পন্ন মানুষই হন না কেন।

শ্রুতিনাটকের পার্ট শিল্পীদের মুখস্থ হয়ে যাবার মধ্যেই পরিচালক কণ্ঠাভিনয়ের খুঁটিনাটির দিকে নজর দেবেন। প্রতিটি সংলাপ যেমন সমগ্রভাব পরিপুষ্টির অঙ্গ ঠিক তেমনি তাৎক্ষণিক অনুভাব প্রকাশেরও সামগ্রী। তাই পরিচালক প্রতিটি সংলাপের মৌল ভাব অনুভাবকে বুঝবেন এবং ঐ ভাব-অনুভাব সৃষ্টির অব্যর্থ স্বরভঙ্গিটি খুঁজে বের করবেন এবং প্রযুক্ত করবেন। তাঁকে এখানেই থামলে চলবে না, সেই সঙ্গে তিনি যা করলেন এবং যা করতে

চেয়েছিলেন, তা মিলল কিনা, সে বিষয়ে সতর্কভাবে পরীক্ষা করবেন। যদি তা হয়ে থাকে, তবেই ঐ স্বরভঙ্গি অনুমোদিত হবে।

নাটকের মহড়া ও শব্দশিল্পী ॥

নাটক-পাঠের দিন থেকেই শব্দ শিল্পীর কাজ শুরু হয় আর মহড়া দ্বারা অভিনয় অংশ যতই পরিণত হয়ে উঠতে থাকে, ততই তাঁর কাজ বাড়ে। আসলে অভিনয়ে অংশই নাটকের মূল কথা। শব্দ'ত ঐ মূলকেই রং-এ রসে পূর্ণ করে তোলে। এ ক্ষেত্রে পরিচালক ও শব্দশিল্পীর কার্যাবলী আমরা ইতঃপূর্বেই আলোচনা করেছি।

শব্দ-সহ মহড়া॥

শিল্পীরা অভিনয়ের প্রস্তুতিতে পাকা হয়ে এলে শব্দ-যুক্ত মহড়া হওয়া দরকার। এ জন্য একাধিক মহড়ার প্রয়োজন হয়। এ সময়েই পরিচালক মনে মনে শব্দ ও অভিনয় যুক্ত সমগ্র নাটক উপলব্ধি ও বিচার করবেন : এই মহড়ার প্রথম দিকে শব্দ সংযোজনের ব্যাপারটা চূড়ান্ত রূপ নেয়। শব্দের স্থিতিকাল, পিথ, জাতি, ভলিউম ও দিক নির্দ্ধারিত হয়। পারিচালক ও শব্দশিল্পী এ সময়েই সংযোজন-বিযোজন করে পরিণতরূপ স্থির করেন।

পরিচালক শব্দ ও অভিনয়ের একত্রিত রূপটি বারবার পরীক্ষকের দৃষ্টিতে যাচাই করবেন। তিনি যা চেয়েছিলেন, তা হয়েছে কি? কাঠ্য অভিনয়ে চরিত্র, দ্বন্দ্ব ও পরিণতি কি সম্পূর্ণ? শব্দসংযোগ কি পরিবেশ গড়তে সমর্থ হয়েছে? যেখানে ভাবাত্মক শব্দগুলি যুক্ত— তা কি সঠিক ভাবটি ফুটিয়েছে? দৃশ্যান্তরের বাজনা দৃশ্যান্তরের বোধ আনছে কি? সব মিলিয়ে নাটকে একটা সামগ্রিকতা সৃষ্ট হয়েছে কি? যদি আপনার অনুভব পরিতৃপ্ত হয়ে থাকে তবে আপনার কাজ শেষ। যদি না হয়ে থাকে, তবে অভাবটি কোথায় তা খুঁজে বের করে পূরণ করুন।

মঞ্চায়নের দিনে॥

মঞ্চায়নের দিনে সকলকে গুছিয়ে নিয়ে সময়মত মঞ্চে উপস্থিত হবার দায়িত্ব কিন্তু পরিচালকের। এজন্য ক্লাবঘর, পরিচালকের বাড়ি ইত্যাদি কোন কেন্দ্রীয় স্থানে সকলে সমবেত হয়ে একত্রে যাত্রা করাই সবচেয়ে ভাল। কোন বিশেষ শিল্পী বিশেষ কারণে ঐ সমবেত যাত্রায় যোগ দিতে না পারলে, তাঁকে নিজ দায়িত্বে যথাসময়ে মঞ্চে হাজির হতে হবে। তিনি পূর্বাহ্নে পরিচালককে জানিয়ে অনুমতি নিয়ে তবে এই ব্যতিক্রমী আচরণ করতে পারেন। মোটকথা সকলকে সময় মেনে মঞ্চে হাজির করবার পরিকল্পনা করে দেবেন পরিচালক। যে অনুসারে কাজ করবার দায়িত্ব সকলের।

মঞ্চ ব্যবস্থা॥

প্রতিনাটকের মঞ্চ সহজ সরল হবে। মঞ্চকে অতি জাঁকজমকে সজ্জিত

করা উচিত নয়। আসলে নাট্যমঞ্চে যেটুকু দর্শনের সুযোগ থাকে, তা হয় উপভোক্তার নাটক উপভোগের পরিপন্থী। তাই দর্শনকে যথাসম্ভব গৌণ করা উচিত। এ কারণেই মঞ্চ সরল হবে।

মঞ্চে অনেক সময় অভিনেতা অভিনেত্রীদের পৃথক পৃথক বেদীতে উপবেশনের আয়োজন করা হয়। এটা না করাই ভাল। এতে শ্রোতার মনে প্রথমেই একটা বিচ্ছিন্নতার বোধ এনে দেয়। গীতিআলেখ্য মঞ্চায়নে শিল্পীরা যেমন সমবেতভাবে বসেন, সেই ব্যবস্থাই সবচেয়ে ভাল।

আলোক-ব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। তবু বলি অতি উজ্জ্বল আলো বা আলোর যাদুকরী শ্রুতিনাটকের পক্ষে অবাঞ্ছিত।

শিল্পীদের সাজপোষাক।।

শ্রুতি নাটকের শিল্পীরা অতি সরল ও সাধারণ পোষাক পরে মঞ্চে হাজির হবেন। অতি উগ্র বা উজ্জ্বল পোষাকে মঞ্চে উপস্থিত হওয়া উচিত নয়। তাতে দর্শকের দৃষ্টি অস্বাভাবিকভাবে আকৃষ্ট হয়। তাতে উজ্জ্বল পোষাকধারী দল থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়েন। নাটকের ঐক্যবোধের বিরোধী এমন পোষাক। ইউনিফর্মের মত সকলের একই পোষাক বা সমজাতীয় পোষাক যে নৈর্ব্যক্তিক আবহাওয়া আনে, তা মঞ্চে উপস্থাপিত শ্রুতি-নাটকের যথার্থ উপযোগী।

মঞ্চায়নের সময় মাইক।।

শ্রুতি নাটক মঞ্চায়নে মাইক্রোফোন অনিবার্য। এজন্য অনেকগুলি মাইক লাগে। যতজন অভিনেতা, অভিনেত্রী—ততগুলি মাউথপিস থাকলে সবচেয়ে ভাল হয়। অভিনয়কালে শিল্পীরা মাইক নিয়ে কাড়াকাড়ি করছেন, এটা দৃষ্টিকটু। এ ছাড়া অন্ততঃ দুটি বাড়তি মাউথপিস্ থাকা উচিত। একটি শব্দ সংযোজকের জন্য, অন্যটি তাৎক্ষণিক শব্দ উৎপাদকদের জন্য।

সব মাইক্রোফোন সম মানের হওয়া উচিত। কোনটি ভাল, কোনটি মন্দ, কোনটি বেশি সূক্ষ্ম শব্দ পর্যন্ত ধারণক্ষম, কোনটি বড়স্বরও ধরতে পারে না-—এমন হলে অভিনয়ে সমতা থাকে না। অতএব পরিচালক এ বিষয়ে প্রথমেই তৎপর হবেন। সব মাইক্রোফোন একই ভলিউমে নিয়ন্ত্রিত হবে।

১০

শ্রুতি নাটক ও নাট্যকার

ডঃ অমিতাভ ভট্টাচার্য সদ্য দেজ্ পাবলিকেশন থেকে 'এক ডজন শ্রুতিনাটক' নামে এক গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। নাটকগুলির সবই ডঃ ভট্টাচার্যের। কতকগুলি তাঁর নিজের রচনা, কতকগুলি বিখ্যাত গল্পকারদের ছোটগল্পের নাট্যরূপ এ গ্রন্থের মুখবন্ধ রচনা করেছেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। আমরা এই মুখবন্ধটি এখানে ব্যবহার করব। কারণ অতি জনপ্রিয় এই মানুষটি শ্রুতিনাটক সম্পর্কে তাঁর ধারণা ব্যক্ত করার সঙ্গে নাট্যকারদের ইতিকর্তব্য সম্পর্কেও কিছু বলেছেন। তাঁর চিন্তার সূত্র আমাদের আলোচনায় প্রবেশের সহায়ক হবে।

তিনি লিখেছেন;

> ...সম্প্রতি আমরা শুনছি—শ্রুতিনাটক। সে আবার কী! আমার মনে হয়, বেতার নাটক মঞ্চে এলে হয়ে যায় শ্রুতিনাটক। মঞ্চ সজ্জা, পাত্রপাত্রীদের রঙ্‌চঙের কোন প্রয়োজন নেই। পাশাপাশি বসে পড়, পাণ্ডুলিপি অথবা ছাপা বই দেখে যার যার অংশ পড়ে যাও। তবে সেই পাঠে নাটকের যাবতীয় আবেগ যেন থাকে। তাহলে, শ্রুতিনাটক কি নাটকের আঙ্গিকে লেখা হবে! না যে কোন সাহিত্যই পাঠের কায়দায় শ্রুতিনাটক হবে। তাও হতে পারে।

শ্রীচট্টোপাধ্যায় প্রচলিত যে পদ্ধতিকে পার্থপ্রতিম চৌধুরী, দেবনারায়ণ গুপ্ত, ডঃ অজিত ঘোষ ইত্যাদি বিশিষ্ট নাট্যবিদেরা দারুণভাবে আক্রমণ করেছেন, যা অতি সহজে, কম আন্তরিকতায় ও নিষ্ঠায় পূর্ণ-শিল্পায়ন না করেই মঞ্চস্থ করা হয়—তাকেই শ্রুতি নাটকের আদর্শ বলে ধরেছেন। এটা সম্পূর্ণ প্রযোজনার দিক। বর্তমান প্রবন্ধে এ বিষয়ে মন্তব্য করার প্রয়োজন নেই। কারণ, আমাদের এ গ্রন্থের পাঠকদের মনে আমরা ইতঃমধ্যেই শ্রুতিনাটক সম্পর্কে একটি ভিন্ন ও যুক্তি-সম্মত রূপ ও তার প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা গড়ে তুলেছি।

শ্রীচট্টোপাধ্যায়, শ্রুতিনাটকের ঐ প্রয়োগ বিধিকে আদর্শ বলে মানলেও তিনি অন্তরে যে ঐ রীতির প্রতি ষোলআনা প্রীত নন, তা তাঁর 'সেই পাঠে নাটকের যাবতীয় আবেগ যেন থাকে'—এই সর্ত আরোপের মধ্যেই বোঝা যায়। ঐ যাবতীয় আবেগ গঠন করতে গেলে যে অভ্যাস-নিষ্ঠা অনুধ্যান প্রয়োজন বসে বসে 'পাঠে' তা কখনই আসে না। অভিনেতা অভিনেত্রীর তন্ময়তা (নাট্যচরিত্রের সঙ্গে) তাতে ছিন্ন হবেই।

এর পরেই শ্রীচট্টোপাধ্যায় নাটক রচনায় প্রশ্নে এসেছেন। যে মানুষ সৃষ্টিশীল সাহিত্য চিন্তায় ব্রতী, তার মনে একটা নতুন আঙ্গিক সম্পর্কে এ প্রশ্ন ত' জাগবেই। কিন্তু হার্ট-স্পেশালিষ্ট ডাক্তার যেমন ই-এন্‌-টি স্পেশালিষ্টের আওতার বিষয়ে গভীর চিন্তা করেন না—শ্রীচট্টোপাধ্যায়ও তেমনি, সাহিত্যের এই আঙ্গিকটির বিষয়ে গভীর অনুসন্ধিৎসা দেখান নি। আর তাই মন্তব্য করেছেন, যে কোন সাহিত্যই পাঠের কায়দায় শ্রুতিনাটক হবে।

আজকাল বৈচিত্র্যের জন্য টিভিতে সংবাদ দুজনে ভাগ করে পড়ছেন। কিন্তু এতে কি নাটকীয়তা সৃষ্টি হচ্ছে? একটা প্রবন্ধকে একাধিক জন ভাগ করে বললেই কি তা নাটকীয়তা লাভ করবে? তাকে কি শ্রুতিনাটক বলব? একের বেশি শিল্পী যদি একই বিষয়ের নানাদিক সম্পর্কে নানা বক্তব্য বিশিষ্ট অনেকগুলি কবিতা পরপর আবৃত্তি করে যায়, এমনিকি কবিতাগুলির মধ্যে ভাব বৈপরিত্যের দ্বন্দ্বিক সংঘাতও যদি থাকে, তবে তাকে কি শ্রুতিনাটক বলব? এ বিষয়গুলি নিয়ে যে শ্রুতিনাটক লেখা হতে পারে না, একথা আমি বলছি না, বলছি, তাকে নাটক হতে গেলে, নাট্যকারের মনে নিশ্চয়ই তার অন্তর্নিহিত একটা নাট্যগুণ ধরা পড়বে এবং নাট্যকার তাকে সেভাবেই সাজাবেন। যতক্ষণ তা না হচ্ছে, ততক্ষণ যে কোন সাহিত্যই ভাগ ভাগ করে নানা জনে পড়লে, তা আকর্ষণীয়, মনোরম এমনকি শ্রুতিমধুরও হতে পারে, কিন্তু কিছুতেই শ্রুতিনাটক হচ্ছে না। শ্রুতিনাটকের নাট্যকারকে প্রথমেই এ প্রত্যয়ে উপনীত হতে হবে।

শ্রী চট্টোপাধ্যায় ঐ মুখবন্ধের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে শ্রুতিনাটক রচনার চৌহদ্দি ও পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর মানসিকতা ব্যক্ত করেছেন। তিনি লিখেছেন,

> ....অল্প চরিত্র , দু'জন হলেই ভাল, তিনজনে আপত্তি নেই। দৃশ্যান্তর না হলেই ভাল হয়। টানা কথোপকথন, একটি মাত্র সংঘাত------ধীরে ধীরে মাত্রা চড়তে চড়তে ক্লাইম্যাক্স। অর্থাৎ তীরের মত যেন বিদ্ধ হয়। নদীর প্রবাহের মতো যেন বয়ে যায়।

বর্তমান কালে নানা স্থানে বহু শ্রুতিনাটক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ঐ সব প্রতিযোগিতায় নাটকের সময়সীমা পনের কুড়ি মিনিট বেঁধে দেয়া হয়। শিল্পী সংখ্যা তিন চার জন। এ কারণে স্বল্প দৈর্ঘ্যের শ্রুতিনাটকের একটা বাজার চল চাহিদাও গড়ে উঠেছে। আর শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের এই বক্তব্যে সেই চাহিদার স্বরূপ বোঝাতে যথার্থ নীতি নির্দ্ধারিত হয়েছে। আমার বিশ্বাস, ইতঃমধ্যে বহুস্থান থেকে স্বল্প চরিত্রে স্বল্প সময়ে স্বল্পদৈর্ঘ্য শ্রুতিনাটক লিখবার এত তাগিদ অনুরোধ ও আবেদন শ্রীচট্টোপাধ্যায় পেয়েছেন, যার ফলে ওটিকেই শ্রুতি-নাটকের প্রকৃতরূপ বলে তাঁর বিশ্বাস জন্মেছে। অথচ স্বল্প দৈর্ঘ্য নাটকের মৌল চরিত্র সম্পর্কে তার তীব্র ও পরিচ্ছন্ন বোধ ফুটে উঠেছে উদ্ধৃতির শেষ দুই বাক্যে। তীরের মত একমুখী, অনিবার্য-গতি সম্পন্ন এবং

নদী প্রবাহের মত স্বচ্ছন্দ না হলে কখনই একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের নাটক সার্থক হতে পারে না। এ কথা মঞ্চ বা শ্রুতির যে কোন স্বল্প দৈর্ঘ্যের নাটক সম্পর্কে অকৃত্রিম সত্য। শ্রুতিনাটকের নাট্যকারকে এ বিষয়ে অবশ্য সতর্ক হতে হবে।

নাটকের এই অনিবার্যতা সম্পর্কে এককালের বাঙলার মঞ্চ নায়ক ও নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এক অসাধারণ তত্ত্ব বর্ণনা করেছেন। নাটকের জন্য যে কোন ঘটনা নির্বাচন করা যায় না। নাট্যঘটনা হবে 'ঘটনা-প্রসবী ঘটনা।' অর্থাৎ যথার্থ নাট্যঘটনা সেটাই, যেটা নতুন ঘটনার জন্ম দিতে পারে। অর্থাৎ পরবর্তী ঘটনার বীজ থাকবে পূর্ববর্তী ঘটনায়। তার ফলে নাট্যপ্রবাহ হবে তীরের মত একমুখী গতিসম্পন্ন অথচ স্বচ্ছন্দ।

কিন্তু শ্রীচট্টোপাধ্যায় স্বল্প দৈর্ঘ্য নাটকের জন্য দুটি বা তিনটি চরিত্রের অনুমোদন করলেন কেন? দৃশ্যান্তর না থাকবার কথা বললেন কেন? কেন টানা কথোপকথনের কথা বললেন? দেখা যাচ্ছে ডঃ ভট্টাচার্যের পূর্বোক্ত গ্রন্থের বারোটি নাটিকার কোনটিতেই পাঁচটির বেশি চরিত্র নেই। বেশির ভাগে দুটি বা তিনটি চরিত্র। তা হলে শ্রীচট্টোপাধ্যায় কি এ গ্রন্থের নাটিকাগুলি সম্পর্কেই এ মন্তব্য করেছেন? যাই হোক, স্বল্পদৈর্ঘ্যের নাটক হলেই যে তা এক আঙ্গুলে গোণা সংখ্যক চরিত্র নিয়ে গঠিত, দৃশ্যান্তর-শূন্য এবং টানা সংলাপের নাটক হতে হবে, এমন কোন অনিবার্য বিধি থাকতে পারে না। কারণ, এগুলি নাট্য-প্রতিযোগিতার নাটকের সর্ত হতে পারে, কিন্তু একটি নাটক যথার্থ হয়ে উঠবার অনিবার্য সর্ত নয়।

নাটকের প্রধান লক্ষ্য কি? আসলে নাটকে আমরা একটা গল্প শুনতে চাই। গল্পটি বক্তব্য -প্রধান, অনুভূতি-প্রধান এমন কি ভাবনা বা চিন্তা প্রধানও হতে পারে। গল্প যেমনই হোক, উপন্যাস বা ছোটগল্প থেকে নাটকের মূল পার্থক্য হবে তার উপস্থাপনার মধ্যে। নাটকে বাস্তবে ঘটে চলেছে—এই ভঙ্গিতে উপস্থিত করতে হবে ঘটনাকে। লেখক থাকবেন নৈব্যক্তিকভাবে অনুপস্থিত। এটাই নাটকের মৌলিক পার্থক্য। এজন্য অন্য সাহিত্যের অন্য আঙ্গিকের মত নাটক যতক্ষণ লিখিত আকারে থাকছে অর্থাৎ অভিনীত না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা নাটকের সাঁট (শব্দটা পেশাদার মঞ্চে কিছুকাল আগে পর্যন্ত চালু ছিল, গিরিশবাবুদের আমল থেকে) মাত্র। অভিনীত হলেই নাটকের প্রকৃত স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হয়। নাটক রচনা করতে বসলে নাট্যকার মনের রঙ্গমঞ্চে নাট্যঘটনার অভিনয় কল্পনা করবেন। না হলে সার্থক নাটক হয় না।

মঞ্চ নাটকের শিল্পী সংখ্যার চেয়ে শ্রুতিনাটকের শিল্পী সংখ্যা বেশি করতে কোন প্রকৃত বাধা ঘটে না। মঞ্চে একই ব্যক্তিকে একাধিক চরিত্রে রূপ দিতে গেলে তার চরিত্রানুগ রূপগ্রহণ পোষক বদল করতেই হয়। ফলে তা যেমন সময়-সাপেক্ষ তেমনি পরিকল্পনা-সাধ্য। শ্রুতিনাটকে একই ব্যক্তি খুব

সহজেই একাধিক চরিত্রে রূপ দিতে পারেন—শুধু তার কণ্ঠস্বর বদল করে চরিত্ররূপের সঙ্গে মেলাতে হয়। আমাদের প্রদত্ত নাট্যগুচ্ছের বৃক্ষবন্দনার মত বহু শিল্পীর নাটক মাত্র ছ'জন শিল্পী অভিনয় করেছিলেন—তিনজন পুরুষ, তিনজন নারী। তাই বলছি, নাটকের প্রয়োজন যে চরিত্র সংখ্যা প্রয়োজন তা আপনি গ্রহণ করবেন। প্রযোজনার কথা তখন আপনাকে না ভাবলেও চলবে। তবে যদি প্রতিযোগিতায় অভিনয় করবার জন্যই আপনাকে নাটক রচনায় ব্রতী হয়ে থাকতে হয়, তবে অবশ্য আপনাকে স্বল্প চরিত্রের নাটক লিখতেই হবে। সেক্ষেত্রে বিষয় নির্বাচনে সতর্ক হবেন।

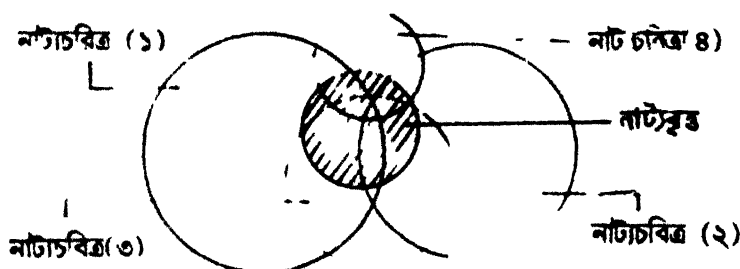
মঞ্চনাটকে দৃশ্যান্তর একটি ব্যয় ও পরিকল্পনাসাধ্য ব্যাপার। ব্যয় পটগঠনে, পরিকল্পনা দ্রুত সিন্টিং-এ। এজন্য আমরা মঞ্চনাটকে বিশেষতঃ একাঙ্কিকায় দৃশ্যান্তর বর্জন করতে চাই। শ্রুতিনাটকের ক্ষেত্রে দৃশ্যান্তর ঘটানয় এমন কোন অসুবিধা নেই। একটা সামান্য দৃশ্যান্তর সূচক বাজনা দিয়েই দু তিন সেকেণ্ডর মধ্যে দৃশ্যান্তর বোঝাতে পারি। অতএব নাট্যকারকে এ বিষয়ে চিন্তাগ্রস্ত হতে নিষেধ করব।

তবে দৃশ্যান্তর ঘটনার সময় নাট্যকারেরা, বিশেষতঃ শ্রুতিনাটকে, যদি সম্পূর্ণ পরিবেশ বদল করতে পারেন, তবে শ্রুতিনাটকের পক্ষে তা খুব উপযোগী হয়। পড়ার ঘর থেকে দাদার শোবার ঘরে যে পরিবর্তন তা শাব্দিক সংযোগে বোঝান অসুবিধা-জনক। মঞ্চনাটকে এক ঘর থেকে অন্য ঘর শুধু দৃশ্য সজ্জায় বোঝান যায়। নাট্যচরিত্রের কথাতেও এ পরিবর্তন ব্যক্ত করা যায়—যেমন অনেক সংস্কৃত নাটকে করা হয়েছে, যেমন করা হয় যাত্রায়। কিন্তু তা ত, শ্রুতিনাটকের স্বভাব-সম্ভূত হয় না। শ্রুতিনাটকের পরিবর্তন বোঝাতে পরিবেশগত ধ্বনির পরিবর্তন করতে হয়। এ ত' নাটক চমৎকার ও বৈচিত্র্য সম্পাদনের এক হাতিয়ার। যে নাট্যকার এ বিষয়টি যত সার্থকভাবে তার নাটকে প্রয়োগ করতে পারবেন, তার নাটক তত সহজে শ্রোতাকে আকৃষ্ট করবে। সমুদ্রবিজয়, বৃক্ষবন্দনা বা বাঁশি নাটকে বারবার এই পরিবেশ পরিবর্তনের বিধি প্রয়োগ করা হয়েছে।

তবে কি দৃশ্যান্তর না থাকলে নাটক হবে না? না, একথা আমরা বলি নি। দৃশ্যান্তর বা চরিত্র সংখ্যা বা টানা সংলাপ ইত্যাদি কোনটাই কিন্তু আসল নাটক নয়—মূল নাটকীয়তা রয়েছে নাট্যকারের নাট্যঘটনা পরিকল্পনায় ও তার 'এক্সপোজিশন' বা 'আন-ফোল্ডমেন্টে'। তাই দৃশ্যান্তর না থাকলে বা টানা-সংলাপ থাকলে তা নাটক হবে না—এমন কথা বলা যায় না। একথা বলতেই হবে যিনি দুটি চরিত্রে, টানা কথোপকথন এবং দৃশ্যান্তর না ঘটিয়ে যথার্থ নাট্যদ্বন্দ্ব ও নাট্যরস সৃষ্টি করতে পারবেন, তিনি শক্তিমান। স্বল্প অস্ত্রে যুদ্ধ জয় কৃতিত্বের পরিচায়ক বৈকি!

এমন নাটক মঞ্চায়নে পরিচালক ও শব্দশিল্পীর দায় বেশি। কারণ পরিবেশঘটিত শব্দ সংযোগে শ্রোতার কাছে বৈচিত্র্য উৎপাদনের সুযোগ এখানে নেই সাধারণভাবে তাদের ওরই ভেতর এমন কিছু পরিবেশ ঘটিত শব্দ যোগ করতে হবে, যা নাটকের গৌরব ও বৈচিত্র্য বাড়াতে পারে ভাবমূলক শব্দ সংযোগ করতেই হবে।

অনেক সময় দেখা যায় মূল নাট্যঘটনা বর্ণনার মধ্যে নাট্যকার এমন বাক্য সংযোগ করে বসেন, যা সমগ্র চরিত্রটির পক্ষে ক্ষতিকর। এ ব্যাপারে নাট্যকার সতর্ক হবেন। আসলে বিভিন্ন চরিত্রের জীবন বৃত্তের সেই অংশই আমরা নাট্য-বৃত্তের অন্তর্গত করি, যা চরিত্রগুলির নাট্য-সংঘাতের অনুকূল।



এই বৃত্তমালার মধ্যের বৃত্তটিকে নাট্যবৃত্ত বলা যেতে পারে। লক্ষ্য করুন, এই বৃত্তের কোন না কোন অংশ অন্যবৃত্তগুলির কোন না কোন অংশ স্পর্শ করে আছে এবং বৃত্তের সব অংশই অন্যবৃত্তের কোন না কোন অংশ দ্বারা অবশ্যই আবৃত। অর্থাৎ অন্য বৃত্তগুলির অংশদ্বারা কখন এককভাবে কখনও বা যৌথভাবে কখনও মিলিত ভাবে মধ্যের বৃত্তকে আবৃত করে রেখেছে। নাটকেও তাই হয়। নাটকের চরিত্রগুলির এমনি ভাবেই নাট্যবৃত্তকে দখল করে থাকে এবং নাট্যদেহ গঠন করে।

লক্ষ্য করুন চরিত্রগুলির বৃত্তের বড় অংশই সমুদ্রের বুকে হিমবাহের দৃশ্যমান অংশের চেয়ে বেশির ভাগ জলতলে অদৃশ্য থাকার মত রয়েছে নাট্যবৃত্তের বাইরে। নাট্যকার শুধু নাট্যবৃত্তের মধ্যে থাকা চরিত্র-অংশই বর্ণনা করেন। চরিত্রগুলির বাকী অংশ নাট্যকার জানান না— জানাবার প্রয়োজনও নেই। কারণ, নাটকে স্থান পায় চরিত্রগুলির প্রয়োজন সংঘাত ক্ষেত্রটুকু। কিন্তু অভিনেতা যখন নাট্যচরিত্র সৃষ্টি করবেন অভিনয়ে, তখন তাকে সমগ্রচরিত্র মনে মনে অনুমান করে নিতে হয়— না হলে নাট্যব্যক্তিত্ব পূর্ণ হয়না— অভিনয়দ্বারা সামগ্রিকতা আনা যায় না—চরিত্র সৃষ্টি খণ্ডিত হয়। অনেক সময়েই তা হয়ে দাঁড়ায় 'সংলাপ অভিনয়' (diologue- acting). চরিত্রায়ন (Charcterization) হয় না।

ভাল নাট্যকারও নাট্যচরিত্র অঙ্কন কালে কৌশলে নাট্যবৃত্তের মধ্যেই নাট্যচরিত্রের সামগ্রিকতার ইঙ্গিত দেন। এর ফলে চরিত্রগুলি দৃঢ় প্রদীপ্ত, ও সমুজ্জ্বল হয়। প্রয়োজনীয় সংলাপের সামান্য অদল-বদল করেই এই বিবর্তন আনা যায়। ভাল নাটকের সংলাপ বিশ্লেষণ করলেই এই বৈশিষ্ট্য আপনার কাছে ধরা পড়বে। এমন নাটক পড়তে এবং অভিনয় করতে—দুভাবেই বাড়তি আনন্দ পাওয়া যায়। আপনার নাটকেও নাট্যচরিত্রে এই সামগ্রিকতার ইঙ্গিত রাখবেন।

সংলাপ নাটকের প্রাণ। সংলাপের ভেতর দিয়েই নাট্যকাহিনী প্রকাশিত হয়। শ্রুতিনাটকের ক্ষেত্রে এই গুরুত্ব আর বেশি হয়। কিন্তু শ্রুতিনাটকে সে সব দ্বন্দ্ব সংঘাত ও ক্রিয়াকেই প্রকাশ করতে হয় সংলাপের ভিতর দিয়ে। অতএব শ্রুতিনাটক রচনা করতে বসলে নাট্যকারকে সংলাপ সম্পর্কে আরো বেশি সজাগ হতে হবে।

সংলাপ হবে চরিত্র দ্যোতক। একই কথা জীবনে সফল ব্যক্তিত্বময় আত্ম-বিশ্বাসী মানুষ যেভাবে বলবেন, জীবনে ব্যর্থ নড়বড়ে ব্যক্তিত্বের আত্মবিশ্বাস-হীন মানুষ সেভাবে বলবেন না। লক্ষ্য করে দেখা গেছে চরিত্রে চরিত্রেপার্থক্য ঘটে তার সামাজিক, আর্থিক ও মানসিক পরিস্থিতিতে। সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে পরিবারও ধরতে হবে। আমাদের সংকলিত নাটকগুলির মধ্যে 'পারিবারিক' নাটকটির দুই ভাই বোন একই পরিবারের মানুষ হয়েও ভিন্ন মানসিকতায় পৌঁছেছে। এর কারণ একদিকে পরিবারের বাইরে তাদের সামাজিক ক্ষেত্র ভিন্ন।

আবার মানসিক পরিস্থিতির অন্তর্গত তার শারীরিক গঠন। শরীর পঙ্গু এবং সমর্থ থাকলে—দুই ভিন্ন মানসিকতা গড়ে ওঠে। চরিত্র সৃষ্টির সময় কার্যকারণ সূত্রে একটা সমগ্র চরিত্র যদি নাট্যকারের কল্পনায় না থাকে তা হলে যথাথ সংলাপ রচিত হয় না।

নাট্যসংলাপ এবং সাধারণ সংলাপে পার্থক্য আছে। যে কোন সংলাপেই নাট্য সংলাপ নয়। ধরুন কোন নাট্যচরিত্র তার বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে কড়া নাড়ল। দরজা খুললেন, বন্ধুর স্ত্রী। বন্ধু বললেন, বৌদি রবি বাড়ি আছে?

বৌদি বললেন, না তো।

এ কিন্তু যথার্থ নাট্যসংলাপ হল না। এ হল শুধু *Statement of fact*—ঘটনার বিবরণ। এমন সংলাপে নাটক জমে না।

কিন্তু বৌদি যদি ক্ষুব্ধ স্বরে বলতেন, তিনি কি বাড়িতে থাকেন?

তা হলে দেখুন, রবি যে বাড়ি নেই সেই সংবাদ ত' পরিবেশিত হয়েছেই, বাড়তিভাবে স্বামীসঙ্গ-বঞ্চিত এক গৃহবধূর বিরহিত মর্মবেদনা ও ক্ষোভও

প্রকাশিত হয়েছে। মাত্র একটি সংলাপে আগের বৌদির চেয়ে এ বৌদি অনেক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন। আগের বৌদি সংবাদ পরিবেশনের যন্ত্রমাত্র কিন্তু দ্বিতীয় বৌদি হয়ে উঠেছেন রক্ত মাংসের এক সজীব চরিত্র। এমনই হবে নাট্য সংলাপের বৈশিষ্ট্য।

শ্রুতিনাটকের নাট্যকারকে সবচেয়ে বড় করে ভাবতে হবে, যে, তিনি এক দুরূহ কাজে ব্রতী হয়েছেন। তিনি এমন এক জগতকে আঁকতে বসেছেন যেখানে আলোর স্পর্শ নেই। কিংবা বলা যায়, তার সাধনা গান্ধারীর সাধনা। তিনি স্বেচ্ছায় চোখে শতপুরু কাপড় বেঁধেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা ডঃ ক্ষেত্র গুপ্তের যে উদ্ধৃতি দিয়েছি তার কথা স্মরণ করুন। এই দৃশ্যময় জগতের নেপথ্যে বয়ে চলেছে এক শ্রুতিময় জগত। এত কাল সংগীত সাধকেরাই সেই তরঙ্গ থেকে কাব্যময় ধ্বনি রূপকে ধরে তাকেই বিশেষ বিশেষ মানসিক ভাববিহ্বলতায় স্পন্দিত করতে চেয়েছেন। শ্রুতিনাটকের নাট্যকারও প্রবেশ করেছেন সেই রাজ্যে। সেখানে যে মানবজীবনের বাণী ও নাটক এতদিন অবহেলায় অনাদরে পড়েছিল—তাকেই রূপ দেবার আকাঙ্খা তার। এ কোন ফাঁকিবাজী নয়, কোন গ্ল্যামার-সর্বস্ব অবহেলার মঞ্চায়ন নয়, এ না-পাঠ না-আবৃত্তি না-নাটকের এক হচপচও নয়? শ্রুতিনাটকের একটা বিশিষ্ট শিল্পরূপ আছে। এর অনন্ত সম্ভবনা রয়েছে। মঞ্চ-নাটক মঞ্চায়ন ব্যবস্থাব জটিলতায় পৌঁছাতে পারে না এমন অনেক ভাব, ভাবনা ও বিষয় শ্রুতিনাটকের বরণ করে নেবাব অপেক্ষায় বসে আছে। আপনাব দায়িত্ব তাকে আবিষ্কার ও উদ্ধার করে একদিকে নাট্যলোকেব অধিকাবকে বিস্তৃত কবা, অন্যদিকে শ্রুতিনাটককে সমর্যাদায় এবং স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত কবা। মনে রাখবেন শ্রুতিনাটকের জনক আপনি আর পরিচালক ও শিল্পীরা তার ধাত্রীমাতা। অর্থাৎ শ্রুতিনাটককে যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠার মূল দায় আপনাদেরই অর্থাৎ নাট্যকাবদের।

১১

শ্রুতিনাটক বিচার

শ্রুতিনাটকের জন্ম সাম্প্রতিক কালে হলেও, তা ইতঃমধ্যে এমন জনপ্রিয় হয়েছে যে, কলকাতায় ও মফঃস্বলের বহুক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। সেব প্রতিযোগিতা একই সঙ্গে শ্রুতিনাটকের ব্যাপক প্রচার ও নিয়মিত চর্চার আবহাওয়া তৈরী করেছে। কিন্তু এঁরা পরিচালনার সুবিধার জন্য একদিনে অনেক নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে গিয়ে সময় সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন মাত্র পনের মিনিট থেকে আধঘন্টার মধ্যে। শিল্পী সংখ্যা সীমাবদ্ধ করছেন, তিন থেকে পাঁচের মধ্যে। এর থেকে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের মত মানুষের মনেও ছাপ জন্মাচ্ছে যে শ্রুতিনাটক হবে স্বল্প চরিত্রের, স্বল্পসময়ের, তাতে যথাসম্ভব দৃশ্যান্তর থাকবে না আর তা হবে টানা-সংলাপ প্রধান। এ ধারণা জম্মাবার কারণ, এই সব প্রতিযোগিতায় এমন সব নাটকের চাহিদা আর এমন একটানা সংলাপের সুবিধা এই যে, নাট্যদ্বন্দ্বটা সংলাপেই এত পরিস্ফুট থাকে যে পরিচালককে বেশি চিন্তাভাবনা করতে হয় না। অল্প শক্তির পরিচালকেও সীমাবদ্ধ শক্তির শিল্পী সমাবেশে মোটামুটি মনোগ্রাহ্য নাটক পরিবেশন করে চটজলদি বাহবা পেতে পরেন। এই দিক থেকে প্রতিযোগিতাগুলি শ্রুতিনাটকের উন্নয়ণ ও বিকাশের পরিপন্থীও বটে।

আমি ব্যক্তিগত ভাবে এমন এক প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসাবে উপস্থিত হয়েই প্রথম শ্রুতি নাটকের প্রতি আকৃষ্ট ও ভাবিত হই। কয়েকজন শিল্পী তাদের কণ্ঠসাধনার ঐশ্বর্যে এবং কয়েকজন পরিচালক তাদের প্রয়োগভাবনার মহত্ত্বে আমাকে বিচালিত করেন। আমি শ্রুতিনাটক নিয়ে ভাবনা-চিন্তা শুরু করি। নাট্যপ্রতিযোগিতার প্রতি এ কারণে আমি কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞ ঐ শিল্পী ও পরিচালকদের প্রতি।

যেখানে আমি সহ-বিচারকদের সঙ্গে আলোচনা করে একটা বিচারপত্র তৈরী করে কাজ সারি। সেদিন তাছাড়া উপায়ও ছিল না। এ সব প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে এমনটাই হয়ে থাকে। কিন্তু আমি মনে পীড়িত হতে থাকি। এটা এক ধরণে অসঙ্গত। সেদিন শ্রুতিনাটক সম্পর্কেই যখন আমার বোধ স্পষ্ট নয়, তখন বিচার কিভাবে খাঁটি হবে, আর বিচারপত্রই বা কিভাবে উপযুক্ত হতে পারে? আমার মনে হয়, এ বোধ অনেক বিচারকেরই ঐ মুহূর্তে হয়ে থাকে।

কিন্তু পরবর্তী সময়ে আমরা নিত্য-কর্ম প্রবাহে এমনভাবে নিমগ্ন হয়ে যাই, যে ও বিষয়ে আর চিন্তা করবার অবকাশ পাই না। বৎসরান্তে আবার সম বিপদে পড়লে আনুশোচনা নামে। কিন্তু আবার তা ভুলতেও সময় লাগে না। একারণে এই গ্রন্থে বহু অনুধ্যানে গঠিত এক বিচারপত্রের কাঠামো সংযোজন করলাম।

আমার এই বিচারপত্র সর্বাঙ্গসুন্দর, সার্থক এমন আমার দাবী নয়। একে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতেও আমি বলবার স্পর্দ্ধা রাখি না। তবে বেশ খানিকটা চিন্তাভাবনা করে অনেক রদবদল করে আমি যে ছকটা করেছি তা কাজ চালাবার মত ছক প্রণয়নে আপনাদের সহায়তা করবে বলেই আমার বিশ্বাস। আপনাদের চিন্তায় এ ছকের ত্রুটিগুলি ধরা পড়লে, আমাকে যদি জানান এবং তা সংশোধনে আপনার পরামর্শ বা নির্দ্দেশ যদি পাঠান তবে নিশ্চয় পরবর্তী সংস্করণে আমরা আরো উন্নত বিচারপত্র তৈরী করে দিতে পাবর।

এখন, বর্তমান বিচারপত্র নিয়ে আলোচনা করা যাক।

সাধারণভাবে যে কোন প্রতিযোগিতায় তিন ধরণের বা চার ধরণের পুরস্কার দেওয়া হয়।

১. দলগত উৎকর্ষ।
২. অভিনয়গত ঔৎকর্ষ।
৩. পরিচালনগত ঔৎকর্ষ।
৪. শাব্দিক সহযোগগত ঔৎকর্ষ।

এর মধ্যে শেষ ঔৎকর্ষের জন্য পুরস্কার বেশির ভাগ নাট্যপ্রতিযোগিতায় থাকে না। থাকে প্রথম তিন রকম ঔৎকর্ষের জন্য শ্রেষ্ঠতার পুরস্কার। কোথায়ও দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুরস্কারও থাকে। অভিনয়ের জন্য কোথাও নারী পুরুষ শিল্পীভাগ করা হয়, কোথাও শিশুশিল্পীর জন্য বিশেষ পুরস্কারও থাকে। সে যাই হোক, বিচারকদের ঐ চার ঔৎকর্ষ নির্দ্ধারণের মত করে ছক তৈরী করাই ভাল। শাব্দিক সহযোগের জন্য পুরস্কার থাক বা না থাক, ভাল শ্রুতিনাটকে শাব্দিক সহযোগিতার ভূমিকা অপরিসীম। দলগত ঔৎকর্ষ বা পরিচালকের কৃতিত্ব নির্দ্ধারণে শাব্দিক সহযোগিতার বিষয়টি কোন ক্রমেই বিচারের বাইরে রাখা যায় না।

এই চতুর্বর্গ ঔৎকর্ষের বিচার একটি মাত্র ছকে হওয়া সম্ভব নয়। কারণ শাব্দিক সহযোগ বা পরিচালকের ঔৎকর্ষ কোন ক্রমেই অভিনেতা অভিনেত্রীর অভিনয়ের ঔৎকর্ষ বিচারের ক্ষেত্রে যুক্ত হতে পারে না আবার শাব্দিক সংযোগের কৃতিত্বের মধ্যে শব্দশিল্পী ও পরিচালক উভয়ের কৃতিত্ব পরিকল্পনা কার্যকর হলেও সংগ্রহ প্রয়োগ ইত্যাদির কৃতিত্ব শব্দশিল্পীরই। তা আবার

দলগত ঔৎকর্ষের অঙ্গীভূত। পরিচালকের কৃতিত্বের মধ্যে আবার এমন কতকগুলি বিষয়ে এমনভাবে এসে যায়, যা ঐ দুই পর্বের অন্তর্গত হতে পারে না। ফলে আমরা সমগ্র বিচার পরিকল্পনাকে তিনটি স্বতন্ত্র পর্যায়ে ভাগ করেছি।—যদিও এদের মধ্যে কিঞ্চিৎ সহযোগের ব্যাপারও রয়ে গেছে।

আমাদের প্রথম পর্যায়ের বিচার ব্যবস্থা অভিনেতা অভিনেত্রীর ঔৎকর্ষ নিরূপণ সম্পর্কে। শ্রুতিনাটকের শিল্পীর একটা বড় কথাই কণ্ঠস্বর। কণ্ঠস্বরকে আমরা বিচার করব তার নিয়ন্ত্রণ দক্ষতা ও চরিত্রনুগত্যের দিক থেকে। অনেক সময় একই অভিনেতা অভিনেত্রী একই সঙ্গে একাধিক চরিত্রে রূপ দেন। তখন কণ্ঠস্বরের চরম পরীক্ষা হয়ে যায়। বিচারক সে ক্ষেত্রে তাঁর চরিত্রানুগত্যের অধিক কৃতিত্ব দেবেন।

কণ্ঠস্বরের পরেই আগে উচ্চারণের কথা, উচ্চারণের দুটি দিক। শুদ্ধতা ও স্পষ্টতা। অনেক সময়েই র-ড়, শ-ষ-স, শ-ছ ইত্যাদি উচ্চারণে পার্থক্য থাকে না। নাসিক্য ধ্বনির অতিরেক বা নির্বিচারে বাতিল উচ্চারণ অশুদ্ধতার আর এক পরিচয়। অনেকেই ফলা ব্যবহারের শুদ্ধ উচ্চারণ জানেন না। আবার অনেক সময় কোন চরিত্রে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হয়। সর্বত্র সংলাপে এই অঞ্চলিকতা সমানভাবে বজায় থাকে না। এ ত্রুটির উৎস নাট্যকারের রচনার মধ্যেও থাকতে পারে। কিন্তু ফলভাগে করতে হবে অভিনেতা-অভিনেত্রীকেই। বিচারক ত' পাণ্ডুলিপি বা নাটক বিচার করবেন না। তিনি বিচার করবেন 'ফিনিসড় নাটক'। অতএব শ্রুতিনাটকে আঞ্চলিক ভাষায় অভিনয় করতে গেলে শিল্পী ও পরিচালককে সতর্ক হতে হবে।

স্পষ্টতার একটা বড় কারণই জিহ্বা ও মুখমণ্ডলের আড়ষ্টতা। আড়ষ্টতা ভাঙ্গেনি অথচ অভিনয় করতে এসেছেন, এটা শিল্পীর একান্ত নিষ্ঠাহীনতার পরিচয়। এমন শিল্পীকে নির্বাচন পরিচালকেরও অকৃতিত্বের পরিচায়ক। স্পষ্টতার জন্য প্রতি অক্ষর উচ্চারণের পরে যে অতিক্ষুদ্র স্বাভাবিক বিরতি দিতে হয়, তার অভাবেও অস্পটতা দেখা যায়। এটা অনভ্যাসের পরিচায়ক। আবার মাইকের দোষে বা মাইক ব্যবহারের দোষেও অস্পষ্টতা ঘটে থাকে। কারণ যাই থাক বিচারক অবশ্যাই স্পষ্টতার মাত্রা নির্দ্ধারণ করবেন।

তবে, অনেক সময় বার্দ্ধক্য, শৈশব বা অসুস্থতর কারণে বা নাট্যচরিত্রের বৈশিষ্ট্যের জন্য অস্পষ্টতা সৃষ্টি করা হয়। সেখানে অবশ্যাই তা অভিনেতার কৃতিত্ব বলে বিবেচিত হবে। তবে মনে রাখতে হবে যে এ অস্পষ্টতা অর্থ দুর্বোধ্যতা নয়। অভিনেতাকে এমন কৌশল সৃষ্টি করতে হবে যাতে শ্রোতা অস্পষ্টতার মধ্যেও বুঝতে অসুবিধা বোধ না করেন। এ বিষয়ে বিচারক সতর্ক থাকবেন। নাট্য-চরিত্রে প্রয়োজনের অস্পষ্টতা আর অন্য অস্পষ্টতা এক নয়। প্রথমটি অর্থ-বোধক, দ্বিতীয়টি অর্থ-রোধক।

উচ্চারণের পরেই আসবে অভিনয়ের বিচার। শ্রুতিনাটকের ক্ষেত্রে অভিনেতা-অভিনেত্রীকে কণ্ঠ-অভিনয় দ্বারা দুটি দিক ফুটিয়ে তুলতে হয়। একদিকে চরিত্রানুগত্য অন্যদিকে ভাবানুগত্য। ভাবানুগত্যে স্পন্দিত হয় সংলাপের তাৎক্ষণিকতা আর চরিত্রানুগত্যে সামগ্রিকতা। বিচারক এ দুটি দিক নিরীক্ষা করলেই তার অভিনয় ঔৎকর্ষের মান নিরূপন করতে পারবেন।

লক্ষ্য করলে বুঝবেন এগুলি বিচ্ছিন্নভাবে যে মানেই পৌঁছাক একটা সম্মিলিত সামগ্রিক রূপই শিল্পসৃষ্টির শেষ কথা। শিল্পী সমগ্র চরিত্রটি সম্পর্কে কি বোধে উত্তীর্ণ করলেন, সামগ্রিতার ক্ষেত্রে তা-ই বিচার্য হবে। অনেক সময় দেখা যায় কোন শিল্পী পূর্ব-চরিত্রে সংলাপে শেষ হবার পরেও সংলাপে শুরু করলেন না, বা আগেই শুরু করে দিলেন, বিচ্ছিন্নভাবে ভাল অভিনয় করলেও সহঅভিনেতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা হ'ল না—ইত্যাদি নানাভাবে সামগ্রিকতা ক্ষুন্ন হয়—যে সব বিষয় পূর্বসূত্র গুলির মধ্যে বিচার করা হয়নি। এখানে সে গুলিই বিচার করা হবে। অনেক সময়, পূর্ব-সূত্রগুলির বহির্ভূত এমন কিছু বাড়তি মহিমা পাওয়া যায়, যা সমগ্র চরিত্রটির ভাবমূর্তি মনে আরও প্রত্যক্ষ, আরো সজীব করে তোলে, তা এই পর্বেই মূল্য পাবে। এবং এর দ্বারাই আমরা ব্যক্তি শিল্পীর মূল্যায়ন সমাপ্ত করতে পারব।

দ্বিতীয় পার্যায়ের বিচাব হবে দলগত ঔৎকর্ষেব। দলগত ঔৎকর্ষেব একটা বড় দিক অভিনয়ের মান। এজন্য পৃথক বিচাবের প্রয়োজন নেই। পূর্বে ব্যক্তি অভিনয়ের যে মূল্যায়ন হয়েছে তার যোগফলেব গড় এখানে বসালেই তা দলগত অভিনয়ের মানে হয়ে যাবে। অর্থাৎ তাহলে—

$$\frac{\text{ব্যক্তি অভিনেতাদেব প্রাপ্ত নম্বরগুলিব যোগফল}}{\text{অভিনেতা অভিনেত্রীর সংখ্যা}}$$

(এই গড় নম্বরকে ১০০ ধরে তার ২০% গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ তার ১/৫ অংশ নেব।)

এই পর্যায়ে দ্বিতীয় সূত্র হবে শাব্দিক সংযোগের ঔৎকর্ষ বিচার। শ্রুতি-নাটকে যে দল শব্দ-সংযোগকে উপেক্ষা করেছেন, তারা শ্রুতিনাটকের বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্যকেই ধরতে পারেন নি। শ্রীচট্টোপাধ্যায় যে টানা সংলাপের নাটকের কথা বলেছেন, সে নাটকে শব্দ-সংযোগের গুরুত্ব আরো বেশি। যাই হোক, আমরা শব্দসংযোগজনকে বিচারে গুরুত্ব দেব। শ্রুতি-নাটক, মঞ্চ-নাটকের অনেক উপকরণ বর্জন করেছে একমাত্র গ্রহণ করেছে ধ্বনিসংযোগকে। তাকে বাদ দেওয়া অর্থ শ্রুতিনাটকের আঙ্গিককেই ক্ষুন্ন করা।

ধ্বনি সংযোগের দুটি দিক। (১) নাট্যঘটনার পরিবেশ গঠনের ধ্বনি (২) ভাবাত্মক আবহসঙ্গীত। ধ্বনি-সংযোগ বিচার করতে গেলে ও দু জাতীয় ব্যবহারে কোথায় কতখানি কৃতিত্ব দেখান হয়েছে তা পৃথক ভাবে বিচার

করবেন। কিন্তু 'বাঁশি'র মত নাটকে দেখা যাবে, পরিবেশ গঠনের ধ্বনিই আবহ সঙ্গীত হয়ে উঠেছে। আবার ধরা যাক 'বৃক্ষ বন্দনা'র কথা, ওখানে ব্যাঙের ডাক, গাছকাটার শব্দ, গাছের ভেঙ্গে পড়ার শব্দ ইত্যাদি শব্দকে কোন দলে ফেলা হবে? এগুলি পরিবেশগত ধ্বনি নয়। আবার ঠিক আবহ-সঙ্গীতও নয়। তবে এগুলির প্রয়োগ যথার্থের পর অনেকখানি নাট্য সাফল্য নির্ভর করছে। এ জন্যই আমরা এদিক থেকে শব্দ সংযোগকে বিভক্ত করিনি, বিচারক মনে মনে এ বিষয়ে মনে নির্দ্ধারিণ করবেন। একে আমরা নাম দিয়েছি ধ্বনির প্রকৃতি।

ধ্বনিসংযোগের প্রয়োগগত দিক আছে। উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত তীব্রতায় শব্দ সংযুক্ত হবে। তার ব্যাপ্তি কাল হবে মাপা। প্রয়োজনের সময়ে না-থাকা আর অপ্রয়োজনে থাকা—দুই-ই অপরাধ—নাটকের পক্ষে ক্ষতিকর। এ কারণে আমরা ধ্বনিকে মাত্রা ও সময়ের মাপে বিচার করব—তা কতখানি যর্থাথ হয়েছে। একে আমরা 'পরিমাপ' নামে চিহ্নিত করেছি।

এরপর 'সামগ্রিকতা' নামে একটি স্তম্ভ রাখা হয়েছে। বস্তুতঃ অভিনয় শব্দ-সংযোগাদি মিলিয়ে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়। এই সমন্বয় সাধনেই দলের সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব ধরা পড়ে।

পরিচালনের ঔৎকর্ষ বিচারের সময়েও আমরা চার পর্বে বিচার করব। পরিচালকের একটা বড় কৃতিত্ব শিল্পী নির্বাচন। শ্রুতিনাটকের শিল্পীর বিচার্য বিষয় কণ্ঠ। কণ্ঠস্বর চরিত্রানুগ হতে হবে। অনেক সময় নানা প্রতিকূলতায় উপযুক্ত কণ্ঠের শিল্পী অমিল হয়। কণ্ঠস্বর চরিত্রদ্যোতক না হলেও তা মনে নেন পরিচালক। এটা তার ত্রুতি। শিল্পনির্বাচনে পরিচালক অবশ্য সতর্ক হবেন। এ বিষয়ের পরিচালকের সাফল্য বিচার করবেন বিচারকেরা।

পরিচালক অভিনয় পরিচালনা করেছেন। স্বভাবতঃ অভিনয় ঔৎকর্ষের কৃতিত্বর একটি অংশ পরিচালকের প্রাপ্য। আমরা দলগত ঔৎকর্ষের বিচার করতে গিয়ে ব্যক্তিগত অভিনয়ের যে মূল্যায়ন করেছিলাম তার গড়কে ১০০ ধরে ২০ গ্রহণ করেছিলাম দলগত ঔৎকর্ষ বিচারের সময়। কিন্তু পরিচালন ঔৎকর্ষের বিচারের জন্য আছে মাত্র ১০ নম্বর। অতএব দলগত ঔৎকর্ষের বিচারে অভিনয়ের জন্য যে নম্বর ধরা হয়েছে তার অর্ধেক এখানে গ্রহণ করা হবে।

শব্দ-সংযোগনের পরিকল্পনাদির কৃতিত্বের অংশীদার পরিচালকও, সে জন্য পূর্বোক্ত বিচারের শাব্দিক সহযোগের স্তম্ভে যে অঙ্কপাত হয়েছে তার অর্ধেক এখানে বসান হবে।

নাট্য পরিচালনার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব সামগ্রিক সংযোজনে জন্য আমরা এখানেই গুরুত্ব দিয়েছি সবচেয়ে বেশি। এখানেই আমাদের বিচার শেষ হবে।

আবার বলি, বিচারপত্র বিচাকেরা নিজেরাই তৈরী করবেন, এই পত্রটি ঐ তৈরীতে তাঁদের সহায়তা করবে মাত্র।

শব্দ সংযোজন ঔৎকর্ষের জন্য যদি পুরস্কার থাকে তবে খ-পর্যায়ের বিচার ছক থেকেই তা পাওয়া যাবে। ঐ ছকের 'শাব্দিক-সহযোগ' স্তম্ভের মানই শব্দসংযোজন ঔৎকর্ষে পরিমান জানাবে।

প্রতিযোগিতার নাম...

নাটকের নাম.......................................নাট্যকার...
নাট্যদলের নাম ও ঠিকানা...
পরিচালকের নাম ঠিকানা...
অভিনয়ের তারিখ...........আরম্ভ......................শেষ......................মোট সময়........................

ক. অভিনেতা অভিনেত্রীর উৎকর্ষ বিচার

নাট্যচরিত্রের নাম	অভিনেতা অভিনেত্রীর নাম	কণ্ঠস্বর		উচ্চারণ		অভিনয়		সামগ্রিকতা	মোট
		নিয়ন্ত্রণ দক্ষতা ১০	চরিত্রানুগতা ১০	শুদ্ধতা ১৫	স্পষ্টতা ১৫	চরিত্রানুগতা ১৫	ভাবানুগতা ১৫	২০	১০০
*									

খ. দলগত উৎকর্ষ বিচার পরিচালন উৎকর্ষ বিচার

অভিনয়ের মান	শাব্দিক সহযোগ		সমগ্রতা	মোট
	শব্দের প্রকৃতি	পরিমাণ		
২০	২০	২০	৪০	১০০

গ. পরিচালন উৎকর্ষ বিচার

পরিচালকের নাম	শিল্পী নির্বাচন	অভিনয় মান	শাব্দিক পরিকল্পনা	সামগ্রিকতা	মোট
	২০	২০	২০	৪০	১০০

* চিহ্নিত অংশ প্রয়োজন মত বড় করে নেবেন

শ্রুতিনাটক-কোষ

দ্বিতীয় পর্ব

নাট্য-সংকলন

বৃক্ষ-বন্দনা

[বিজ্ঞান-বিষয়ক নাটক]

চরিত্র লিপি —ঘোষক, জেলাশাসক, প্রতিবাদীকণ্ঠ, কাঠুরে, মেঘ, বায়ু, বৃক্ষদেবতা, তিনজন ক্লোরোফিল, ব্যাঙ।

ঘোষক—কয়েক শতাব্দীর প্রাচীন এক শহর। তারই এক চৌরাস্তার মাঝে দাঁড়িয়েছিল এক প্রাচীন বটগাছ। সেখানে হয়ত' প্রাচীন বৃদ্ধেরা বসাতেন তাদের আসব, শত শত পাখির কলকাকলিতে মুখর হত পরিমণ্ডল। *(পাখির কাকলি)* হয়ত ফুটে উঠত এক তপোবনের পরিবেশ। হয়ত পুরনারীরা বৃক্ষদেবতার বন্দনা করত। *(উলুধ্বনি ও কাঁসর ঘণ্টার শব্দ : মৃদুভাবে)*

কিন্তু আজ শহর বেড়েছে, দশগুণ। বিশাল বিশাল বাগান-গুলো কাটা পড়েছে। চাষেব মাঠ অন্তর্হিত হয়েছে। চতুর্দ্দিকে গড়ে উঠেছে অট্টালিকা। যান-বাহনেব যাতায়াতে *(বাস-লড়ি ইত্যাদিব শব্দ)*, আইন আদালত, হাটবাজার স্কুল-কলেজ হাসপাতাল—আধুনিক সভ্যতা সর্বত্র পক্ষ বিস্তার করেছে। *(নানা বকম শব্দে শহর জীবনের আভাস।)* এই সভ্যতাকে অবাধ করতে রাস্তা বড় কবতেই হবে। অতএব জেলাশাসক সিদ্ধান্ত নিলেন ইতিহাসের সাক্ষ্য ঐ প্রাচীন নোংরা বটগাছকে সরে যেতে হবে।

জেলাশাসক—না। কোন আপত্তি নয়। ও গাছকে কেটে ফেলতেই হবে।

প্রতিবাদী কণ্ঠ—কিন্তু আপনাবাই যে বৃক্ষবোপন উৎসব করছেন। বলছেন, একটি গাছ, একটি প্রাণ। সেই আপনারাই—

জেলাশাসক—কিন্তু তাই বলে রাস্তা প্রশস্ত করতেও গাছ কাটা যাবে না।

প্রতিবাদী কণ্ঠ—গাছ ও সবুজ ত' শহরের শোভা!

জেলাশাসক—আমবাও শোভার আয়োজন করব। ঐখানে বসাব ফোয়ারা। বহু আলোর ঝাড় জ্বালাব রাত্রে। শহর ঝলমল করবে।

প্রতিবাদী কণ্ঠ—প্রাচীন গাছ শীতলতা ছড়ায়। শান্তি—

জেলাশাসক—রাস্তা বড় করবার প্রয়োজন আরো বেশি।

ঘোষক—অতএব এলো কাঠুরিয়ার দল। বৃক্ষদেবতার পাদমূলে পড়ল কুড়োলের কোপ *(কাঠ-কাটবার শব্দ)* কিন্তু হার মানল তারা।

কাঠুরে—পারলাম নে বাবুমশাই। ই গাছ কাটা আমাদের কম্মো নয়। কুড়ুলির কোপ দিলাম ত কুড়ুল ফিরি এল।

জেলাশাসক—তোমরা না পারলে যাও। কিন্তু কাজ আমাদের থামবে না।

ঘোষক—জেলাশাসক আনালেন বুলডজার। মত্ত হাতির মত ক্রুদ্ধ গতিতে ডজার আঘাত হানতে থাকল গাছের গায়। বার বার (*গাছের গায়ে বুলডজারের আঘাতের শব্দ*) শেষে এক সময়ে পরাজয় মানল প্রাচীন বট। মর মর শব্দে গাছ উপড়ে পড়ল। (*গাছ ভেঙ্গে পড়ার মর মর শব্দ*)। শহরের লোক দল বেঁধে দেখতে এল এতদিনের শহর-সহচর ঐ বৃদ্ধ বৃক্ষের ভূমিশয্যা গ্রহণের করুণ দৃশ্য। শহরের স্কুলের এক উঁচু শ্রেণীর ছাত্রী সোমাও বাবার সঙ্গে দেখতে এলো।

সোমা—বাবা! বাবা! বাড়ি চল। বাড়ি চল। এ আমার ভাল লাগছে না।

বাবা —কেন সোমা।

সোমা—বড় করুণ লাগছে বাবা! মনে হচ্ছে গাছটাকে সকলে মিলে খুন করেছে। গাছটা যেন আর্তনাদ করছে। ঐ দেখ একটা ছেঁড়া মোটা শেকড় থেকে রক্তের মত কেমন ফোটায় ফোটায় রস পড়ছে।

বাবা—চল, ফিরে যাই।

(দৃশ্যান্তর সূচক বাজনা)

ঘোষক—সোমা বাড়ি ফিরে এল। কিন্তু শরশয্যায় শুয়ে থাকা ভীষ্মের মত যন্ত্রণায় ছটফটই করল। গাছটার ছবি সে কিছুতে ভুলতে পারল না। পড়াশুনা হল না। গাছের কথা ভাবতে ভাবতেই শুয়ে পড়ল সে। আর ঘুমের মধ্যেই শুনতে পেল—

(*স্বপ্ন সূচক মৃদু টুং-টাং শব্দ*)

বৃক্ষদেব—সোমা। সোমা।

সোমা—কে? কে তুমি?

বৃক্ষদেব—আমি বৃক্ষদেবতা। আজ বিকেলে আমারই কান্নায় বিচলিত হয়েছিলে তুমি। ওখানে শহরের কত লোকই ছিল। আর কেউ বিচলিত হয়নি। সকলেই বাড়ি গিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। অথচ এই বৃক্ষকুলের শক্তিতেই বেঁচে আছে সমস্ত জীবজগত।

সোমা—আমার প্রণাম গ্রহণ করুন বৃক্ষদেব। কিন্তু বৃক্ষকুলের শক্তিতে জীব-জগত বেঁচে আছে, একি কথা আপনি বললেন! আমি ত জানি সমস্ত শক্তির উৎস সূর্য।

বৃক্ষদেব—সূর্যদেবকে নমস্কার। কিন্তু সোমা! সূর্য শক্তিকে দেহে ধারণ করবার সামর্থ্য কি কোন জীবের আছে? আমরা, গাছেরাই নানাভাবে সূর্যর তাপ-

আলো ইত্যাদি শক্তিকে নানা আকারে ধরে রাখি। তাতেই ডাকাতি করে বাঁচে জীবকুল।

সোমা! এসো, তোমাকে সেই জগত রহস্যের অন্তঃপুরে নিয়ে যাই।

(দৃশ্যান্তর সূচক বাজনা)

(কর্মব্যস্ততার শব্দ)

সমবেত কণ্ঠ—হেই হেইও ... হেই হেইও। টান জোরে টান, তোল শুধু তোল, যা রে যা-আ-আ— শিরা বেয়ে যা — নালি বেয়ে যা — হেই হেইও- - হেই হেইও। *(শব্দ মৃদুভাবে চলতে থাকে)*

সোমা—এ কোথায় এলাম বৃক্ষদেব। এ কি কোন খনিগর্ভ। ওরা কি টেনে তুলছে বৃক্ষদেব। কি করছে ওরা?

বৃক্ষদেব—ওরা গাছের শেকড়ের দল। মাটির তলায় অন্ধকারে ভূমিগর্ভ থেকে রস দোহন করে ওরা সেই রস তুলে রসবাহী শিরা ও উপশিরায় পাঠিয়ে দিচ্ছে। ওগুলো এখন চলে যাবে পাতায়।

সোমা—পাতায়! পাতায় কেন?

বৃক্ষদেব—পাতাই যে গাছের রান্না ঘর। চল সে খানে যাই।

(দৃশ্যান্তরের বাজনা)

(বাটনা বাটা ও রান্না ছাঁক্ ছোঁক্ শব্দ চলবে)

(গান)

আমরা, জগৎসেরা রাধুনী
দিনভর খাটুনি
বিশ্রাম শুধু রাতে
হাতে হাত লাগাও ও ভাই
কাজ কর এক সাথে।

(গান ও শব্দ চলতে থাকে কিন্তু মৃদু হয়।)

সোমা—ও কারা গান গাইছে বৃক্ষদেব।

বৃক্ষদেব—ওদের কেউ বলে পত্র-হরিৎ। তোমাদের বিজ্ঞানীরা বলে-

সোমা—ক্লোরোফিল?

বৃক্ষদেব—হ্যাঁ

সোমা-কিন্তু ক্লোরোফিলরা ত' সবুজ—এরা যে কেউ হলুদ, কেউ নীল, কেউ লাল কেউ বা কালচে-সবুজ---

ক্লোরোফিল(১)-আমরা এই নীল আর সবুজ ক্লোবোফিলেরাই প্রধান রাঁধুনী। গাছের খাবার তৈরীর প্রধান কাজটা আমরাই করি। বড় খাটুনির কাজ। খাটতে খাটতেই আমাদের এমন রং হয়ে গেছে।

ক্লোরোফিল(২)-এই যে আমরা কমলা আর হলুদেরা জলের অণুভেঙ্গে রান্নার কাজে সাহায্য করি।

ক্লোরোফিল(৩)-আমরা জ্যান্থোফিল।

ক্লোরোফিল(২)-বলতে পার আমাদের কাজ বাটনদারের কাজ। আমরা বাটনা বাটি।

ক্লোরোফিল(২)-রস এসে গেছে, রস এসে গেছে---

(হেই হেই ও, হেই হেইও শব্দ এগিয়ে আসে)

ক্লোরোফিল(১)-নীল সবুজেরা প্রস্তুত হও। লাল হলুদেরা কাজে লেগে দাও।

(দ্রুত বাটনা বাটার শব্দ)

(একটার পর একটা স্টোমা খুলবার শব্দ)

সোমা— ও বাবা! ও গুলো আবার কি? ও দিকটায় এ গুলো কিসের হাঁ দেখা যাচ্ছে বৃক্ষদেব!

বৃক্ষদেব—(হেসে) ভয় পেও না সোমা। এ গুলো হচ্ছে গাছের রান্না ঘরের জানালা। আমরা পাতার ভেতরে আছি দেখে বুঝছি না। ঐ জানলাগুলো থাকে পাতার নিচের দিকে। ওদের বলে স্টোমা। স্টোমার দিকে আলো পড়ে না।

সোমা—স্টোমাগুলো খোলা হ'ল কেন?

বৃক্ষদেব—ঐ হাঁয়ের ভেতর দিয়ে পাতার বাতাস ঢুকবে। যা থেকে গাছ পাবে কার্বন-ডাই-অক্সাইড। ও না হলে গাছ রান্নাই করতে পারে না। চল অন্য দিকে যাই।

(দৃশ্যান্তরের বাজনা)

(গান)

দ্বার খোল, খোল দ্বার
এসেছি আলোক বালা।
এনেছি কিরণ মালা—
দূর হয়েছে অন্ধকার।।

সোমা—ওমা! এরা কিরণমালার দল। কি সুন্দর সেজেছে ওরা।-- নানা জনের নানা বর্ণ। ওমা! এযে দেখছি সাত রং — সেই বেনীআসহকলা — বেগুনী, নীল, আকাশী, সবুজ, হলুদ, কমলা আর লাল।---আরে আরে। সূর্যদেব! গাছের পাতা শুধু লাল আর নীলদের ঢুকতে দিচ্ছে, অন্যদের ঢুকতে দিচ্ছে না কেন? এখানেও বর্ণ-বিদ্বেষ আছে না কি?

বৃক্ষদেব—গাছের রান্নায় শুধু ওদেরই দরকার হয়। বেগুনী আকাশী, সবুজ হলুদ বা কমলার দরকার নেই। তাই ওরা বাইরে থাকে। ঐ দেখ, রান্না

ঘরে সকলে কর্মব্যস্ত হয়ে গেছে। চল, গাছ কি রান্না করে তা দেখিয়ে আনি।

(দৃশ্যান্তরের বাজনা)

সোমা—উঃ হু হু হু। এ কোথায় আনলে বৃক্ষদেব! শীতে যে মরে যাচ্ছি। চারিদিকে সাদা সাদা---তুমি নিশ্চয় আমাকে হিমালয়ে এনেছ। এগুলি সব বরফে ঢাকা পাহাড়।

বৃক্ষদেব—হাঃ হাঃ হাঃ

সোমা—হাসছ কেন বৃক্ষদেব! আমি কি ভুল বললাম। একি পাহাড় নয়!

বৃক্ষদেব—না সোমা। তুমি দাঁড়িয়ে আছে একটা আলুর মধ্যে। এই হচ্ছে গাছের তৈরী খাবার — সঞ্চয় করা আছে গাছের হিমঘরে। অসময়ে ব্যবহার করবার জন্য। কিন্তু মানুষ গাছের সেই সঞ্চয়কে তুলে নিয়ে নিজে ব্যবহার করে। এই সঞ্চয়ের নাম শ্বেতসার— গ্লুকোজ। বুঝলে, কেমন করে সূর্যের শক্তি গাছেরা প্রাণীকুলকে যোগান দেয়! চল, অন্যত্র যাই।

(দৃশ্যান্তরের বাজনা)

(পাখির ডাক। নদীর কুল কুল শব্দ)

সোমা—কি সুন্দর দৃশ্য। নদীটা কুল কুল করে বইছে। ধান গাছ গুলো হাওয়ায় দুলছে। কত পাখি আর কত প্রজাপতি। ও মা! ও গুলো কি বৃক্ষদেব.

বৃক্ষদেব—ওগুলো গঙ্গাফড়িং। কেমন লাফিয়ে চলছে। ও কি খাচ্ছে দেখত সোমা!

সোমা—ঘাস।

বৃক্ষদেব—হ্যাঁ। ঐ ঘাসের ভেতর দিয়ে বৃক্ষ জগতের তৈরী খাবার ওর দেহে চলে যাচ্ছে। এবার চল, ও দিকে যাওয়া যাক। দেখ, দেখ, ওটা কি?

সোমা—ও মা! ও যে মস্ত বড় কোলা-ব্যাঙ।

ব্যাঙ—চুপ! চুপ কর। সারা দিন আমার খাওয়া হয় নি। কথা বলে আমার শিকার ফসকে দিও না।

(লাফ দেওয়া ও হুটোপটির শব্দ)

সোমা—(আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠে) এই গঙ্গা ফড়িংটাকে খেয়ে ফেলল ব্যাঙটা। কি নিষ্ঠুর---

বৃক্ষদেব—দেখলে, কেমন করে সূর্যের শক্তি গাছের তৈরী খাবার ঘাস থেকে গঙ্গাফড়িং হয়ে ব্যাঙের দেহে চলে গেল।

ব্যাঙ—ও বাব্বা। গেছি গেছি--

(লাফ দেওয়া ও হুটোপটির শব্দ)

সোমা—ইস। দেখেছ। একটা সাপ তাড়া করেছে ব্যাঙকে। আহারে! খেয়ে ফেলল ব্যাঙটাকে।

বৃক্ষদেব—এমনি করে গাছের খাবার কোথাও সরাসরি কোথাও অন্যের মাধ্যমে চলে যাচ্ছে জীব থেকে জীবে।

(দৃশ্যান্তরের বাজনা)

(কয়লা খাদের দৃশ্য। কয়লা কাটা, চার্জিং, ট্রলি যাওয়া ইত্যাদি শব্দ লিফট নামছে)

সোমা—এবার নিশ্চয় সত্যি সত্যি কয়লা খাদে এসেছি বৃক্ষদেব।

বৃক্ষদেব—হ্যাঁ। ঐ যে কয়লা কাটা হচ্ছে, ঐ কয়লাই চলে যাবে গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে। ঐ কয়লা জ্বলবে। রান্না হবে তোমাদের খাবার। জাহাজ চলবে, চলবে রেল। চলবে অনেক কারখানা। কিন্তু কয়লা কিভাবে তৈরী হয় সোমা। (লিফট ওঠার শব্দ)

সোমা—জানি। গাছের দেহ মাটিতে চাপা পড়ে বহু বহু বৎসর পরে ক্রমে--

বৃক্ষদেব—হ্যাঁ। ঐ কয়লার মধ্যেই আমরা সূর্যের তাপ শক্তিকে এমনি করেই লুকিয়ে রাখি। (লিফট থামে)

(ওরা যেন পথে এসেছে। গাড়ি এগিয়ে আসার শব্দ শোনা যায়)

বৃক্ষদেব—সরে এসো, সরে এসো সোমা। ঐ দেখ ম্যানেজার সাহেব মোটরে করে গেলেন। *(গাড়ির শব্দ ওদের পার হয়ে দূরে মিশিয়ে যায়)* সরে না এলে চাপাই দিয়ে যেতেন। যেন ধরাকে সরা জ্ঞান করছেন। কিন্তু মটর চলছে কিসের জোরে!

সোমা—কেন পেট্রলে। পেট্রলও কি তোমরা তৈরী কর!

বৃক্ষদেব—বললে তুমি হয়ত ভাববে আমি গর্ব প্রকাশ করছি।

সোমা—না। তা আর বলব না। তুমি আমার চোখ খুলে দিয়েছ। আমি বুঝেছি সব শক্তির উৎস সূর্য হলেও তার শক্তিকে আত্মস্থ করবার ক্ষমতা জীবের নেই। তোমরাই তাকে ব্যবহারযোগ্য করে দিচ্ছ।

বৃক্ষদেব—হ্যাঁ। আর কার্বন-ডাই-অক্সাইড টেনে নিয়ে বাতাসকে নির্মল করে তা প্রশ্বাসের উপযোগীও করে দিচ্ছি আমরাই।

সোমা—জানি বৃক্ষদেব। আমি ত' তাই ঐ গাছ কাটা দেখে অত--একি বৃক্ষদেব! কোথায় তুমি! বৃক্ষদেব---বৃক্ষদেব!

(দৃশ্যান্তরের বাজনা)

বাবা—সোমা! সোমা! কি চিৎকার করছ। তুমি কি স্বপ্ন দেখছিলে?

সোমা—*(অভিভূতের মত)* স্বপ্ন! হয়ত' স্বপ্নই। কিন্তু কি দেখলাম জান! স্বয়ং বৃক্ষদেব এসে আমায় বুঝিয়ে দিলেন কেমন করে সূর্যের নানা শক্তিকে গাছেরা শোষণ করে সারা জীব জগতকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

বাবা—হ্যাঁ মা সোমা। সালোকসংশ্লেষের ফলে গাছ যে গ্লুকোজ তৈরী করে,

তাকেই নানাভাবে গ্রহণ করে প্রাণীজগত। আবার কার্বন-ডাই-অক্সাইড টেনে নিয়েও পৃথিবীকে প্রাণীদের উপযোগী করে রাখে গাছেরাই। এ জন্যই গাছ কাটা অন্যায়। একটি গাছ প্রয়োজন কাটলে অন্ততঃ দুটি গাছ লাগান উচিত। নইলে পৃথিবী একদিন জীবকুলের বাসের অযোগ্য হয়ে উঠবে। কাকে প্রণাম করছ সোমা।

সোমা—বৃক্ষদেবকে প্রণাম করছি বাবা।

বাঁশি

(অজিত দাসের সমনামের গল্প অবলম্বনে)

চরিত্রাবলী- আমি, রাখালবালক, বালক আমি, বাবা, মা, ঠাকুমা, বৌদি, ভূমিপতি, নিবারণ, মাঝি, মাঝি।

(মোটো সুরে বাঁশেব বাঁশি বাজছে। আমির কথার মাঝে ধীরে ধীরে বাঁশির সুর মিলিয়ে যাবে।)

আমি—বাঁশের বাঁশি। বরাবরই বাঁশির ওপর আমার লোভ ছিল। বাল্য কালে কৈশোরে দেখতাম পাড়ার গরু চড়ানো রাখাল ছেলেরাই ওই বাঁশি বাজাত। খেয়েদেয়ে গরুপালের পিছনে এক হাতে পাঁচন আর এক হাতে ওই বাঁশি নিয়ে ওরা মাঠে যেত। দুপুর বেলা। ফাঁকা মাঠ। খাঁ খাঁ রদ্দুর। গরুগুলো ছড়িয়ে ছিটেয়ে শুকনো মরা ঘাস খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। তখন কোন গাছের ছায়ায় বসে ওরা ওই বাঁশি বাজাত। সে প্রাণ মাতানো সুর শুনলেই মন কেমন উদাস, বৈরাগী হয়ে যেত। আমি মোহিত হয়ে শুনতাম। বড়লোভ জাগত ওই বাঁশি বাজাতে।

পাড়ার ওই রাখাল ছেলেরা তখন সবই আমার বন্ধু —সমবয়সী। তাদেব বাঁশি নিয়ে আমি বাজাতে চেষ্টা করতাম।

রাখাল বালক—কি রে! ইসকুল থেকে পালিয়ে এলি।

বালক আমি—ধ্যাৎ। পালাব কেন? কাল থেকে ইশকুলে ছুটি শুরু হয়েছে না।

রাখাল বালক—তা, অত ছুটে এলি কেন?

বালক আমি—বাঁশি শুনব বলে। বাজা না বাঁশি। থামালি কেন?

রাখাল বালক- অনেকখন বাজিয়েছি। বাঁশির বাজনা ভালবাসিস। নিজে বাজাতে শেখ না! এই নে। বাজা!

(আনাড়ি ভাবে এলোমেলো ফুঁয়ে বাঁশি বাজে। বাখাল বালক হা হা কবে হাসতে থাকে)

বালক আমি—পারছি না।

রাখাল বালক—কোন কাজই সহজ নয়। অনেক অভ্যাস করতে হয়। শিখতে হয় সুর। আচ্ছা, যা তোকে এ বাঁশিটা দিয়ে দিলাম। বাড়িতে বাজাতে চেষ্টা করিস।---আমি! আর একটা বানিয়ে নেব।

আমি—কিন্তু বাঁশি দেখেই বাবা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন।

বাবা—তোর হাতে ওটা কি রে। বাঁশি। কি হবে? বাজাবি। হ'ল। পড়াশুনো মাথায় উঠল। এখন বাঁশি বাজান। বাঁশি বাজিয়ে পেটের ভাত হবে?

মা—ও কি ভদ্দরলোকের জিনিষ। যারা গরু চড়ায় তারা বাজায়। কেষ্ট ঠাকুর গরু চড়াত, সেও বাজাত।

ঠাকুমা—ও এনেছিস কেন? ফেলে দে, ফেলে দে। রাতে কখনও বাজাসনে।

বাবা—হতভাগা। বাঁদর। *(বাঁশি ভাঙ্গা এবং মারের শব্দ)*

আমি—আমার বাঁশি বাজান শেখা আর হ'ল না। তারপর দেশত্যাগের পালা। কে কোথায় হারিয়ে গেল। হারিয়ে গেল রাখাল বন্ধুরা। হারিয়ে গেল গ্রাম। আমরা এলাম শহরে। এর পঁচিশ বছর পর আবার এক গ্রামে এলাম। *(পাখির ডাক)* আমার এক সম্পর্কিত বোনের পাড়িতে। *(বাছুরের হাম্বা রব)*

বোন, ভগ্নিপতি—আসুন, আসুন দাদা।

বোন—উঃ কত বছর পরে তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল দাদা।

আমি—(হেসে) পঁচিশ বছর। কতটুকু ছিলি তুই। উঃ কত বড় হয়েছিস।

বোন—বাঃ হব না। বয়স ত' ত্রিশের ওপরে হ'ল। তায় এত বড় সংসারের গিন্নী।

ভগ্নিপতি—এখানে কিন্তু আপনার কষ্ট হবে দাদা। আমাদের চাষী পরিবার। চাষীর বাড়ি, মাটির দেওয়ালে টালির চালার ঘর।

বোন—হ্যাঁ দাদা। একেবারে চাষীর বাড়ি। গরু-বাছুর, লাঙ্গল কিষাণ ধানের গোলা।

আমি—হ্যাঁ। একেবারে খাঁটি বাঙলা দেশ।

(তিনজন হেসে ওঠে।)

(দৃশ্যান্তর সূচক বাজনা)

(ঝরঝর করে বৃষ্টি ঝরার শব্দ)

বোন—দাদা উঠেছ।

আমি—উঠেছি অনেক আগে। জানালা দিয়ে বৃষ্টি পড়া দেখছিলাম। চতুর্দ্দিকে প্রচুর জল জমেছে।

বোন—বর্ষায় গ্রাম জলেকাদায় থৈ থৈ করে। একটু যে ঘুরবে ফিরবে তার উপায় নেই। থাক বাড়িতে বসে। মন খারাপ হ'লত'।

আমি—(হেসে) ভেবেছিলাম খুব ঘুরব মাঠে মাঠে তা প্রকৃতি বাদ সাধল। বিশ্রাম ছাড়া পথ নেই।

(বৃষ্টির শব্দ বাড়ে। তার সঙ্গে শুরু হয় সময় কেটে যাওয়া বোঝাতে শব্দ)

(দৃশ্যান্তর)

বোন—দাদা। বৃষ্টি ঝরেছে। তুমি বারান্দার এসে বসো না।

আমি—তা মন্দ হয় না।

(মা বলে ডেকে নিবারণ ঢোকে)

বোন—মাঠ থেকে ফিরলি নিবারণ। রাখ রাখ উঠোনেই রাখ ঘাসের বোঝা। --- আবার টোঙ্গে ঢুকলি কেন?--অ্যা। দেখ, আবার ডাণ্ডা হাত বেরুল।

আমি—কি রে ওটা নিবারণ! বাঁশি? বাজাতে পারিস্।

নিবারণ—হুঁ-উ-উ।

আমি—বাজাত!

বোন—কি?

আমি—ও আমাকে বাঁশি বাজিয়ে শোনাক। কি বলিস।

বোন—ওই কাজেই ওস্তাদ। কাজ না করে ঐ সব করতে পেলে বেঁচে যায়।

আমি—(হেসে) ভালই ৩'। ওতো গুণের জিনিষ। আর এ বয়সে বাঁশি বাজান ছাড়া কি করবে। এ কি ওব কাজ করার বয়স।

বোন—তার জন্য ঘরে ভাত থাকা দরকার। এক পাল ভাই বোন, বাপ খেতে দিতে পারে না। জাল টেনে বেড়ায় খালে বিলে।

আমি—জেলে নাকি?

বোন—হ্যাঁ, মালো।

আমি—ছেলেকে জালের কাজে নেয়নি?

বোন—কটাকে নেবে? উতে কি পেটের ভাত হয়? ওর বাবা এসে হাতে পায়ে ধরে কান্নাকাটি করতে থাকল। খেতে পায় না, নিন, রাখুন। দুবেলা তো খেতে পাবে। জন্মেছে, এখন কি কবা যাবে? যেমন কপাল নিয়ে এসেছে।---এই নিবারণ, বাঁশি পরে বাজাস। স্নান করেছিস?

নিবারণ—না।

বোন—যা। স্নান করে আয়। আমি কি ভাত নিয়ে বসে থাকব! বাঁশিতেই পেট ভরবে!

আমি—নিবারণ। বাঁশিটা আ'াব হাতে দে। যা, তুই স্নান কবে আয়।

(সময়ান্তরের বাজনা)

আমি—স্নান করে ফিরল নিবারণ। তার টোঙের মত ঘর থেকে একটা কালো ইজের পরে এসে আমার কাছ থেকে বাঁশিটা নিল। বললাম, এখন বাজাবি নাকি? ও হাসল। বললাম, আগে ভাত খেয়ে আয়। ও বাঁশি হাতেই রান্না ঘরের দিকে যেতে থাকল। এমন সময় বাড়ি ফিরলেন ভগ্নিপতি।

ভগ্নিপতি—এই হারামজাদা। গোয়ালে আর একটা মোষ কই!

নিবারণ—সে এলো না।

ভগ্নিপতি—এলো না! এলো না মানে: মোষ এলো না আর তুমি বাড়ি এলে? শালা ভাত খাবার বেলা খুব মনে থাকে! ভাত অমনি হয়! তোমাকে

মাগুনা ভাত দিচ্ছি। ভাত সস্তা। দুবেলায় এক কেজি চালের ভাত মারছ। তোর বাপকে শুধোগে এ খেরাকীর দাম কত। মোষ আনলি নে কেন?

নিবারণ—এলো না ও। আমি কি করব!

ভগ্নিপতি—তুমি কি করবা! তোমাকে পুষছি কেন রে শা-আলা! লাথিয়ে মুখ ভেঙ্গে দেব। যা মোষ নিয়ে আয় শিগ্‌গির।

নিবারণ—মোষ ওপারে চলে গেছে।

ভগ্নিপতি—ওপারে! মোষ ওপারে চলে গেছে? তুই কোথায় ছিলি? কি করছিলি?

নিবারণ—আমি আটকাতে গেলাম, আমাকে ঢুঁষিয়ে ফেলে দিয়ে জলে নেমে পড়ল। কত ডাকলাম। সে স্রোত ঠেলে ওপারে চলে গেল।

ভগ্নিপতি—চলে গেল আর তুমি ভাত মারতে বাড়ি চলে এলে! তোমার ভাত হ'ল আগে আর যার জন্য ভাত তার কোন দাম নেই! বলি, তুই মোষ ছেড়ে এলি কেন? হাজার টাকা দাম মোষের। দেবে তোর বাপ? তোদের গুষ্টি বেচলেও এত টাকা উঠবে ! শালা, ছোটলোকের উপকার করতে আছে? তখন এসে হাতে পায়ে ধরল, খাওয়াতে পারছি না, ছেলেটাকে আপনার পায়ে রাখুন। আবার মাসে পনের টাকা মাইনে। মাস না যেতে বাপ এসে দাঁত যার করে দাঁড়াবে। টাকাটা দেন। টাকা—আজ টাকার শোধ তুলব। দাঁড়া!---এ্যাঁ! বাঁশীওয়ালা কেষ্ট ঠাকুর। বাপের সঙ্গে নৌকো ঠেলতে পারনি। আমার সর্বনাশ করতে আসা। ফেল বাঁশি! ফেল!

আমি—ভগ্নিপতি ওকে মারলেন। বাবাও আমাকে অমনি চড় মেরেছিলেন। আমি বাঁশি ফেলে দিয়েছিলাম — নিবারণ কিন্তু ফেলল না। বুকে চেপে ধরল। ভগ্নিপতি আবার ফুঁসে উঠলেন।

ভগ্নিপতি—যেখান থেকে পার মোষ নিয়ে এসো। মোষ না আনলে তোমার একদিন কি আমার একদিন!--যা শিগগির, যা শালা—

বোন—না। খেয়ে যাক।

ভগ্নিপতি—না খেতে হবে না। মোষ না আনলে এ বাড়িতে ভাত নেই।

বোন—নিবারণ ভাত খেয়ে যা। আমি খাবার আগলে বসে থাকতে পারব না। খেয়ে আমাকে উদ্ধার করে যাও।

ভগ্নিপতি—*(চরম ক্রোধে চেঁচিয়ে)* তুমিই ওকে মাথায় তুলছ আস্কারা দিয়ে দিয়ে।

বোন—*(গম্ভীর ভাবে)* তুমি চেঁচিও না অমনি করে। ওকে দিলে কেন মোষ চড়াতে? সামলাতে পারে ও। গিয়েছে বেশ হয়েছে। তোমারই ত' দোষ। এই, আয়, খেয়ে যা শিগগিরি।

আমি—নিবারণ খেতে গেল। ভগ্নিপতি গজ গজ করতে থাকলেন। নিবারণ

খেয়ে উঠে নীরবে নতমস্তকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল বাঁশি হাতে নিয়েই। একটু পরে ভগ্নিপতিও বেরিয়ে গেলেন।

আমি সমস্ত ঘটনা ভাবতে থাকলাম। বারবার মনে হতে থাকল, বাঁশি বাজাতে গেলে ঘরে ভাত থাকা দরকার।

(সময়ান্তর বোধক বাজনা)

(ঝির ঝিরে বৃষ্টির বাজনা)

আমি—আবার বৃষ্টি শুরু হ'ল। সাংসারিক কাজ সেরে বোন এসে পাশে বসল। গল্প করতে থাকল। ঘর-সংসারের কথা। দিনকাল কেমন হয়েছে চাষের কি কি অসুবিধা। রাখাল কিষেনের ব্যবহার কেমন। মিষ্টি কথায়, ভালো ব্যবহারে কোন কাজই হয় না। বকতেও কেমন লাগে। কিন্তু কাজ হবে না, না বকলে। একটা মোষ যদি হারায়, কতো ক্ষতি, আমি বললাম, হারাবে কেন?

বোন—নদীর ওপারে চলে গিয়েছে বলছে। কোথায় কোন দিকে চলে যাবে কে ধরে নেবে—এখন বর্ষার ভরা নদী পার হতে গিয়ে স্রোতের টানে ভেসেও যেতে পারে। দোষ নিবারণেরই।

আমি—কেন?

বোন—নদীর ধারে মোষ নিল কেন? জল দেখা মোষকে কি আটকান যায়! বড় মানুষেই পারে না তা ওকি করবে!

আমি—নিবারণ গেল কোথায়?

বোন—খুঁজতে। তবে মনে হয় মোষ এপারেই আছে। খুঁজে পায়নি চলে এসেছে। পেট নিয়ে মরে। শুধু খাই খাই। বাড়িতে ত' খেতে পেত না। খেতে চাইলে মা মারত, তাড়িয়ে দিত। বাপ একদিন মেরে অজ্ঞান করে দিয়ে গেল।---ঘরের ধানের ভাত, তাই। কিনে খাওয়াতে হলে আর পারা যেত না।

(বৃষ্টির শব্দে কথা চাপা পড়ে গেল)

(সময়ান্তর। কিন্তু বাজনা হবে না।)

(বৃষ্টির শব্দ মিলিয়ে গেল। মৃদু ঝড়ের আওয়াজ। ব্যাঙ ডাকার শব্দ। দুর্যোগের আভাস।)

আমি—সন্ধ্যা হয়েছে। দুর্যোগময়ী সন্ধ্যা। নিবারণ তখনও ফেরেনি।

ভগ্নিপতি —ছোঁড়া ফেরেনি?

বোন—না।

ভগ্নিপতি —এখনও ফেরে নি।

বোন—না।

ভগ্নিপতি—জ্বালিয়ে খেলে দেখছি।

বোন—পরের ছেলে। কিছু হলে তখন আবার বিপদ।

ভগ্নিপতি —ওসব রাখাই ভুল। আর রাখব না - কালই তাড়াব।

বোন—এখন কি হ'ল তাই দেখ। রাত হয়ে গেল— এখনও ফিরল না। বর্ষা কাল। সাপ-কোপে যদি খায়, কি কোন বিপদ হয়। একবার খুঁজে দেখ।

ভগ্নিপতি —কোথায় খুঁজবে।!

বোন—তা আমি কি করে বলব। খুঁজতে তো হবে।

ভগ্নিপতি—শালার ছেলে। জ্বালিয়ে খেলে। এই বৃষ্টি-ঝড় তা বাড়ি ফেরার নাম নেই। মোষ না পাস বাড়ি ফিরে আয়।

বোন—কেমন করে ফিরবে! তুমিই ত বলেছ, মোষ নিয়ে তবে ফিরতে হবে।

ভগ্নিপতি—হুঁ। সে কথায় কি কান দিয়েছে? কথায় কান দেয়?

বোন—তোমারই ত' দোষ। ছেলেটাকে তাড়িয়ে পাঠালে। এখন কিছু হলে কেউ ছাড়বে নাকি! খুনের দায়ে ফেলবে।

ভগ্নিপতি—*(উত্তেজিত ভাবে)* সে কি ধরো-লক্ষণ! তার বুদ্ধি নেই। মোষ পেলিনে তুই চলে আয়। পরের ছেলে নিয়ে বড় জ্বালা।--দাও, ছাতা আর টর্চ-টা দাও।

আমি—কোথায় যাবেন?

ভগ্নিপতি—যাই, খুঁজে দেখে আসি। পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

আমি—চলুন, আমিও যাব।

ভগ্নিপতি—আপনি কোথায় যাবেন?

বোন—*(আপত্তির সুরে)* না না। তুমি কোথায় যাবে এই দুর্যোগের মধ্যে! অন্ধকার, গাঁয়ের কাদা রাস্তা।

ভগ্নিপতি—আপনি। বসে থাকুন।

আমি—*(দৃঢ় স্বরে)* না। চলুন আমি ঘুরে আসব আপনার সঙ্গে।

ভগ্নিপতি—তা হলে আপনি টর্চ নিন। অচেনা পথ।

আমি—চলুন।

(দৃশ্যান্তর)

(ঝড় বৃষ্টি বেড়েছে। নদীর স্রোতের শব্দ তার সঙ্গে)

আমি—অন্ধকার—কাদা রাস্তা। সত্যিই দুর্গম। বৃষ্টি শুরু হয়েছে। দমকা বাতাস। ঝড় উঠবে। দু কূল ছাপান ভরা নদীর খরস্রোত। খেয়া বন্ধ হয়েছে। আমরা মাঝির টোঙ ঘরে এলাম।

ভগ্নিপতি—হ্যাঁগো মাঝি আমাদের নিবারণকে দেখেছ?

মাঝি—সেতো বিকেলে খেয়াপার হয়ে ওপারে গেছে। বললাম, কুথায় যাচ্ছিস? বলল, একটা মোষ ভেসে গিয়েছে। খুঁজতে যাচ্ছি। আর, ত' ফিরতি দেখি নি।

ভগ্নিপতি—ছেলের আক্কেল দেখ। পরের ছেলে! এখন কি করি?
মাঝি—আপনি কি করবেন গো। ওর বাপকে খবর দিন। সে খুঁজুক।
মাঝিণ—ছেলেও ত' ব্যাদরা। খেতে পরতে দিচ্ছে, আদর করে রেখেছে, এমন করলে লোকে সইবে কেনে? এই অন্ধকারে, বর্ষাবাদলায় ছেলে খুঁজে বেড়ানো! যান গো বাবু ওর বাড়িতে খবর দিন। কুথায় তাকে খুঁজবেন?
ভগ্নিপতি—চলুন। দেখা যাক--

(দুর্যোগের শব্দ বাড়ে। বাড়ে নদী স্রোতের শব্দ।)

আমি—এখন, কি করবেন? *(চলতে চলতে কথা চলছে।)*
ভগ্নিপতি—চলুন নদীর ধার বরাবর। ----আগে চলুন। টর্চ জ্বালতে জ্বালতে চলুন...ঘাস-কাদা কাঁটাঝোপ...সাপের উপদ্রোব...ভাল করে দেখে চলুন---কেন যে এলেন?---দেখছেন তো, চাষবাসের গ্রামজীবন কেমন! এখন না পেলে আবার ওর বাপের কাছে যেতে হবে---

(ঝড় জলের শব্দে কথা চাপা পড়ে যায়)

(একটু বিরতি। আবার তীব্র ঝড় জলের শব্দ। সঙ্গে মেঘ গর্জনের শব্দ।)
আমি—সত্যিই দুর্গম এ পথযাত্রা। চারদিকে ঘোরতর অন্ধকার। মেঘ গর্জন, বিদ্যুৎচমক ভরা, নদীর স্রোত---কতক্ষণ হাঁটতে হবে কে জানে। কাদায় পা বসে যাচ্ছে---কাঁটা ঝোপে পা পড়ছে।
ভগ্নিপতি —নি--বা--র--ণ *(প্রতিধ্বনি)*। শালা শয়তানের বাচ্চা, যদি ফেরে, ওকে আমি পুঁতে ফেলব। খুন করব। জেল খাটতে হয় সেও ভি আচ্ছা।--- নি--বা--র--ণ *(প্রতিধ্বনি)*
আমি—আর কতদূর যাবেন!
ভগ্নিপতি—আর একটু চলুন। শেষটুকু যাই। বাজারের মধ্যে উঠে পড়ব। নি--বা--র--ণ--। *(প্রতিধ্বনি তীব্র ঝড়ে শব্দ)*
আমি—সহসা ওকি? কেমন যেন মনে হ'ল! বাতাসে বাঁশির সুর!
ভগ্নিপতি —ও কি? থামলেন কেন? কি হ'ল?
আমি—বাঁশির সুর নয়?
(ঝড় জলের শব্দের মধ্যে বাঁশির সুর খুব ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে।)
আমি—কিন্তু কোথায়? কোথায় বসে বাজাচ্ছে! সুরটা কোন দিকে?
ভগ্নিপতি —বোধ হয় ওপারে। (একটু হেসে) এই অন্ধকারে টর্চ জ্বেলে কি ওপার দেখা যাবে?
আমি—এ কি! দেখেছেন। ভরা নদীর প্রবল স্রোতে মোষ ভাসছে। ঐ তার মুখ আর শিং দেখা যাচ্ছে--মোষের পিঠে বসে নিবারণ তার বাঁশি বাজাচ্ছে।
ভগ্নিপতি—*(সভয়ে চাপা স্বরে)* টর্চ বন্ধ করুন। টর্চ বন্ধ করুন। মোষ ভয়

পাবে। পথ হারাবে, নিবারণ ভেসে যাবে।

আমি—আলো নেভালাম। অন্ধকার আরো অন্ধকার হ'ল। বৃষ্টি পড়ছে। ঝড় বইছে। তার মাঝে নিবারণ বাঁশি বাজাচ্ছে। করুণ উদাস সুর। সমস্ত ভয়ালতার মধ্যে সে সুর যেন করুণা ধারায় বলছে, এই ত' জীবন — এই ত' জীবন।

(বাঁশির সুর স্পষ্ট হতে থাকল)

ভগ্নিপতি—(আনন্দ ও স্নেহে) শালা ছোটলোক—ডাকাত—বুকের পাটা দেখেছেন। শালা এই অন্ধকারে----স্রোতে----শালা------

(বাঁশির সুর আরও স্পষ্ট হ'ল। ঐ সুরই সমাপ্তি সূচক বাজনায় মিশে গেল।)

মৃতের স্তূপ

[চরিত্রলিপি—মিলাক, আবি, ১ম আর্য, বৃদ্ধ, কর্তা, মেয়ে, মা, উপাসকগণ, কাঠুরে, জম্বুক, মাত্রো, শার্বি, মৃত।]

[সিন্ধু নদের তীর। জলস্রোত বয়ে চলেছে। বাতাস বইছে। তারই শব্দ। বহু দূর থেকে মিলাক ডাকতে ডাকতে ছুটে আসছে—]

মিলাক—আ--বি, আ--বি, আ-বি! (কাছে এসে) আবি! রাজা! তুমি এখানে বসে। সেই সকাল থেকে আমি ছুটে আসছি তোমার জন্য।

আবি—তুমি ত' জান মিলাক, মন আমার বেদনায় বিবশ হয়ে আছে। এই সিন্ধুতীরে বীজ বুনে আমরা ফসল উৎপন্ন করতে পারি, আমরা আগুন জ্বালিয়ে অন্ধকার দূর করি। আমরা কাঁচা মাছ-মাংস খাই না। পক্ক করবার কৌশল আমাদেব আয়ত্ব। আমরা গাছেব কোটর বা পর্বত গহ্বর খুঁজি না, ইঁট পুড়িয়ে অট্টালিকা তৈবী কবতে পাবি। আমাদের নগবী সুপরিকল্পিত। আমাদের পশুশালা কত গৃহপালিত জন্তুতে বোঝাই। তম্র কাংস নির্মিত অস্ত্রে আমরা দৃপ্ত, তবু, তবু চাষ না-জানা, অর্ধ-বর্ব্বর, উন্নতনাশা গৌববর্ণ আর্যদের কাছে আমবা বাববাব পরাজিত হচ্ছি। আমাদের সঙ্গী, আমাদেব প্রজারা আর্য-ভয়ে পর্বতে অরণ্যে পলাতক হচ্ছে। ......মিলাক, এরই জন্য কি আমি সিংহাসনে বসেছিলাম, এরই জন্য কি পিতা আমাকেই সিংহাসনের জন্য নির্বাচন করেছিলেন??

মিলাক—আবি! আমাব রাজা, আমাব ভাই! দুঃখ করো না। ইতিহাস-পুরুষ আমাদের ভাগ্যে কি লিখেছেন তা আমরা জানি না। কিন্তু এ কথা সত্যি যে আজ আমাদের বড়ই দুর্দ্দিন। আজ আর্যদের ভয়ে দূর দূরান্তের বাণিজ্য বন্ধ। সিন্ধুনদে একটিও বাণিজ্য-তরী দেখা যায় না। নাগরিকেরা আর্য-আক্রমণের ভয়ে শঙ্কিত।

আবি—আমি অনেক ভেবেছি। অতি-সমৃদ্ধিই এর কারণ। ঐ সমৃদ্ধির ফলেই সিন্ধুতীরবাসী মাত্রেই আজ বিলাসী। দেখছ না, ছেলেদের সেই বীর সাজ আজ নেই। তারা মেয়েদের মত সাজছে। শুধু কর্ণ ও নাসা ভূষণ ছাড়া তারা সব অলঙ্কার পরছে। স্বাস্থ্যচর্চা গেছে—সুরু হয়েছে রূপচর্চা।

মিলাক—তবু ভাই প্রথম আর্য-আক্রমণে প্রত্যেক বাড়ি এক একটা দুর্গে

পরিণত হয়েছিল। আমাদের গবাক্ষ শূন্য দেওয়াল আর সরু পথ আর্যদের বিভ্রান্ত করেছিল। আর গৃহশীর্ষ থেকে অবিরল ইষ্টক বৃষ্টিতেই ওরা পরাজিত হয়েছিল।

আবি—হ্যাঁ। আমদের স্থপতিদের দূরদৃষ্টি যে কত অব্যর্থ তা সেদিন আমরা উপলব্ধি করেছিলাম। কিন্তু—

মিলাক—কিন্তু কি আবি!

আবি—ওদের বাহন সেই দ্রুতগামী জন্তু, কি যেন নাম তার—

মিলাক—অশ্ব।

আবি—হ্যাঁ। সেই অশ্বে চড়ে ওরা আমাদের দ্রুততম গোশকটের চেয়েও জোরে ধেয়ে আসতে পারে, পালাতে পারে। আর ওদের অস্ত্র—

মিলাক—হ্যাঁ অনেক বেশি শক্তিশালী ধাতুতে তৈরী। আমি জেনেছি যে ধাতুর নাম লৌহ।

আবি—হ্যাঁ। আমাদের ঐ জন্তু সংগ্রহ করতে হবে মিলাক। তার চালনা শিখতে হবে। ঐ ধাতুর রহস্যভেদ করতে হবে।

মিলাক—এই তো আমাদের নেতা আবিরাজের মত কথা। তোমার সর্ব জাড্য ঝেড়ে ফেলো রাজা। এবার তাহলে শোন। আমরা শীঘ্রই আবার আক্রান্ত হতে চলেছি।

আবি—এ কথার তাৎপর্য!

মিলাক—আমি একজন আর্যকে বন্দী করেছিলাম, জান।

আবি—জানি। এও জানি সে ব্যক্তি গত রাতের আগের রাতে পালিয়েছে। এবং তুমি তাকে অনুসরণ করেছ।

মিলাক—ঠিক অনুসরণ নয়। কারণ সে পালাবার অনেক পরে আমি জানতে পারি। ফলে অনুসরণ নয়, অনুসন্ধানে বের হই।

আবি—ফল কি হ'ল?

মিলাক—গিরিপথে অনেক দূর গিয়েও তাকে পেলাম না। ক্লান্ত দেহে আমাদের আবিষ্কৃত সেই দ্বিমুখী গুহায় আমি বিশ্রাম নিতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুম ভাঙতে শুনতে পাই—

দৃশ্যান্তর সূচক ধ্বনি

১ম আর্য—আমরা এখানেই মিলিত হব কুন্ত। এখান থেকেই আমরা অতর্কিতে আক্রমণ করব। অতর্কিত আক্রমণ ভিন্ন ঐ নগর ধ্বংস করা যাবে না।

কুন্ত—এই গুহা—

১ম আর্য—হ্যাঁ! এই গুহাই হবে আমাদের সহায়। এখান থেকেই আমরা অকস্মাৎ নগরে উপনীত হতে পারব। ওরা একবার যদি নগর দ্বার রুদ্ধ করতে পারে, তবে আর ওদের পরাজিত করা যাবে না।

কৃষ্ণ—কিন্তু আমাদের অস্ত্র ত'—

১ম আর্য—খুবই শক্তিশালী। কিন্তু দূরের শত্রুকে ত তলোয়ারের কোপে কাটা না।

(অশ্বখুরের শব্দ ক্রমেই মিলিয়ে যায়।)

দৃশ্যান্তর ঃ পূর্বদৃশ্য

মিলাক—কথা কইতে ওরা চলে গেল। আর আমি ছুটতে ছুটতে এখানে চলে এলাম। প্রতিরোধের আয়েজন কর আবি।

আবি—করতেই হবে মিলাক ; করতেই হবে। কিন্তু কি জানি, আমার কেবলি মনে হচ্ছে আমাদের এ সভ্যতার দিন ঘনিয়ে আসছে।

দৃশ্যান্তর ঃ রান্নাঘর

(রান্নার ছ্যাঁক ছোঁক আওয়াজ। খুন্তি নাড়ার শব্দ)

কর্তা—(দূর থেকে) ও গিন্নী! গিন্নী! গেল কোথায়! ওঃ এই যে। (কাছ থেকে) না! তোমার এত রান্নার বাতিক গেল না। ব্যবসা-বাণিজ্য গেল রসাতলে। নাক উঁচু ব্যাটারা সাতটা গোলার ধান লুটে নিয়ে গেল। এখনও তোমার সতের পদের রান্না (দূরে গরু বাছুরের ডাক) ও-দিক আবার কি হল!

মেয়ে—(দূর থেকে) মা! গরু দোয়া হয়ে গেল। গরু-বাছুর ছেড়ে দিলাম।

মা—ভ্যাড়াগুলো আর হাঁসগুলো ছেড়েছ!

মেয়ে—হ্যাঁ মা। সব কবেছি। এবার তবে—

মা—হ্যাঁ স্নান করে নাও। তবে আজ আর সকলের সঙ্গে উত্তর স্নানাগারে যেও না। বাড়িতেই কুয়ো থেকে জল তুলে—

মেয়ে—কিন্তু স্নানাগারে যেতে নিষেধ করছ কেন? সকলেই ত' সাধারণের স্নানাগারে স্নান করে। সেটাই ত' আমাদের রীতি।

মা—তর্ক করো না। যা বলচি, কর। স্নানের আগে নর্দ্দমাগুলো পরিস্কার করো।

মেয়ে—করচি। *(মেয়ে চলে যায়।)*

কর্তা—কি গো! সকাল থেকেই মেজাজ এত চড়া কেন?

মা—আজ উবাসুকে বাড়িতে খেতে বলেছি।

কর্তা—কেন, কেন?

মা—ভয় নেই গো। আকারণে তোমার একটি নিষ্কও খরচ করছি না। মেয়ের বিয়ে দিতে হবে না?

কর্তা—বটে! বটে! খুব ভাল কথা! আসলে কি জান গিন্নী... দেশের এই অবস্থা.... কি যে হবে... আমার মাথায় আর কিছুই ঢুকছে না—গান্ধারের বাণিজ্যটাও যদি...

(দৃশ্যান্তর ধ্বনি)

(হ্রেষাধ্বনি ও জনকোলাহল। কোলাহলের মধ্যে শোনা যায়)

প্রথম কণ্ঠ—থাম! থাম! উপাধ্যায় আসছেন।

সকলে—প্রণতোস্মি! প্রণতোস্মি!! প্রণতোস্মি!!!

(সকলের জয়োল্লাস)

উপাধ্যায়—জয় হোক! জয় হোক। *(কোলাহল থেমে যায়।)*

উপাধ্যায়—প্রিয় বীর আর্যগণ। আজ আমরা স্বদেশ বিতাড়িত যাযাবর। বাস তাবুতে। জীবনপাত অশ্বপৃষ্ঠে। আমাদের স্বদেশভূমি চাই-ই চাই।

দলনেতা—যথার্থ বলেছেন উপাধ্যায়। পুত্র কন্যা নিয়ে স্থান থেকে স্থানান্তরে আর ঘুরে বেড়াতে পারছি না। এই সিন্ধুনদীর তীরবর্তী অঞ্চল আমাদের পছন্দ হয়েছে। এখানেই আমরা স্বদেশভূমি গড়ব। কিন্তু পরপর দুবারের আক্রমণে আমরা পরাজিত হয়েছি।

উপাধ্যায়—এবার আমরা জয়ী হব।

দলনেতা—আপনার এ প্রত্যয়ের কারণ কি শ্রদ্ধেয়!

উপাধ্যায়—কারণ দুটি। প্রথমেই বলি দেবতা আমার অর্ঘ্য গ্রহণ করেছেন। *(সকলের জয়োল্লাস)* দ্বিতীয়তঃ জম্বুক! জম্বুক!

জম্বুক—এই যে উপাধ্যায়!

উপাধ্যায়—জম্বুককে অনার্যেরা বন্দী করেছিল, জান!

সকলে—জানি। জানি।

উপাধ্যায়—মাসাধিক কাল বন্দী থেকে জম্বুক পালিয়ে এসেছে। সে ওদের ভাষা শিখেছে। ওদের অনেক গুপ্তকথা জেনে এসেছে। জম্বুক! তোমার অভিজ্ঞতা সংক্ষেপে বল।

জম্বুক—বন্ধুগণ! আমি বুঝে এসেছি অনার্যদের মধ্যে আত্মকলহ শুরু হয়েছে। ওরা ভীতও হয়ে পড়েছে। নগর প্রায় জনশূন্য। অনেকেই পালিয়েছি বনে, পর্বতে। যারা আছে তারা আমাদের অশ্ব এবং লৌহ-অস্ত্রের ভয়ে ভীত।

উপাধ্যায়—এই আমাদের আক্রমণের যোগ্য সময়। জয় আমাদের নিশ্চিত।

(সকলের জয়ধ্বনি)

দৃশ্যান্তর

(গভীর রাত্রি। শিয়ালের ডাক। প্যাঁচার ডাক)

নাট্রো—আমাকে এ কোথায় নিয়ে এলে শার্বি!

শার্বি—চুপ। আস্তে কথা বল। মনে রেখো দেওয়ালেরও কান আছে। এই সোপানে বস। এ হচ্ছে উত্তর শহরের স্নানাগারের ...।

নাট্রো— উঃ কি অন্ধকার। আর কি গুমোট পড়েছে দেখেছ। এক ফোঁটা হাওয়া নেই।

শার্বি—প্রকৃতি-চর্চা বন্ধ রাখ নাট্রো। কাজের কথা বল। গুপ্তঘাতক...

নাট্টো—না শার্বি। ও পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেছি। এ সময়ে প্রাসাদে হঠাৎ আবির মৃতদেহ আবিষ্কৃত হলে লোকে তোমাকেই সন্দেহ করবে। তাতে আমাদেরই ক্ষতি।

শার্বি—তবে?

নাট্টো—আমি চাই বিদ্রোহ। বিদ্রোহীরাই আবিকে হত্যা করবে।

শার্বি—(উত্তেজিতভাবে) কিন্তু কবে? কবে ঘটবে সেই বিদ্রোহ?

নাট্টো—শিস। আস্তে। মনে রেখো দেওয়ালেরও কান আছে।

সার্বি—(আস্তে আস্তে) কিন্তু কবে? কোথায়?

নাট্টো—অপেক্ষা কর বন্ধু। সামান্য অপেক্ষা কর।

দৃশ্যান্তর

(বাজারের কোলাহল)

প্রথম কণ্ঠ—থামো। থামো সব। মহামান্য নাট্টো তোমাদের কিছু বলবেন।

নাট্টো—নতুন কথা নয় বন্ধুগণ। দেশের পরিস্থিতির কথা আপনারা সকলেই জানেন। আমাদের সুজলা সুফলা দেশে আজ অন্নের জন্য হাহাকার। বাণিজ্য বন্ধ। সিন্ধুনদে বাণিজ্যতরী ভাসে না। কিন্তু কেন? আমরা রাজা আবির এ অপদার্থতা আর কতদিন সহ্য করব?

মিলাক—এ কি নাট্টো। তোমার মুখে এ কি কথা। তুমি কি বিদ্রোহ ঘটাতে চাও!

নাট্টো—বিদ্রোহ! নিজের বাঁচার পথ খোঁজা কি বিদ্রোহ? আমার দুর্দ্দশাব কারণ অন্বেষণ কি বিদ্রোহ? সে কারণ যদি রাজার অপদার্থতা হয়, তবে তা বলা কি বিদ্রোহ? তোমার কি মত মিলাক?

মিলাক—তুমি কি সব কিছুর জন্য রাজা আবিকে দায়ী কবতে চাও?

নাট্টো—তবে কে দায়ী মিলাক? আর্যদেব কাছে দু-দুবার পবাজিত হবার দায় রাজার না এই জনসাধারণেব? আজ যে সব বকম বাণিজ্য বন্ধ তাব দায় কার? রাজার না জনসাধারণের? শত শত নাগরিক যে আজ অরণ্য পর্বতাশ্রয়ী—তার জন্য দায়ী কে? বাজা না সাধাবণ মানুষ?

মিলাক—কি বলছ নাট্টো। এত' প্রত্যক্ষ বিদ্রোহের প্ররোচনা। তুমি এমন করে বলছ যেন সব দায়ই রাজার।

জনতা—তবে কি সে দায় আমাদের?

মিলাক—শোন ভাই সব। ঠাণ্ডা মাথায় বিচার করে দেখ—আমরা অরাজকতা চাই না, শান্তি চাই!

নাট্টো—ক্ষুধার্ত উদর ঠাণ্ডা মাথায় বিচার কর্তে পারে না মিলাক। আর শান্তি। গোটা দেশ যখন জ্বলছে—

জনতা—মারো.....মারো.....মিলাককে শেষ করে দাও....

(জনরোষের গর্জন)

নাট্টো—ভাই সব। মিলাকই শেষ নয়। প্রাসাদ জুড়ে—

জনতা—চল, চল প্রাসাদে চল। আমরা রাজা আবির সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চাই। *(জন কোলাহল)*

দৃশ্যান্তর

(রাজপ্রাসাদ। নূপুর ও বাদ্যের ধ্বনি।)

আবি—থামাও। থামাও নৃত্য গীত। কে বলেছে তোমাদের নৃত্যগীত করতে? মনোরঞ্জন! হায় মূর্খ। দেশ জুড়ে অশান্তি, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, সামনে শত্রুর উদ্যত অস্ত্র, পিছনে ষড়যন্ত্রের গোপন ছলনা— এই কি নৃত্যগীতের সময়! *(দূরাগত কোলাহল)* এ কি! কিসের কোলাহল। আর্যেরা কি.....মিলাক! মিলাক!......প্রহরী......একি! দূত! কিসের সংবাদ! তুমি এত হাঁফাচ্ছ কেন?

দূত—রাজা! শার্বির পরামর্শে নাট্যো জনতাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। তারা বাজারের মধ্যে মহামান্য মিলাককে হত্যা করেছে। ওরা রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করতে ছুটে আসছে। প্রহরীরা ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে.....আপনি....আপনি....

আবি—আমি পালিয়ে আত্মরক্ষা করব....হা হা হা..শেষ পর্যন্ত আমাকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে হবে দূত .....

শার্বি—পালাতে হবে কেন আবিরাজ! তোমার কষ্টের লাঘব করতে এইত' আমি তলোয়ার খুলে দাঁড়িয়ে আছি।

আবি—কে! শার্বি! তুমি তলোয়ার খুলে দাঁড়িয়ে আছ! *(খাপ থেকে তলোয়ার বের করার শব্দ)* এই দেখ। আর্যদের লৌহ নির্মিত তলোয়ার আমার হাতে। এর আঘাতে তোমার তলোয়ার কুশগাছের মত দ্বিখণ্ডিত হবে। তবু তোমাকে আমি আক্রমণ করব না। এই তলোয়ার ফেলে দিলাম। *(তলোয়ার ফেলবার শব্দ)* এসো। এগিয়ে এসো। আমার বুকে আমূল বসিয়ে দাও।

শার্বি—একি! সমস্ত ভূমি এমন কাঁপছে কেন?

দূত—ভূমিকম্প! ভূমিকম্প...*(চিৎকার করতে করতে দূরে চলে যায়)*

শার্বি—দাঁড়াতে পারছি না। *(প্রাসাদ ভেঙ্গে পড়বার শব্দ)* এ যে প্রাসাদ ভেঙ্গে পড়ছে।

আবি—সরে এসো শার্বি সরে এসো। অলিন্দের স্তম্ভ দুলছে ... ভেঙ্গে পরল বলে—

শার্বি—*(আর্তনাদ করে)* দাদা! দাদা! আমি স্তম্ভে চাপা পড়েছি...

আবি—শার্বি! শার্বি!....নেই! এত আকাঙ্ক্ষা ....ষড়যন্ত্র অবিশ্বাস....সব শেষ। শার্বি... আমার স্নেহের শার্বি ....নেই!*(খানিক নীরবতা। প্রাসাদ ভাঙ্গবার শব্দ - দূরে জলোচ্ছ্বাস।)* ও কি! বুঝি সিন্ধু নদের বাঁধ ভেঙ্গেছে।..আসুক

ভূমিকম্প...আসুক জলোচ্ছ্বাস, ভেঙ্গে চুড়ে গুঁড়িয়ে নিয়ে যাক এ সিন্ধুরাজ্য। (ভেঙ্গে পড়ার শব্দ) আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এ শহর পৃথিবী থেকে মুছে যাচ্ছে...শুধু মৃতদেহ...মৃতের স্তূপ....মহেঞ্জোদারো....হা হা হা..

(তীব্র ভূমিকম্পের আলোড়নে হাসি চাপা পড়ে জলোচ্ছ্বাসের শব্দে সব ভেসে যায়।)

রাইচরণের বাবরি

(জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর একই নামের এক গল্প অবলম্বনে)

চরিত্র লিপি—রাইচরণ, মন্মথ, ম্যানেজার, প্রথম লোক, অন্যজন।

(শিয়ালদহেব ফুটপাথ দিয়ে বৌবাজারের দিকে চলেছে বাইচবণ। তাকে অনুসবণ কবছে দুটি লোক।)

প্রথম লোক—আবে! দেখ দেখ লোকটার বাবরি। চিনিস লোকটাকে?

দ্বিতীয় লোক—চিনব না কেন? ও-ত' আমাদেবই পাড়ায় থাকে। নাম রাইচবণ ঘোষ। কিন্তু ঐ বাববিব জন্য লোকে ওকে বাবরি ঘোষ বলে। তার থেকে ছোট কবে কেউ কেউ শুধু বাববি বলেও ডাকে।

প্রথম জন—হ্যাঁ। দেখবাব মতই বাবরিখানা। কি চুল। যেমন কোঁকড়া, তে·ন লম্বা, চিক্কণ আব সাপেব মত ঢেউ খেলান।

দ্বিতীয় লোক—বাববি ঘোষ ঐ বাববিব জন্য রীতিমত গর্বিত।

প্রথম লোক—ভাই, ও বাববি যাব আছে, সে গর্ব কববে না কেন? দেখেই ত' আমাব ঈর্ষা হচ্ছে। ঈশ্বব একটা লোকেব মাথায় এত চুল দিয়ে অন্যায় পক্ষপাত কবেছেন। জানি না, এব বদলে কতগুলো মাথা তাঁকে ন্যাড়া কবে গড়তে হয়েছে।

(দুজনেই হো হো কবে হেসে ওঠে।)

দৃশ্যান্তরের বাজনা

(সেলাই মেশিন চালাবার শব্দ চলতে থাকে।)

বাইচরণ—(সেলাই থামিয়ে) কি চাই।

একজন—কিছু নয়। আপনাব বাববি দেখে থেমে পড়লাম।

অন্যজন—দাদা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব! অমন বাববিটা কি করে বাগালে।

রাইচবণ—(হেসে) পূর্বজন্মের তপস্যা। তপস্যা না থাকলে কারও এমন তেল চুকচুকে জাঁকাল বাববি হয়! এই কলকাতা শহরে এমন আব একটা বাবরি খুঁজে বার করুন দেখি। বাজি রাখছি।

একজন—আচ্ছা! রোজ ক'ছটাক তেল মাখান ওতে?

রাইচরণ—বললুম ত'। আমার চুলের জাতই আলাদা।....তেল দরকার নেই, ও এমনিতেই চকচকে।

ঘোষক—পথে-ঘাটে দোকানে বাবরি নিয়ে রাইচরণকে নানা বাচনিক রসিকতা ও বিস্ময়ের কথা শুনতে হয়। কিন্তু বাড়িতে অন্য রকম।

মানদা—সরো, সরো আমার চোখে সামনে থেকে। নইলে বঁটি দিয়ে চুলের গুঁড়ি সুদ্ধ কেটে সাবার করে দেব।

রাইচরণ—(*হ্যা হ্যা করে হাসে।*)

মানদা—যা দেখতে পারিনে। অসুরের মত চুলের ঝাড়, দেশলাই-এর কাঠি জ্বেলে পুড়িয়ে দেব একদিন।

রাইচরণ—(*হাসতে হাসতে*) ....রক্তবীজের বংশ...হে হে পুড়িয়েই দাও আর কেটেই ফেল, চুল ফের গজাবে—ফের দেখতে দেখতে বাবরি গজাবে।

মানদা—যত অনাসৃষ্টি কাণ্ড—চুল না চিতা বাঘের জঙ্গল—মা গো, ছিরি দেখলে অঙ্গে ঘেন্না ধরে—গন্ধে বমি আসে।

রাইচরণ—পাগল।— এ বাবরি দেখে শহরের লোকের চোখ টাঁটায়। আর তোমার কিনা হয় ঘেন্না,—বমি আসে।

মানদা—ও কি করছ, ও কি করছ। গব গব করে হাতে তেল ঢেলে নিলে শিশি উপুড় করে। দাও শিশি।....বলি, রোজ আধপো করে তেল মাথায় মাখালে ফতুর হতে কতক্ষণ!—না কি, না খেলেও চুলের বাহার দেখলে পেট ভরবে! চুলে কেরোসিন মাখতে পার না!

রাইচরণ—(*হো হো করে হাসে।*)

ঘোষক—স্নানের আগে সামনে আরশি নিয়ে অন্ততঃ আধঘণ্টা রাইচরণ মাথায় তেল মাখে। হাতের ঘষায় যতক্ষণে চুল গরম হয়ে না ওঠে, ততক্ষণ তার তেল মাখা শেষ হয় না। চুল গরম হলেও মাথা ঠাণ্ডাই থাকে। রাগের মাথায় মানদা যখন শেষ পর্যন্ত তার আরশিটা কেড়ে নেয়, তখনও সে হাসতে হাসতেই বলে—

রাইচরণ—আরে কর কি, কর কি। দাও, আরশি দাও।

মানদা— চুপ্! আর আমিরি করতে হবে না। পায়ের ওপর পা তুলে চুলে তেল মাখলেই সংসার চলে আর কি? ক'পয়সা রোজগার কর! ক'পয়সার মুরদ শুনি!

রাইচরণ—(*না রেগে*) শোন কথা। বলেছি ত' আমার বাবরির কল্যাণে তোমার সংসার শ্রীমন্ত হয়ে উঠবে। দেখো—

মানদা—দেখেছি। ছাই হবে। দেখতে দেখতে দুচোখে পোকা পড়ে গেল নইলে য়্যাদ্দিনেও শশীর বৌ-এর মত একটা স্কার্টপাড় শাড়ী দেখলুম না।

ঘোষক—রাইচরণ রাগ করে না। ও ভাবে, ছেলেমেয়ে নেই। বেয়াল্লিশ বছর বয়সে সে নিজেই যদি বাবরির জন্য এতটা করতে পারে, তবে এই বয়সে মানদার একটা শাড়ির শখ হবে, এতে অবাক হবার কি আছে! একটা

স্কার্টপাড় শাড়ী দিয়ে মানদার মান ভাঙ্গাতে হবে, এই প্রতিজ্ঞা করে সে আবার বাবরি বাগাতে আরশি নিয়ে বসল।

সেদিন দুপুরবেলা রাইচরণ যখন দোকানে বসে কল চালাচ্ছে—

(বাইরে দূরের মৃদু কোলাহল ও মাঝে মাঝে ছেদ দিয়ে কল চালাবার শব্দ)

ঘোষক—তখনই ফিটফাট এক ভদ্রলোক এসে ভেতরে ঢুকলেন। দুই চোখ অনুবীক্ষণের মত করে ভদ্রলোক গভীর মনোযোগের সঙ্গে রাইচরণের বাবরি পর্যবেক্ষণ করলেন।

রাইচরণ পুলকিত হল। ভদ্রলোক বাবরির আকর্ষণেই এসেছেন। এমনি করে অনেকেই আসে। তারপর ভদ্রতার খাতিরে অর্ডার দেয়। সে কথা ভেবেই রাইচরণ খাতির করে বলল,

রাইচরণ—বসুন।

ভদ্রলোক—*(চেয়ার টানার শব্দ)* হুঃ। কদ্দিন আপনার এ দোকান।

রাইচরণ—দু বছর।

ভদ্রলোক—তাই ভাবছিলাম। লাভ নেই। এ কাজ ঠিক আপনার মত লোকের সাজে না।

রাইচরণ—কেন বলুন ত'! *(হাসি)*।

ভদ্রলোক—না, হাসির কথা নয়। এমন চমৎকার যার বাবরি, বলতে কি, কলকাতায় দুটি নেই, আর এই নিয়ে,—মাপ করবেন, কথাটা কড়া মত শোনাচ্ছে, আপনি এখানে বসে কল চালিয়ে হিমসিম খাচ্ছেন। অথচ এই চুল দিয়ে আপনি দেশজোড়া নাম কিনতে পারেন। এমন বাবরি যদি যোগ্য ব্যবহার না হয়, উঃ, ভারি দুঃখের কথা মশাই! মাইরি—

রাইচরণ—*(হেসে)* বলেন কি মশাই! কিসে বাবরির যোগ্য ব্যবহার হতে পারে?

ভদ্রলোক—চলুন আমাদের থিয়েটারে। আপাততঃ মাস মাস এক শ' টাকা পাবেন।

রাইচরণ—ওরে বাপরে। আমার চোদ্দপুরুষ থিয়েটার কি জানল না মশাই, মাপ করবেন, ও সব আমার দ্বারা হবে না।

ভদ্রলোক—একশ' বার হবে। কার হবে আর কার হবে না, আমরা সে চিনি মশাই, থিয়েটারের ম্যানেজারী করে এগার বছর কাটল। না, আপনার শরীরের টাইপ, চুলের ফ্যাসান,—গলা ছেড়ে বলতে পারি, অ্যাক্টো করবার জন্য।.....

........অবশ্য প্রথমটায়, অভ্যাস নেই একটু কেমন কেমন ঠেকবেই, পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। কত দেখলুম মশাই। পরে আপনি নিজে আলাদা করে নতুন পার্টি খুলে না বসেন—বাতিক! একবার চাগলেই হ'ল। শেষটায় তাই হয়। (হাসতে থাকেন।)

........আচ্ছা, আজ আসি। কথাটা চিন্তা করুন। কাল আবার দেখা পাবেন। নমস্কার।

রাইচরণ—নমস্কার।

ঘোষক—লোকটি চলে যেতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল রাইচরণ। কিন্তু কথাটা ঝেড়ে ফেলতে পারল না। বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে বাবরির মহিমা বোঝাতে ঘটনাটা বলে ফেলল।

রাইচরণ—হাঃ হাঃ হাঃ। লোকটা বলে কি জান! এই বাবরি যদি যোগ্য ব্যবহার না হয়, উঃ, ভারি দুঃখের কথা মশাই।...বলে চলুন আমাদের থিয়েটারে ....আপাতত মাস মাস একশ' টাকা দেব?.... হাঃ হাঃ থিয়েটার না কচু। আমার এমন ব্যবসাটা কি না মাটি হয়ে যাক। আসুক কাল মুখের ওপর বেশ দু'কথা শুনিয়ে দেব।

মানদা—নইলে আর খলিফাগিরি করতে যাবে কেন, এমন আহাম্মক না হলে। এমন আক্কেল না হলে এণ্ট্রান্স পাশ করে সাহেবী হৌসে কাজ না করে কেউ কাপড়-দেশলাই করে খায়। বড় যে রাজা-বাদশার মত মুখ ঘুরিয়ে 'না' করে দিলে? মাস মাস এক-শো টাকা! কম হল! রসো। আজ আমি দেশলাই-এর কাঠি ধরিয়ে বাবরি শুদ্ধু পুড়িয়ে না দিত' আমার নাম মানদা নয়।

(দুপ্ দাপ্ করে মানদা চলে গেল)

রাইচরণ—(দূরের মানদাকে শোনাতে উচ্চস্বরে) সত্যিই কি দেশলাই আনতে চললে না কি! (ভীতস্বরে) বলছি কি, বাবরিই যদি না থাকে, তবে থিয়েটার করব কিসের জোরে! এ কি! ওঃ বাব্বা! দেশলাই নয়। এ যে বঁটি নিয়ে এল।

মানদা—তবে বল কাল রাজী হবে, বল, নইলে—

রাইচরণ—(*ভীত ও ব্যগ্রকণ্ঠে*) একশ'বার, হাজারবার, এই আমি শপথ করছি, কালই আমি খলিফাগিরি ছেড়ে দিয়ে থিয়েটারে ঢুক্‌ব—কালই।

ঘোষক—পরদিন ম্যানেজার আবার এলেন। রাইচরণ একটু চাপ দিয়ে একশ' টাকার ওপর আরও পঁচিশ টাকা নিয়ে রাজী হ'ল। দিন কয়েক মহড়া দেবার পর, এক দিন রাইচণ ম্যানেজারকে বলল—

রাইচরণ—আচ্ছা মশাই, এই যে আমাকে ডাকাত সর্দ্দারের পার্ট করতে হবে, আমি ত' আর সত্যিকারের ডাকাত নই।

ম্যানেজার—তাত' ননই। আপনি সেই রাইচরণবাবুই। শুধু ডাকাতের বেশে থিয়েটারের সময় স্টেজে নেমে বই-এর কথা কটা বলতে হবে।

রাইচরণ—বুঝলুম। আমার এই ডাকাতের সাজ-পোশাক, ডাকাতের মত কথাবার্তা লুটতরাজ, মারপিট করা, এসব কোনটাই সত্যি নয়—কৃত্রিম,

এমন কি দর্শক জানবে এগুলো আগাগোড়া মিথ্যে। শুধু তার সাময়িক ভাবে ধরে নেবে যেন সত্যি একজন ডাকাত এসে তাদের সামনে দেখা দিয়েছি।

ম্যানেজার—হ্যাঁ, তাইত', তাই নাটক। নাটকের সবটাই মিথ্যে, একটা গল্প, তবু তা সত্যি করে দেখাবার এবং সত্যি বলে মেনে নেবার মানে একটা সাময়িক উপভোগ ছাড় আর কি—

রাইচরণ—নমস্কার মশাই। আমিও তাই ভাবছি। মাপ করবেন, আমি পারব না।

ম্যানেজার—কেন কেন? কি হ'ল আপনার?

রাইচরণ—যেখানে সাজপোষাক, হাব-ভাব, কথাবার্তা পর্যন্ত কৃত্রিম, সেখানে, আপনি কি মনে করেন কোন দর্শক আমার বাবরিটা সত্যিকারের বাবরি বলে ধরে নেবে? সবাই ভাববে ওটা একটা পরচুলা—স্টেজে নামবার আগে গ্রীণরুম থেকে মাথায় চাপিয়ে এসেছি।

ম্যানেজার—ও মশাই! চললেন কোথায়? পাগল হয়ে গেলেন না কি!

রাইচরণ—বেঁচে থাক আমার সেলাই-এর দোকান। দোকানে বসে পয়সাও রোজগার হবে, বাবরিও দেখান হবে। স্টেজে উঠি আর লোকের চোখের সামনে আমার অমন বাবরিটা কি না পরচুলা হয়ে যাক।

ঘোষক—ম্যানেজারের চোখের সামনে দিয়ে রাস্তায় নেমে এলো রাইচরণ। এদিক ওদিক খানিক ঘুরে কলেজ-স্ট্রীটের একটা দোকান থেকে হাল ফ্যাসানের এক জোড়া স্কার্ট পাড় শাড়ি কিনে বাড়ির পথ ধরল। না হলে মাস মাস একশ' পঁচিশ টাকা হাতছাড়া হওয়ার শোকে হয়ত' মানদা বঁটি নিয়েই তাড়া করবে।

হায়রে! জীবনেও মানদা বাবরির মর্ম বুঝবে না! রাইচরণ দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

বাস্তুসাপ

(প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সমনামের গল্প অবলম্বনে)

চরিত্র লিপি। দিদিমা, সুরোবালা, কর্তা, ভজুয়া, মানদা, কিশোরকুমার, [illegible]।

(বাড়িশুদ্ধ সকলে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। শ্বাসপ্রশ্বাস ও নাকডাকার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। এমন সময় ঢং ঢং করে চারটে বাজল। সঙ্গে অ্যালার্ম।)

মা—ওমা! চারটে বেজে গেল! (হাই তুললেন) দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা। ও সুরো, সুরোবালা! ও সুরি সুরি! ওঠ দিদি ওঠ। আজ যে অমাবস্যা।

সুরো—*(ঘুম ভাঙ্গার আমেজে)* উঃ.....। ও বাবা! এযে ভোর হয়ে গেছে দিদিমা।

দিদিমা—তাড়াতাড়ি কর দিদি। সূর্য উঠলে গঙ্গাস্নানে আর পূণ্যি থাকে না।

সুরো—দেরী হবে না দিদিমা। জিনিসপত্র সব গোছান আছে। নিয়েই বেরিয়ে পড়ব।

(দরজা খোলা, এটা ওটা নাড়া ইত্যাদির শব্দ)

দিদিমা—*(বাইরে থেকে)* নামাবলি খানা নিস সুরো। একটু শীত শীত করছে।

সুরো—সে তো কালই গুছিয়ে রেখেছ। শীত না ছাই। ও তোমার বাতিক।

দিদিমা—বুড়ো হলে বুঝবি। তোর মাকে ডাক। সদর বন্ধ করবে।

সুরো—*(হেসে)* আজকাল তোমার কিছু মনে থাকছে না। মাকে ডাকতে হবে কেন? দিন চারেক থেকে দ্বারোয়ান এসেছে না! ভজুয়া!

দিদিমা—মনেই থাকে না। নে চল। সাজিটা নে। স্নান সেরে ফুল তুলে একেবারে কাশিবাড়িতে ঘুরে আসব। *(একটু থেমে, আর্তনাদ)* ওগো, মাগো।

সুরো—*(আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠায়)* কি দিদিমা!

দিদিমা—হায়, হায়, হায়, সব্বোনাশ হয়েছে।

সুরো—কি, কি? কি হয়েছে দিদিমা?

দিদিমা—ঐ দেখ! ঐ আতা তলায়।

সুরো—ও মা। একটা ছোট কালো মোটা সাপ। কে মেরেছে। ইস্ কত রক্ত। হ্যাঁ দিদিমা, এ কি সেই বাস্তুসাপ?

দিদিমা—বাস্তু বৈ কি? দেখছিস নে। আহাহা! এমন মহাপাপ কে করলে? *(প্রায় কেঁদে)* বাবা, কে তোমাকে এমনি করে হত্যা করল!

সুরো—*(কেঁদে)* কি হবে দিদিমা!

দিদিমা—হবে আর কি—আমার মাথা হবে। ভিটেয় ব্রহ্মহত্যে হ'ল। এ বংশে কি আর কিছু থাকবে। নিব্বংশ হয়ে যাবে। লক্ষ্মী ছেড়ে যাবে ; লক্ষ্মী ছেড়ে যাবে। কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে কোথায় দাঁড়াব হে নারায়ণ! হে মধুসূদন! হায় হায় হায়!

(দরজা খুলে মা বাইরে আসেন)

মা—একি! এখনও গঙ্গাস্নানে যাওনি মা! হঠাৎ মালা জপতে বসছ!

দিদিমা—আর মা গঙ্গাস্নান। মা গঙ্গা এখন নিলে বুঝতে পারি। সব্বোনাশ হয়েছে মা!

মা—*(আতঙ্কে)* কি হয়েছে মা।

সুরো—কে যেন বাস্তু সাপটাকে মেরে ফেলেছে।

মা—বেশ করে দেখেছ ত'! বাস্তুসাপই বটে!

সুরো—বাস্তুসাপ বই কি! ঐ দেখো না আতাতলায় পড়ে আছেন। আজ তিনপুরুষ ধরে অধিষ্ঠান করেছিলেন, বাবার দয়ায় কোনও বিপদআপদ হয় নি। এবার সংসার ছারখার যাবে!

মা—তাইতো! বাস্তুবাবাই তো। *(সজোরে চিৎকার করে কেঁদে)* ও বাবাগো! এ আমাদের কি হ'ল গো!

খুব দ্রুত বহুজন এসে জমল। সকলেরই প্রথম প্রশ্ন, কি হয়েছে। পরে ইস্। বাস্তুসাপ। পরে হায় হায় করতে থাকলেন। প্রতিবেশিরাও জমলেন। আতঙ্কিত গুঞ্জন ও গবেষণা শুরু হ'ল। একটু পরে সেই শব্দ ছাপিয়ে কর্তার কণ্ঠ শোনা গেল—

কর্তা—*(রাগে কাঁপতে কাঁপতে)* কে? কে একাজ করেছে বল। নইলে ঘরে দুয়ারে আগুন লাগিয়ে দেব।

(সকলের গুঞ্জন)

একজন—ঐ দেখ, আতাতলায় রক্তমাখা লাঠি পড়ে আছে। ভজুয়ার লাঠি। এ নিশ্চয় সেই বেটার কাজ।

সকলে—হ্যাঁ। নিশ্চয় ঐ বেটার কাজ।

কর্তা—*(চিৎকার করে ডেকে)* ভজুয়া! এই ভজুয়া।

ভজুয়া—জী হুজুর।

কর্তা—ইধার আও। *(ভজুয়া আসে)* তোম্ সাপ মারা হ্যায়?

ভজুয়া—*(সগর্বে)* হ্যাঁ। হাম মারা হ্যায়।

কর্তা—কাহে মারা?

ভজুয়া—সাঁপ আদমিকা দুষমণ হ্যায়, মারেগা নেহি? মারা ত ক্যা হুয়া?

কর্তা—ক্যা হুয়া রে শালা! তোর বাপের সাপ!

ভজুয়া—এ বাবু! মু সামালকে বাত করনা।

কর্তা—কি? কি বললি! তবে রে শালা।

জনতা—মারো। শালাকে আরো মারো। জুত্তি সে খাল খুলে নেও শালার। তোর বাপের সাপ!

কর্তা—নিকাল যাও শালা, আভি নিকাল যাও।

ভজুয়া—আচ্ছা! হাম ভি দেখ লেঙ্গে।

(জনগুঞ্জন চলতে থাকে। তার সঙ্গে মেশে সমায়ন্তরের ধ্বনি। সে ধ্বনি কমতে আবার মৃদু গুঞ্জন শোনা যায়।)

জনগুঞ্জন—এই যে পুরুত মশাই এসেছেন। শাস্ত্রী মশাই এসেছেন। হ্যাঁ এবার শাস্ত্রীয় বিধান শোনা যাবে।

দিদিমা—বাবা! আপনি এসেছেন! এ বিপদে রক্ষে করুন বাবা। আমার সংসার যাতে বজায় থাকে তাই করুন বাবা!

পুরোহিত—ভয় কি মা! কোন ভয় নেই। তোমরা ত আর করনি। তোমাদের কোন অপরাধ নেই। তবে ভিটেয় ব্রহ্মরক্তপাত হ'ল, এটাই বড় দুর্ভাগ্যের বিষয়।

একজন—পুরুত মশাই। এখন কর্তব্য বিধান করুন।

পুরোহিত—কর্তব্য এখন, প্রথম কর্তব্য সৎকার করা,—ব্রাহ্মণোচিত সৎকার কত্তে হবে। শাস্ত্রানুসারে সর্পের মুখে এক তাম্র খণ্ড দিয়ে গঙ্গাতীরে নিয়ে গিয়ে দাহ করতে হবে।

একজন—তা হলে চালি বানিয়ে শববহন ও শবযাত্রা করতে হবে?

পুরোহিত—তা করতে হবে বই কি?

(জনগুঞ্জন। ও বাবা! সাপের মরা কে
বইবে? যদি জ্যান্ত হয়ে কামড়ায়!
নানা, ওর মধ্যে আমরা নেই)

তরুণ কণ্ঠ—কিছু ভাববেন না খুড়ো মশাই। আমরা আজ ইস্কুলে যাব না। আমরাই সব করব। *(কিশোরদের উল্লাস)*

১ম তরুণ—চালি করতে হবে।

২ তরুণ—ঐ ত' বাঁশ।

৩ তরুণ—দা চাই দা। সুরোদি, দা দিন ত'!

(বাঁশ কাটার শব্দ শোনা যেতে থাকে)

পুরোহিত—তোমরা কোন চিন্তা করোনা। সর্পযোনিতে কষ্ট পাচ্ছিলেন, মুক্ত হয়ে গেলেন। তোমরা তেরাত্তির অশৌচ গ্রহণ করো!....ভাদ্রমাসের নাগ পঞ্চমীর দিন ব্রাহ্মণকে স্বর্ণদান আর একটা প্রায়শ্চিত্ত করে ফেলো, তা হলেই সর্ব পাপ মুক্ত হবে। বাস্তুসাপ হচ্ছে কুলদেবতা কি না। শাস্ত্রে প্রমাণ রয়েছে।

সর্ব্বে বাস্তুমায়া দেবাঃ সর্ব্বং বাস্তুময়ং জগৎ।
পৃথ্বীধরস্তু বিজ্ঞেয়োর্বাস্তুদেব নমোস্তুতে।।

তরুণ ১—খাটুলি তৈরী হয়েছে।

পুরোহিত—গঙ্গোদক ছিটিয়ে শবদেহ ওঠাও...হ্যাঁ। হ্যাঁ। বেশ হয়েছে। সনাতন

এসো। তুমি বাড়ির কর্তা। তুমি ওর মুখে তাম্রখণ্ড দিয়ে গলবস্ত্র হয়ে মার্জনা চাও।

কর্তা—হে বাস্তুবাবা। ভজুয়া মুক্খু। জানে না। আমাদের অজান্তে সে তোমাকে মেরে যে পাপ করেছে আমরা সাধ্যমত এবং শাস্ত্রমত তার প্রায়শ্চিত্ত করব। আমাদের অজানিত পাপের জন্য ক্রোধ করো না বাবা! আমাদের ক্ষমা করো।

বাড়ির সকলে—ক্ষমা করো বাস্তুবাবা!

তরুণ ১—তোল! তোল! খাটুলি তোলো।

তরুণ ২—বল হরি।

সকলে—হরি বল!

(বাড়ির সকলে কাঁদতে থাকল। ধ্বনির গুঞ্জন ক্রমশ দূরান্বিত হতে থাকল।)

ঘোষক—খাটুলির পিছন পিছন বাড়ির সকলে চলল নিঃশব্দে কাঁদতে কাঁদতে। পথে লোক বাড়তেই তাকল। *(গুঞ্জন বাড়ছে, খুব বেড়ে উঠল)* শ্মশানে এত লোক জমল যে গ্রামের জমিদার মরলেও অত লোক জমে না। মহা সমারোহে শবদাহের পর, চিতাভস্ম গঙ্গাজলে ভাসিয়ে দিয়ে সবাই বাড়ি ফিরে এলেন।

দৃশ্যান্তরের ধ্বনি

(বিকেলবেলা। বাড়িতে স্তব্ধ পরিবেশ। শুধু কর্তার গড়গড়ার ভুরুক ভুরুক আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। দিদিমা মৃদু স্বরে বারবার বলছেন—

দিদিমা—হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে,
হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।।

মা—মা! সারাদিন মুখে এক ফোটা জলও দিলেন না। বাবাও গড়গড়া টেনে দিন কাটিয়ে দিলেন। এখন সন্ধে হয়েছে। তোমরা কিছু মুখে দাও।

দিদিমা—আমি আজ নির্জলা উপবাস করব। আমায় কিছু বলিসনে। ওঁকে আগে এক গ্লাস শর্বত দে। পরে রাতের খাবার খাইয়ে দিস্।

কর্তা—(গড়গড়াটা থামিয়ে) না না! আমিও আজ...

দিদিমা—কে রে। দরজার ওখানে কে? ভজুয়া না কি?

ভজুয়া—হা বুড্ডা মাইজী।

মা—তোর হাতে ওটা কিসের হাঁড়ি।

ভজুয়া—বাবু! হাম তোমহারা একঠো সাঁপ মার ডালা—উসকো বদলা দোঠো সাঁপ লায়া। ইয়ে লেও।

(হাঁড়ি ছুড়ে দিয়ে পালাল ভজুয়া। হাঁড়ি ভাঙ্গা এবং পালাবার দ্রুত পদশব্দ শোনা গেল)

মা—সাপ সাপ। বাবা সাবধান।

দিদিমা—কি সাংঘাতিক।

বাবা—ওরে বাবারে। ছোবলালো ছোবলালো...

দিদিমা—হা কপাল।

মা—ওরে কে কোথায় আছিস। শিগগিরী আয়। বাবাকে সাপে কামড়াল...দু দুটো সাপ।

(হুড় হাড় দুড়দাড় শব্দে বহুজন এলো।)

১ কণ্ঠ—বাঁধন দাও। বাঁধন দাও।

২ কণ্ঠ—কি সাপ। কোথায় গেল।

মা—পালিয়েছে। ভজুয়া সাপ এনেছে। জাত সাপই হবে।

৩ কণ্ঠ—ফণা ছিল কি? ফণা থাকলে জাত সাপ। সাংঘাতিক।

১ কণ্ঠ—ওসব কাজের কথা নয়। ডাকতার ডাক।

২ কণ্ঠ—ডাক্তার কি হবে। রোঝা ডাক। আমাদের গ্রামের শেষে বেদে আছে।

৩ কণ্ঠ—হ্যাঁ। ওরা সকলেই বিষবৈদ্য। ওদেরই ডাক।

৪ কণ্ঠ—ওরে ভূপাল। যা যা, তুইই যা।

(জন গুঞ্জন চলতে থাকে)

দিদিমা—ও কি হল। বৌমা। ওঁর মাথাটা আমার কোলে তুলে দাও। হে বাবা বাস্তু। তুমি এমনি করে শোধ নিলে বাবা!

অন্য কণ্ঠ—এখনই কি! এত' সবে শুরু। ভিটেয় ব্রহ্মের রক্তপাত।

২ কণ্ঠ—শালা পুরুতের ক্রিয়াকর্মে নিশ্চয়ই কোথাও গলদ ছিল। না হলে—

১ কণ্ঠ—অত ভীড় করবেন না। সরুন, সরে যান হাওয়া আসতে দিন।

৩ কণ্ঠ—রোগীকে ঘুমোতে দেবেন না।

সুরোবালা—*(উচ্চৈস্বরে কেঁদে)* দাদু! দাদু গো।

মা—বাবা! বাবা! কথা বলছেন না কেন?

বাবা—হরে নারায়ণ ব্রহ্ম। হরে নারায়ণ ব্রহ্ম।

১ কণ্ঠ—এ কি! ক্রমেই যে উনি এলিয়ে পড়ছেন!

২ কণ্ঠ—বলেছিলাম না! জাতসাপ। ফণা ছিল। উনি তবু অনেক্ষণ বাঁচলেন। ঠিকমত বিষ ঢাললে তিন মিনিটের বেশি বাঁচে না।

(জন গুঞ্জন - রোঝা এসেছে, রোঝা এসেছে।)

২ কণ্ঠ—রোঝা এসে কি করবে! রোঝা ত' আর মরা বাঁচাতে পারে না।

১ কণ্ঠ—কি মরা মরা বলছেন। ঐ ত, উনি কথা বলছেন।

২ কণ্ঠ—ওকে কি আর জ্যান্ত বলে মশাই। ও মরাই।

(জনগুঞ্জন)

ওঝা—এ ঠিক সেই খোট্টা শালারই কাজ। বিকেলে আমার কাছ থেকেই পাঁচ

টাকা দিয়ে দুটো সাপ কিনেছে।... এমন বুঝলে কি আমি তাকে সাপ বেচি মশাই। পাঁচ টাকা ছেড়ে পঞ্চাশ টাকা দিলেও দিতাম না। আমাকে বলল, সাপ মেরে ওষুধ তৈরী করব। হায় হায় হায়।

১ কণ্ঠ—হায় হায় পরে করো। আগে রোগী দেখ।

দিদিমা—রোগী দেখ বাবা।

মা—যদি ঠিক করে দিতে পার, আমার বালা জোড়া তোমায় দেব।

ওঝা—ও সব কথা থাক মা। আগে নাড়ি দেখি।

জনতা—ওঝা নাড়ি দেখছেন। ওঝাদের নাড়িজ্ঞান সাংঘাতিক।

ওঝা—জয় মা মনসা। জয় মা মনসা। কোন ভয় নেই মা। কোন ভয় নেই। আপনাদের আশীর্বাদে আর আমার পুণ্যির জোরে, তাকে দুটো বিষদাঁত ভাঙা সাপই দিয়েছিলাম দেখছি। আঃ বাঁচলাম। নরহত্যার দায় থেকে মুক্ত হলাম। বিষের কোন লক্ষণই নেই। বাঁধন খুলে দিন। রক্তপাত, বাঁধন আর ভয়ে অবশ হয়ে পড়েছিলেন। কোন চিন্তা নেই।

দিদিমা—জয় মা দুর্গা, জয় মা বিষহরি!

কর্তা—নিশ্চয় জান বিষ নেই! বিষ ছিল না!

রোঝা—আমি জানি না ত' আপনি জানবেন মশাই! আমি হলাম গিয়ে সাপের রোঝা!

কর্তা—জয় বাবা বাস্তুসাপ! রঙ্গকরে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে দিলে বাবা!

(জনতা বস্তুবাবার জয়ধ্বনি দিল। আনন্দ বাজ্রক ধ্বনি বাজতে থাকল।)

সমুদ্রবিজয়

[হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশাই এর 'বেনের মেয়ে' উপন্যাসেব অংশ অবলম্বনে।]

চরিত্র লিপি —বলাই, কাকা, একজন, ঘোষক, বিহারী দত্ত, মায়া, দত্তগিন্নী, বালিরাজ, বড়মাঝি, চন্দ্রলেখা।

[জনতাব কল-গুঞ্জন, নদীব তবঙ্গাঘাতেব শব্দ। দূবে পুবোহিতেব স্তোত্র পাঠেব শব্দ। মাঝখানে সাতবাব কামান দাগা হ'ল।]

বলাই—এ সব কি হচ্ছে কাকা।

কাকা—এ সব দেখাতেই ত' তোকে আনলাম। এত জাঁকজমক কি গাঁয়ে কখনও দেখেছিস।

বলাই—নদীতে অত বড বড নৌকা কেন কাকা? আর নৌকা নেই।

কাকা—এ ঘাট ত' রাজাব ঘাট। তাই অন্য নৌকা থাকে না।

বলাই—ওঃ। এ নৌকোগুলো বুঝি বাজাব নৌকা?

কাকা—না বে বোকা। এগুলি সবই বিহাবী দত্তেব নৌকা। তিনি আমাদেব সাতগাঁয়েব বিখ্যাত বণিক ঐ দেখ, ঐ যে খোলা তাঞ্জামে মাঝ-খানে বসে বিহারী দত্ত আব পাশে বাজামশাই নিজে।

বলাই—কেন কাকা? আজ বুঝি দত্ত মশাই এব বিয়ে।

কাকা—*(মৃদু হেসে)* দূব পাগলা। বিয়ে হবে কেন? বাজা মশাই-এব অনুমতি নিয়ে বিহাবী দত্ত আজ বাণিজ্য যাত্রা কবছেন। ঐ দেখ, ঐ দেখ বলাই। পিছনেব ঢাকা তাঞ্জামে বিহাবী দত্তব মেয়ে মায়া আব আব তাব পাশে দত্তগিন্নী।

বলাই—কি সুন্দব দেখতে। আচ্ছা কাকা। ওবা যাচ্ছে কেন? দত্তগিন্নী আব মায়াও বুঝি বাণিজ্য কববে।

কাকা—*(হো, হো কবে হেসে)* আচ্ছা পাগলা তুই। ওবা বাণিজ্য কববে কেন? এবাবে বিহাবী দত্ত ওদের সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন দেশ দেখাতে। যবদ্বীপ ---বালিদ্বীপ----সুমাত্রা----বর্ণিও---।

একজন—মশাই কি ওসব জায়গায় গেছেন না কি?

কাকা—না না! নামই শুনেছি। গল্পও। বিদেশ-যাওয়া কি আমাদেব ভাগ্যে আছে।

(ঘোড়াব খুরেব আওয়াজ এগিয়ে আসে)

ঘোষক—সরে যাও, সরে যাও। রাজা আসছেন, বিহারী দত্ত আসছেন। পথ ছাড়া---সরে যাও, সরে যাও---।

(ঘোড়ার খুরের আওয়াজ মিলিয়ে যায়। তাঞ্জাম বাহকদের হু-হুম্-না, হু-হুম-না ধ্বনি এগিয়ে আসে ক্রমে মিলিয়ে যায়।)

কাকা—দেখলি বলাই। সবাইকে ভাল করে দেখলি।

বলাই—হ্যাঁ কাকা।

কাকা—ঐ দেখ। র কাছে বিদায় নিয়ে বিহারী দত্ত নৌকায় উঠছে। ঐ দেখ রাজা মায়াকে কেমন আদর করলেন। এবার নৌকো ছাড়বে।

মাঝিদের চিৎকার—জয়! সাতগাঁর কালীর জয়। জয় গঙ্গা মায়ের জয়। জয়, বরুণদেবের জয়। জয় পাঁচ পীরের জয়।

(শঙ্খ ধ্বনি। পুরোহিতের কণ্ঠ শুভমস্তু, শুভমস্তু, শুভমস্তু। দাঁড় পড়া ও বাওয়ার শব্দ)

বলাই—নৌকোগুলো ছেড়ে দিল কাকা।

কাকা—হ্যাঁ দেখ দেখ বলাই কেমন সাদা সাদা পাল তুলে দিল।

একজন—মনে হচ্ছে এক ঝাঁক হাঁস উড়ে যাচ্ছে।

(দৃশ্যান্তরের বাজনা)

(মাঝ সমুদ্রে বহিত্রে চলছে সকালে। মায়া, দত্তগিন্নী ও বিহারী দত্ত কথোপকথন চলছে)

মায়া—আমরা কোথায় কোথায় যাব বাবা!

বিহারী দত্ত—আমরা প্রথমেই যাব বালিদ্বীপে। সেখানে আড্ডা গেড়ে কম্বুজ, যবদ্বীপ, বোর্ণিও, সুবর্ণ---এই সব দ্বীপে ঘুরে বেড়াব।

দত্তগিন্নী—এ সব দ্বীপেই কি তোমার বাণিজ্য আছে সওদাগর?

বিহারী দত্ত—হ্যাঁ। কর্মশালা আর বাণিজ্যবিভাগ সব দ্বীপেই আছে। কর্মচারীরাই সারা বছর বাণিজ্য চালায়।

মায়া—তা হলে তুমি কি করবে বাবা!

বিহারী দত্ত—আমাকে সারা বছরের আয়ব্যয়ের হিসেব দেখতে হবে। বাণিজ্যের রীতিনীতি পরীক্ষা করতে হবে, রদবদলের পরামর্শ দিতে হবে। কর্মচারী নিয়োগ বরখাস্ত করতে হবে। ভাল কর্মচারীদের পুরস্কার দিতে হবে। রাজাদের সঙ্গে আমদানী রপ্তানী নিয়ে আলোচনা করতে হবে---।

মায়া—ও বাবা! তা হলে ত' তোমার শুধুই কাজ আর কাজ! দেশ দেখা হবে কিভাবে? বেড়াবে কখন?

বিহারী দত্ত—দেখবে, ওর ভেতরেই সময় হয়ে যাবে। আর দেখবে সে সব দেশের রাজারা তোমাকে কত আদর করেন, রাজবাড়ির লোকেরাই তোমাদের কত কি দেখাবে।

দত্তগিন্নী—বিদেশে ত' যাচ্ছি! সে সব কি ভাল লাগবে? দেশের জন্য—

বিহারী দত্ত—(হেসে) এ সব দেশকে বলে বৃহত্তর-ভারত। সে সব দেশে গিয়ে আমাদের দেশের লোকেরাই রাজ্যস্থাপন করেছিল—উপনিবেশ গড়েছিল। ওদের দেশের রাজভাষা সংস্কৃত। ওদের নাম আমাদেরই মত সংস্কৃতে। যবদ্বীপের লোরো-জংগ্রামে চণ্ডীমন্দিরও দেখতে পাবে। ও সব জায়গা তোমার বিদেশ বলে মনেই হবে না। মজা কি জান, গৌড়ের চম্পার মত ওদের এক রাজ্যের নামও চম্পা।

দত্তগিন্নী—তোমরা তা হলে শুধু মালই আমদানী-রপ্তানী কর নি। ভাষা, সাহিত্য এমন কি ধর্মও রপ্তানী করেছ!

বিহারী দত্ত—(হেসে) হাঃ হাঃ হাঃ। বড় খাঁটি কথা বলেছ গিন্নী। সভ্যতা সংস্কৃতি আমদানীরপ্তানীতেও আমরা বড় অংশ নিয়ে থাকি।—আমরা, সওদাগরেরা-—এ বিষয়ে ওস্তাদ। হাঃ হাঃ হাঃ।

(দৃশ্যান্তরের বাজনা)

(জয়ধ্বনি : জয় বালীদ্বীপ মহারাজের জয়। জয় বণিক বিহারী দত্তের জয়।)

বালিরাজ—দত্ত মশাই। এবাব আপনি তা হলে ফিরে যেতে চান।

বিহারী দত্ত—প্রায় ছ'মাস আপনার দেশে কাটিয়ে গেলাম মহারাজ! আপনি যে সব দ্রব্যসামগ্রী--

বালিবাজ—সে সব দ্রব্যের অপ্রতুলতা আর নেই। বিশেষতঃ আপনাব কর্মচারীবা নিয়ত আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ বাখে। প্রয়োজন মত আমদানী রপ্তানী করে। আপনার বাণিজ্য-ব্যবস্থা সুসংহত।

বিহারী দত্ত—এ সবই আপনাদের শুভকামনাব ফল। মহারাজ আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহের অভাব নেই। কিন্তু এবারে এখনও গৌড় বাজের প্রতি—

বালিরাজা—আমার শুভেচ্ছা পত্র প্রস্তুত বণিকবর। মন্ত্রী মশাই যথাসময়ে জতুমোহর করে আপনার হাতে দেবেন।

বিহারী দত্ত—অনুমতি করুন, যাত্রার আয়োজন করি।

বালিরাজ—নিশ্চয়ই করবেন। কিন্তু আপনার এই কন্যাটি--

বিহারী দত্ত—(শশব্যস্তে) এ কি মায়া! তুমি মহারাজের—

বালিরাজ—বকবেন না বণিক। ওর স্পর্শে আমার অঙ্ক ধন্য হল। আপনার কন্যা শুধু নামে মায়া নয়—সে প্রকৃতই মায়াময়। রাজমহিষীকে কীর্তন শিখিয়েছে।

মায়া—এই দেখো বাবা। আমার গা বোঝাই কত গহনা। মহারানী নিজে আমায় পরিয়ে দিয়েছেন। আমি নিতে চাইনি। কিন্তু তার উত্তরে কি বললেন জান?

বালিরাজ—মহারানী বললেন, ওটুকু তোমার কীর্তন শেখাবার গুরুদক্ষিণা।

(সকলে হেসে ওঠেন।)

(দৃশ্যান্তরের ধ্বনি)

(স্বাভাবিক সমুদ্রোচ্ছাস এবং দাঁড় বওয়ার শব্দ)

দত্তগিন্নী—কি সুনীল আকাশ। কি গভীর নীল সমুদ্র। বড় ভাল লাগছে সওদাগর।

বিহারী দত্ত—তোমরা সঙ্গে আছ, এবার আমারও খুব আনন্দ। আর এবারে আমার যা লাভ হয়েছে তা— জান, সবই আমার মেয়ের পয়। মেয়ে বড় পয়মন্ত।

(দূর থেকে বাবা বাবা করে ডাকতে ডাকতে মায়া ছুটে আসে)

মায়া—বাবা! কাছে দূরে যত বহিত্র দেখছি, সব আমাদের?

বিহারী দত্ত—হ্যাঁ মা। সাত খানা নৌকা নিয়ে যাত্রা করেছিলাম। উণপঞ্চাশ খানা নিয়ে ফিরে চলেছি। গুণলে দেখাবে আমাদের বহরে উণপঞ্চাশ খানা ডিঙ্গা আছে।

দত্ত-গিন্নী—সব গুলিই কি বাণিজ্য-পন্যে বোঝাই?

বিহারী—না। চল্লিশখানা বাণিজ্যতরী। বাকী গুলিতে আছে খাদ্য পানীয় আর অস্ত্রশস্ত্র। এবার সবচেয়ে মহার্ঘ্য দ্রব্য কি নিয়ে চলেছি জান? সাত নৌকা বোঝাই গর্জন তেল।

মায়া—দেশে পৌঁছাতে কতদিন লাগবে বাবা? আর ভাল লাগছে না। কবে যে সাত গাঁয় পৌঁছাব—কালী বাড়ি যাব, খেলুড়ীদের সঙ্গে খেলব।

(নিচু থেকে মাঝির ডাক : সওদাগর। সওদাগর)

বিহারী দত্ত—তুমি মায়ের কাছ বস মায়া। আমি নিচে যাই। বড় মাঝি ডাকছে। যাই মাঝি (সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামলেন) কি সংবাদ বড় মাঝি।

বড় মাঝি—গতিক সুবিধের নয়। দক্ষিণপূর্ব কোণে ঐ যে কালো মেঘ খানা দেখছেন, উটি সুবিধের নয়। একটু বাদেই ভয়ানক ঝড় উঠবে। আপনারা নিজের কামরায় যান। বেশি নড়চড়া করবেন না। সাবধান। আমি চললুম।

(মাঝি চলে যায়। দূর থেকে তার চিৎকার শোনা যায়)

বড় মাঝি—হো চড়ন্দার ভাই হো। কামরায় যান। বাইরে থাকবেন না। ঝড় আসছে। মাস্তুলদার! সামাল হো! পাল নামাও। পাল নামাও। গুটিয়ে ফেল। না হলে নৌকা গুজরে জলের তলায় চলে যাবে। হো দাঁড়ি! দাঁড় বাওয়া বন্ধ কর।

(দূরে ঝড়ের শব্দ। পাল নামান ওটানর হড় হড় গড় গড় শব্দ। শুরু হ'ল জলের ঝাপটার শব্দ।)

চড়ন্দার ১—গেল গেল ডুবে গেল।

চড়ন্দার ২—অত সহজ নয়। এ হ'ল বাঙলার পাটনী মাঝি। বড় শক্ত মাঝি হাল চেপে ধরলেই নৌকা সোজা হয়।

চড়ন্দার ৩—*(আতঙ্ক ও বিস্ময় মিশ্রিত)* হাই বাপ। ঢেউ দেখেছ। এক একটা সিকি মাইল, আধ মাইল লম্বা।

চড়ন্দার ১—গেল, গেল এবার। ঐ ঢেউ এসে----

(বড় ঢেউ এসে জাহাজ ধুয়ে নিয়ে গেল)

চড়ন্দার ১—হাই বাপ। ডুবতে ডুবতে বেঁচেছি। ঝড়ের জল মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল।

চড়ন্দার ২—তুই কেন মাঝি হয়েছিল বাপ! কিছুই বুঝিস্ না! এমন ঝড় আসবে ত' জাহাজ ছাড়লি কেন?

মাঝি—জাহাজ ছেড়েছি পনের দিন আগে। মাঝিত' ছাড়। কোন জ্যোতিষীও পনের দিন আগে ঝড়ের খবর — আঃ। দাঁড়ি ভাইরা সামলে---

(তীব্র ঢেউ এর শব্দ)

চড়ন্দাব ৩—*(জল খেতে খেতে)* জানিস মাঝি! সংঘায় বিহারী দত্ত আছে। সে যদি ডোবে বাঙলাদেশ অন্ধকার হয়ে যাবে।

মাঝি—আপনি বাঁচলে বাপের নাম। বিহারী দত্তর টাকা আছে। সে মরলেও যারা থাকবে তারা বাঁচবে। কিন্তু আমরা মরলে! আমাদের প্রাণের দাম বিহরীদত্তের থেকেও বেশি।

চড়ন্দার ১—তোদের ত' বড়ই আস্পর্দা। তোরা বিহারীদত্তকে...

মাঝি—যাও যাও। নিজের ঘরে যাও। আমাদের কাজ করতে দাও।

(সকলের চিৎকাব। সামাল সামাল। ঢেউ, ঢেউ। গেল, গেল। জয় মা কালী। রক্ষা কর মা --- ঢেউ ভেঙ্গে পডার শব্দ। শো শো শব্দ। গোঁ গোঁ সামুদ্রিক ধ্বনি।)

(দৃশ্যান্তর)

(ঐ শব্দ চলছে)

দত্ত গিন্নী—কিছুতেই ত' মায়ার মূর্চ্ছা ভাঙ্গছে না। দাঁত কপাটি লেগেছে।

বিহারী দত্ত—জলের ঝাপটা দাও। আরো দাও।

দত্ত-গিন্নী—আমারও গা ঘোলান শুরু হয়েছে। কেমন বমি বমি *(বমির শব্দ)*

বিহারী দত্ত—সেঁওতি এগিয়ে দাও। সেঁওতি এগিয়ে দাও *(আরও উচ্চ কণ্ঠে)* সনাতন, সনাতন। বড় মাঝিকে ডাক।

(দৃশ্যান্তর)

(শব্দ চলছে)

পাটনী—বিহারী দত্তই ডাকুক আর আমার বাবাই ডাকুক,হাল ছেড়ে নড়তে পারব না।

(বিহারী দত্ত মাঝি, বড় মাঝি বলতে বলতে দূর থেকে ছুটে এসে ব্যাকুল কণ্ঠে বলতে থাকে—)

বিহারী দত্ত—মাঝি, বড় মাঝি। আমি নিজেই ছুটে এসেছি। আমার মেয়ে মরণাপন্ন, স্ত্রী ক্রমাগত বমি করছে। আমাদের রক্ষা কর বড় মাঝি!

বড় মাঝি—ঝড় না থামলে কি করা যাবে সওদাগর।

বিহারী দত্ত—তুমি পার মাঝি। তুমি পার। আমি শুনেছি বাঙলার পাটনী মাঝি ঝড়ও থামাতে পারে। তুমি পার না!

বড় মাঝি—পারি। সে সুযোগও আছে। কিন্তু তাতে আপনার সাত আট লাখ টাকার ক্ষতি হবে।

বিহারী দত্ত—আমার যথাসর্বস্ব যাক। তুমি আমার স্ত্রী কন্যার প্রাণ বাঁচাও

বড়মাঝি—বেশ যান। ঘরে যান। দেখি আমি কি করতে পারি *(চিৎকার করে)* হো মাল্লার দল। গর্জন তেলের নৌকা গুলো পাশে আন।---দেরী নয়---সাজাও পাটাতনের ওপর---মুখ খোলো--প্রস্তুত থাকবে--ঐ ঢেউ আসছে। ঢেউ কাছে এলেই সকলে এক সঙ্গে তেল ঢালাতে --প্রস্তুত!*(দূর থেকে শো শো শব্দে ঢেউ আসছে)* ঢেউ এসে গেছে। ঢাল তেল! ঢাল!!

চড়ন্দারদের চিৎকার--গেল! গেল! বাঁচাও! বাঁচাও!!

(ঢেউ পিছিয়ে যাওয়ার শব্দ।

চড়ন্দারেররা—ঢেউ পিছিয়ে গেল। জাদু! জাদু! জয় বরুণদেবের জয়। জয় বাঙলার পাটনী মাঝির জয়।

বড় মাঝি—*(চেঁচিয়ে)* তেল ঢালা বন্ধ কর; আবার ঢেউ এলে ঢালবে।

(দৃশ্যান্তর)

(সমুদ্র ঝড় চলছে। দূরে)

বিহারী দত্ত—মায়া! এখন কেমন বোধ করছ মা!

মায়া—ভাল বাবা।

দত্ত-গিন্নী—সওদাগর! আশ্চর্য কাণ্ড। বাতাসের জোর তেমনি আছে। কিন্তু ঢেউ আর উঠছে না। সমুদ্র দর্পনের মত স্থির।

বিহারী দত্ত—আমার পুরোন মাঝি ধনঞ্জয় যখন আসতে চাইল না, তার বদলে দিল তার ছেলে নবীনকে, তখন আমার ভয় ছিল কিন্তু নবীন আমায় অবাক করেছে।

দত্ত-গিন্না—দেশে ফিরে ওকে তুমি যথেচ্ছ পুরস্কার দিও।

বড় মাঝি—দত্ত মশাই! আপনি আমার অন্নদাতা মনিব। আপনি ডাকলেও আমি ঝড়ের মধ্যে আসতে পারি নি।

বিহারী দত্ত—তুমি ঠিকই করেছ নবীন। তোমার কর্তব্যজ্ঞানে আমি খুশি হয়েছি। আর তোমার যে কৃতিত্ব আজ দেখালে---

বড় মাঝি—কৃতিত্ব আমার নয় দত্ত মশাই। কৃতিত্ব গুরুর কাছে শেখা বিদ্যের। আমি যথাস্থানে প্রয়োগ করেছি মাত্র। ঐ দেখুন দূরে ঝড় উথাল-পাথাল করছে। আমাদের জলযান স্থির। ঐ দেখুন আপনার উনপঞ্চাশ ডিঙ্গা দেখা যাচ্ছে।

মায়া—আমরা কবে দেশে পৌঁছাব বাবা।

বড় মাঝি—ঝড়ে আমাদের বড় উপকার করেছে মা। আমরা সাত আটদিনের পথ চলে এসেছি এক বেলায়। আজ সন্ধ্যের আগেই হোক বা একটু পরেই হোক গঙ্গার মোহনায় পৌঁছে যাব।

(দূর ঝড়ে শব্দকে ছাপিয়ে আনন্দ ধ্বনি উঠতে থাকে।)

চোখ

(উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর সমনামের গল্প অবলম্বনে)

চরিত্রলিপি : প্রাণনাথজেঠিয়া, শম্ভু ঘোষ, ডঃ ব্যানার্জি, রাকেশ জেঠিয়া

প্রাণনাথ—শম্ভুবাবু, লোকে আপনাকে কি জানে?

শম্ভু—প্রাদেশিক নেতা।

প্রাণনাথ—হ্যাঁ। জানে আপনার ক্ষমতা মন্ত্রীর মত — কোথা বেশি বৈ ত' কম নয়।

শম্ভু—ও সব কথা ছেড়ে দিন। আপনার কাছে আমি নেতাও নই, মন্ত্রী নই। আমি—

প্রাণনাথ—আমি কে?

শম্ভু—আপনি প্রাণনাথ জেঠিয়া। ববদা কটন মিলসের---

প্রাণনাথ—রাকেশ আমার কে?

শম্ভু—আপনার একমাত্র ছেলে, ভবিষ্যতে—

প্রাণনাথ—*(আকস্মিক ভাবে তপ্ত হয়ে)* তবে, কোন সাহসে আপনারা রাকেশকে পাঠিয়েছিলেন?

শম্ভু—*(বিনীত ও অনুতপ্ত কণ্ঠে)* এটাই একটা ব্লাণ্ডার হয়ে গেছে।

প্রাণনাথ—ব্লাণ্ডার! আমি যদি বলি, দিস ইজ কনসপিরেসি।

শম্ভু—*(বিস্ময়ে)* এটা আপনি কি বলছেন জেঠিয়া সাহেব।

প্রাণনাথ—*(ধমক দিয়ে)* আমি কারেক্ট বলছি — সচ বলছি। এর নাম রাজনীতি। আপনি আমাকে আলতু-ফালতু বাত বোঝাবেন না। *(একটু থেমে, সুর বদলে)* যে ছেলে চামচ ছাড়া খেতে জানে না — আপনারা কি করে — কি করে তাকে বুম ক্যারি করতে দিলেন? বিশু কোথায় ছিল? জগা? কাল্লু? হুলো? মাস মাস এত্তোটাকা নেন কি ফুর্তির জন্য? হারামিরা ফুর্তি করবে আর এই দুধের শিশুগুলো এসস্টাইক ভাঙ্গবে? মতলবটা কী?

শম্ভু—না, না---আসলে কলেজের স্টাইক ত'।

প্রাণনাথ—কলেজের স্ট্রাইক ত' কি?

শম্ভু—মানে কথা ছিল কলেজের ছেলেরা সামনে থাকবে, আর পিছনে—

প্রাণনাথ—এতটা সতী আপনারা কবে হলেন?-- কি বুদ্ধি। কচি ছেলে গুলো সামনে থাকবে আর আপনারা---- বাঃ—বাঃ, বহুৎবুদ্ধি! তা শম্ভু বাবু!

তুমিত' বেশ আছ। লেকিন রাকেশের চোখ দুটো কে দিবে? তার চোখ দুটোর কি হবে? ইর পরও আপনেরা ইডিয়টের মত আর্গুমেন্ট দিচ্ছেন?

(দৃশ্যান্তর-সূচক ধ্বনি)

প্রাণনাথ—ডক্টর সাহাব।

ডাক্তার—বলুন।

প্রাণনাথ—আপনি কি পার্টি করেন?

ডাক্তার—*(বিস্ময়ে)* পার্টি! কেন বলুন ত! *(হো হো করে হেসে)* আচ্ছা, আচ্ছা! ঐ ছবি! ওটা ডাঃ কোটনিসের। উনিও একজন ডাক্তার ছিলেন।

প্রাণনাথ—মে বি। কিন্তু কোলকাতার একটা কমিনিষ্ট পার্টির ঘরে এ রকম পিকচার আমি দেখেছি।

ডাক্তার—হয়ত'। তবে উনিও একজন ডাক্তার—এ দেশেরই ডাক্তার। চীনের মানুষের---

প্রাণনাথ—হ্যাঁ, হ্যাঁ।--- কাম টু দি পয়েন্ট। চীনা——।

শম্ভু—মিঃ জেঠিয়া। আমাদের আসল কথাটা--

প্রাণনাথ—হাঁ - আমি প্রেমনাথ জেঠিয়া। বরোদ কটন মিলাসের ছুট মালিক। আর ইনি শম্ভু বোস - একজন মস্ত বড় লীডার।

ডাক্তার—ওঃ আচ্ছা!

প্রাণনাথ—আমরা খোবর পেলুম কি, অপেনাদের এখানে দুটো চোখ জমা পড়িয়েছি।

ডাক্তার—চোখ।

প্রাণনাথ—হাঁ, হাঁ। মানুষের চোখ।

ডাক্তার—ও। *(হেসে)* ওটাকে চোখ বলে না-

প্রাণনাথ—আরে মোশাই যাই বলুক, যেই নাম থাক,—আমার ঐ চোখ দুটো চাই—মাষ্ট।'

ডাক্তার—কিন্তু তা কী করে সম্ভব!

প্রাণনাথ—কেনো নয়?

ডাক্তার—যাঁর জিনিষ তাঁর মতামত, তার উইল কি বলছে?

প্রাণনাথ—কার আবার জিনিষ। উটা ত' এখন গভর্নমেণ্টের প্রপাটি?

ডাক্তার—কিন্তু যে মানুষটা আইব্যাঙ্কে তার নিজের—

প্রাণনাথ—বস্ বস। এটা দেখুন। *(কাগজের খর খর শব্দ হয়)* হাঁ। চিঠিটা পড়েন। ডক্টর। গভর্ণমেন্ট অর্ডার।---আপনে ডাক্তার। আপনেকে বলতে এসেছি, আপনে ঠিক ঠিক মতন চোখটা আমার ছেলের চোখে লাগিয়ে দেবেন। আমার ওনলি সান—চাইল্ড।

ডাক্তার—*(চিঠির খর্ খর্ শব্দ)* গভমেণ্ট অর্ডার, কিন্তু নৈতিকতার দিক থেকে মানে বলছিলাম, আইনগত দিক থেকেও কি ব্যাপারটা ঠিক হবে।

প্রাণনাথ—ডক্টর! - ইউ আর টু ইয়ং। তাই আপনে কুনটা ঠিক, কুনটা বেঠিক, এ নিয়ে দু বছর মাথা ঘামাবেন। তারপর দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে। আপনে আজ ডক্টর আছেন, কাল যে আপনে ফালতু পেশেণ্ট বনে যাবেন না—ই গ্যারাণ্টি দিতে পারেন? আপনি বরং বলুন—আপনি কি রকম চান?

ডাক্তার--*(গর্জে)* মানে?

প্রাণনাথ—আরে! আপনি এক্সাইটেড হোচ্ছেন। এতে এক্সাইটেড হওয়ার কিছু নাই। আপনার পার্টির নেতারাও ত' হরবকৎ লিচ্ছে — আপনে কেন নেবেন না?

ডাক্তার—আপনি ভুল করছেন। আমি কোন পার্টি-মার্টি করি না। আমি একজন মানুষ হিসাবে বলছি কাজটা আপনারা ঠিক করছেন না।

প্রাণনাথ—ডাক্তার। আমিও আপনাকে মানুষ হিসাবে একটা ছুট্ট প্রশ্ন করছি--আপনার নিজের একমাত্র ছেলের চোখটা যদি নোষ্ট হয়ে যায়, যদি সে আর পৃথিবী দেখতে না পায়— অমন দুধের শিশু যদি অন্ধ বনে যায়--আপনে মানুষ হয়ে, বাপ হয়ে কি স্টেপ লিতেন?

শম্ভু—আপনার এ্যাতো আপত্তি কেন? আর ইণ্টারেস্টটাই বা কি? এতে আপনার চাকরিরও ক্ষতি নেই, বদলিরও সম্ভাবনা নেই। বরং উল্টোটা করলে---

ডাক্তার—ভয় দেখাচ্ছেন?

শম্ভু—*(উত্তেজিত হয়ে)* যদি দেখাই কিছু বলার---

প্রাণনাথ—*(ধমক দিয়ে)* কি আলতু-ফালতু শুরু করছেন---শুনুন ডাক্তার সাব। আপনি যদি আমার রাকেশকে দেখতেন—আপনে স্যাটিসফাই হতেন। অ্যাডুকেটেড, স্মার্ট, বহুৎ ইংরেজী লেখাপড়া আছে। এই যে শম্ভুকে দেখছেন – লিডার – এর যতো অ্যাপলিকেশন, আর্জেণ্ট লেটার সব রাকেশই করে দেয়।

শম্ভু—তা হলে ওঠা থাক।

প্রাণনাথ—আপনে একটু নজর দিয়ে কাজটা করবেন। আপনি ডক্টর। লেবার নন। আপনাকে সম্মান জানিয়েই বলছি—আপনি মন দিয়ে ----আমি ডাইরেক্টর সাহেবকে বলেছি। ওন্যো কোনো ত্রুটি হোবে না। আচ্ছা, নমোস্কার। *(বেরিয়ে যাবার পদশব্দ। দরজার শব্দ)*

ডাক্তার—*(চাপা স্বরে)* শালা। সোয়াইন। শুয়োরের বাচ্চা। *(টেলিফোন বেজে ওঠে)* হ্যালো! ইয়েস, ডক্টর ব্যাণার্জি স্পিকিং---স্যার!---হ্যাঁ, হ্যাঁ---এই ত ওরা গেলেন---কিন্তু স্যার-----ও,----হ্যাঁ---ঠিক আছে, ঠিক আছে---ঠিক---

(দৃশ্যান্তরের ধ্বনি)

ঘোষক—তিনদিন পার হয়ে গেছে। আবার প্রাণনাথ জেঠিয়া এসেছেন ডাক্তার ব্যাণার্জির অফিসে—চেম্বারে।

প্রাণনাথ—ডক্তর। আপনি শম্ভুর কথায় রেগে গেছেন?

ডাক্তার—*(যেন মাথা নাড়েন। পরে বলেন)* না।

প্রাণনাথ—ইয়ং লিডার ত'। হট-টেম্পার আছে। আরে ই সব কাজ কি হট টেম্পারের।

ডাক্তার—*(গম্ভীর কণ্ঠে)* শুনুন। আগামীকাল আপনার ছেলের কেস—টাইম সকাল ১০ টা। আপনাকে আগে বণ্ড সই করতে হবে। তাতেও আপত্তি নেই ত!

প্রাণনাথ—আরে না, না! তবে আমার একটা ছোট্ট কথা ছিল।

ডাক্তার—কিন্তু—

প্রাণনাথ—নেভার মাইণ্ড। আপনাকে বেশি আটকাব না—জলদি ছাড়িয়ে দেব। আমি বলছিলাম কি—ও চোখ দুটো কার ছিল।

ডাক্তার—মানে?

প্রাণনাথ—মানে আমার একমাত্র ছেলে ত'। তাই মনটা চঞ্চল আছে। মিসেসও জানতে চাইছেন কি, ঐ চোখ দুটো কার,—মানে কুন লুকের ছিল?

ডাক্তার—এটা জেনে আপনার কোনো ফয়দা হবে না।

প্রাণনাথ—আরে আপনি ভুল বুঝছেন। আমি শুধু জানতে চাইছি, কী জাতের লুকটা ছিল?

ডাক্তার--বুঝলাম। কিন্তু সেটা জেনে কি আপনার কোন লাভ হবে?

প্রাণনাথ—কি বলছেন ডক্তর! ফাদার হিসাবে আমার মনটা খুশি হবে না, যদি হোল ইয়েটা—হিস্ট্রিটা আমি জানতে পারি। আমার একমাত্র ছেলে। ---একটা সামান্য শাড়ি কি আপনি একবারে পছন্দ করে কিনতে পারেন? সিলেকসন করবেন না?

ডাক্তার—তাও বটে *(বেল বাজান। দরজা খুলে 'স্যার' বলে বেয়ারা আসে)* পাঁচ নম্বর আলমারিতে ৩২/১/৩৩৪ নম্বর ফাইলটা নিয়ে এসো *(বিরক্তির সঙ্গে)* এ সব আগে জেনে নেন নি কেন?

প্রাণনাথ—না, না, অত জরুরী নয়—তবে, ডক্টর আপনি সাধি করেন নি?

ডাক্তার—আজ্ঞে হ্যাঁ।

প্রাণনাথ—বাচ্চা আছে?

ডাক্তার—না। তবে বাজা নাই।

প্রাণনাথ—*(হাসেন)* হ্যাঁ, হ্যাঁ—ফেমিলি প্লেনিং।

বেয়ারা—স্যার। ফাইল।

ডাক্তার—গোটা কাহিনীটাই আমার অন্তরে মুখস্থ। তবে ডকুমেন্ট ছাড়া আপনাকে জানাতে রাজী নই, তাই পড়ছি। শুনুন।

প্রাণনাথ—পড়ুন।

ডাক্তার—নাম ঈশ্বর রাও। পেশা ঃ মেশিন অপারেটার। কর্মস্থল ঃ বরোদা কটন মিলস্। ঠিকানা ঃ নানুর। জেলা বিজয়বাড়, অন্ধ্র। রাজনৈতিক পরিচিতিঃ একজন উগ্রপন্থী শ্রমিক নেতা। সাতটি খুন, তেরটি ডাকাতি এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ায় বিচারাধীন আসামী ছিলেন। ১৯৭২ সালের ১০ই মে গ্রেপ্তার হন। বিচারে ফাঁসি হয়। ফাঁসির—

প্রাণনাথ—*(উত্তেজিত)* ওয়েট, ওয়েট। *(একটু থেমে)* ই পোরসনটা ফির্ রিপিট করুন।

ডাক্তার—নাম ঈশ্বর রাও। পেশাঃ মেশিন অপারেটার। কর্মস্থলঃ বরোদা কটন মিলস্। ঠিকানাঃ নানুর। জেলাঃ বিজয়বাড়, অন্ধ্র। রাজনৈতিক পরিচিতি ঃ এককজন উগ্রপন্থী শ্রমিক নেতা। সাতটি খুন, তেরটি ডাকাতি—

প্রাণনাথ—অল রাইট, অল রাইট। আপনে পরের পোরশন পড়ুন।

ডাক্তার—*(গলা তুলে আবেগের সঙ্গে)* শ্রী রাও মৃত্যুর আগে অর্থাৎ ফাঁসি হওয়ার আগের রাতে কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে যান—মরতে আমার ভয় নেই। তবে আমি আবেদন করছি আমাকে ফাঁসিতে লটকাবার আগে যেন আমার চোখ দুটোকে খুলে নেওয়া হয়।

কারণ, আমি আমার চোখ দুটো খেটে খাওয়া মানুষদের দিয়ে যেতে চাই। বেঁচে থাকতে আমি আমার স্বপ্নের বাস্তব রূপ দেখে যেতে পারলাম না। তাতে আমি হতাশ নই। কারণ আমার বিশ্বাসঃ আমার এই চোখ দুটো আমার স্বপ্নের বাস্তব রূপ দেখবে।—সংক্ষেপে এই হ'ল---

প্রাণনাথ—স্কাউনড্রাল। *(একটু থেমে)* হি ইজ এ ক্রিমিনাল। ব্যাস্টার্ড। আপনি ঠিক ঠিক—

ডাক্তার—নিজর চোখে দেখুন। একটু তাড়াতাড়ি করুন।

প্রাণনাথ—আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না!

ডাক্তার—মানে!

প্রাণনাথ—মানে বুঝতে আপনের মত শিক্ষিত লুকের অসুবিধা হচ্ছে? আপনি কি আশা করেন যে আমার ছেলে লেবার হোবে?

ডাক্তার—আমার চাওয়াচাউয়িতে—

প্রাণনাথ—শুনুন ডাক্তার। আমার ছেলের চোখে আমি লেবারের চোখ লাগাব না। ডু ইউ আনডারস্ট্যাণ্ড।

ডাক্তার—তাহলে কাল—

প্রাণনাথ—কেনসেল! *(তীব্র শব্দে পর্বশেষ হ'ল)*

(দৃশ্যান্তর)

রাকেশ—*(উত্তেজিত)* আপকো গলদ ক্যায়সী হো রহী হ্যায় পিতাজী! লেবর উবর কি বাত ছোড়িয়ে — অভি হামকো আঁখি কি জরুরত হ্যায়।

প্রাণনাথ—নেহি, নেহি। ইয়ে ক্যায়সে হো সকতা। ইয়ে মেরা ইজ্জতকা সওয়াল হ্যায়।

রাকেশ—ডোণ্ট বি ওরিড়, পিতাজী। পহলে মেরা আঁখতো মিল জানে দোজিয়ে, ফির দিখাতা হুঁ খেল।

প্রাণনাথ—নেহি নেহি। ইয়ে ক্যায়সে হো সকতা! ক্যায়সে এক ক্রিমিন্যাল-স্কাউন্ড্রাল ডাকুকা আঁখ মেরা এক লওতো বেটাকো আঁখসে-

রাকেশ—আপকে সব ওল্ড ভ্যালুজ ছোড়নি পরেগি। অব্ ও জামানা নেহী হ্যায়। আজকে জামানেমে লোক চান্দমে যা রহী হ্যায়। আউর আপ আঁখকে কাস্ট দেখ রহে হ্যায়। আই প্রমিজ্ টু ইউ—ইসি আঁখসে হি, আই উইল বি ভেরী শকসেসফুল ইন হ্যাণ্ডলিং লেবর ডিস্পিউট, বেটার দেন ইউ।

প্রাণনাথ—*(ভাঙ্গা গলায়)* এ্যায়সা কাম নেহি হো সকতা, বেটা। এ্যাইসা নেহি----ইয়ে মেরা ইজ্জতকা সওয়াল হ্যায়। নেহি, নেহি, ইয়ে ক্যায়সে হো----

রাকেশ—অভি আপ ঘর যাইয়ে, পিতাজী! থিঙ্ক এগেইন! থিঙ্ক এগেইন —হোয়াট ইউ আর গোয়িং টু ডু।

(দৃশ্যান্তর)

টক টক করে ঘড়ির পেণ্ডুলাম দুলছে। তার সঙ্গে পদচারণার শব্দ।

প্রাণনাথ—*(মৃদুভাবে)* নেহি, নেহি---দিস্ ইজ কন্স্পিরাসি।---আমার থেকে আমারই মিলের লেবার বড় হয়ে যাবে!---ইম্পসিবল---রাকেশ, রাকেশ---মাই বয়---ওকি! রাকেশের মুখ অত ঘামে ভেজা কেন?---ওর মুখে দাড়ি---চুল বড় বড়---ওর রং বদলে যাচ্ছে---পরণে হাফ প্যান্ট---কুলির সাজ---রাকেশ!---একি। একি! রাকেশের মুখে যেন ঈশ্বর রাও হাসছে। বিকট হাসি----চোখ জ্বলছে---পিছনে কুলির দল---তার হাতে অস্ত্র, মারতে আসছে--- এ কি করে হ'ল---*(যেন টলতে টলতে পিছু হটছে) (মিনতি করে)* রাকেশ, রাকেশ, রাকেশ (গর্জে উঠে) রা--কে---শ! *(একটু বিরতি, ক্লান্ত, অবসন্ন কণ্ঠে বলতে থাকেন,)* নেহি নেহি। এইশা নেহি হো সাকতা। ক্যায়সে এক ক্রিমিন্যাল, স্কাউণ্ডাল, ডাকুকা আঁখ--নেভার---নেভার।

(দৃশ্যান্তর)

ডাক্তার—*(নিরাসক্ত কণ্ঠে)* কি ঠিক করলেন?

প্রাণনাথ—*(রুক্ষ অমার্জিত কণ্ঠে)* সেটাত' কালই জানিয়ে দিয়েছি।---আপনে জানেন, ও জানোয়ারটা কে ছিল?

ডাক্তার—ঐ রিপোর্ট থেকে যতটুকু পেয়েছি।

প্রাণনাথ—হাঁ। তার বেশি এগুবেন না।---আমার ওয়ার্কশপে এই হারামির জন্য প্রায় এক বছর বহুৎ ঝঞ্ঝাট গেছে। আমি মালিক—কিন্তু আমি এ দিকের রাইট মানি। কত ইউনিয়ন এলো, গেল— এষ্ট্রাইকও হয়েছে—আলোচনা করেছে--ব্যস! মিটে গ্যাছে। আমরা তাদের দেখেছি। তারাও আমাদের দেখেছে। কিন্তু এই শুয়োরের বাচ্চা একটা স্কাউন্ড্রাল। কারখানায় ডার্টি পোলেটিক্স নিয়ে এল। কুথাকার কুন লেবাররা পার্টি করতে গিয়ে জেল খাটছে, বলে তাদের মুক্তি চাই। ওর দাদাটা হাতেনাতে মারা পড়ল। কিন্তু ঐ শালা ফসকে গেল। আমার দাদাকে এই খুন করেছে। জানেন, তার এক মাত্র ছেলে, বয়েস ২৫। বৌদির কি অবস্থা।

(একটু বিরতি)

দেড়মাস বাদে আমি বহু টাকা খরচ করে লিডারদের ধমকে-ধামকে শালাকে ধরে ফেলি। পুলিশ তখনই ফায়ার কোরতে যাচ্ছিল। আমি বাধা দিলাম। আমি চেয়েছিলাম ~~ওর ফাঁসি~~ হোক। ওর পরিবার দেখুক, ওর সন্তান দেখুক। আই অ্যাম শাকসেসফুল। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না,—গভর্নমেন্ট এবং আপনারা কী করে তার—ঐ ক্রিমিনালের চোখ দুটো একসেপ্ট করলেন? হাউ ইট পসিবিল। এটা কি করে ল'তে হয়।

ডাক্তার—আমি সাধারণ সরকারী চাকুরে। আমি কি করে বলব?

প্রাণনাথ—*(গম্ভীর কণ্ঠে, আদেশের সুরে)* শুনুন ডক্টর। আমি ছেলেকে নিয়ে যাচ্ছি। আমি যে সোব্বনাশ করতে যাচ্ছিলাম, সেটা যেন আর না হয় এবং সে জন্য একজন সমাজসেবী হিসাবে আমি আপনাকে, দেশের সিটিজেন হিসাবে দুটো কাজ করতে বলছি : এক, আপনি আমার রাকেশের জন্য কোনও শরীফ আদমীর চোখ জোগাড় করুন— যা টাকা লাগে আমি দেবো।

ডাক্তার—দেখব *(চেয়ার ঠেলে উঠে পড়েন)*

প্রাণনাথ—দাঁড়ান! আর দু নম্বর কাজ হলো—আপনি ঐ চোখ দুটোকে হয় সরিয়ে দিন নয়ত' ডেস্টয় করে দিন। আমি আপনার সিকিউরিটি। কুনো শালার সাহস নেই কিছু করবার।

ডাক্তার—কিন্তু--

প্রাণনাথ—ঘাবড়াবার কিছু নেই। আপনার বয়স কম—আপনারও একটা ভবিষ্যৎ আছে।

ডাক্তার—পারব না।

প্রাণনাথ—কেন পারবেন না! আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলুন—কেন পারবেন না।

(ডাক্তার যেন ঈশ্বর রাও এর কণ্ঠ শুনতে পানঃ আমার বিশ্বাস, আমার চোখ দুটো আমার স্বপ্নের বাস্তব রূপ দেখতে পাবে।)

ডাক্তার—না, না, আমি পারব না। ঐ চোখ দুটোর দিকে তাকিয়েই পারব না।

(ডাক্তার দ্রুত বেরিয়ে যায়)

প্রাণনাথ—ডক্টর! ডক্-টর্! ডক্-টর্।

পারিবারিক

(সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পারিবারিক' গল্প অবলম্বনে।)

চরিত্রাবলী—অমিত, রত্না, মা, পরমেশ, শশাঙ্ক, শৈলেন, বাবা, প্রদীপ, রঞ্জন।

বাথকমে ঝবঝব কবে জল পডাব শব্দ হয়। অমিত স্নান কবছে। গুণগুণ কবে গান গাইছে অমিত, জলপডা বন্ধ হয়। মাথা-মোছা গা-মোছা চলে। তাবপব ছিটকিনি খোলা ও দবজা খোলাব শব্দ শোনা যায়। দবজা খোলা হতেই দূব থেকে বাসনেব বিস্রাব টুং টাং শব্দ আসে। অমিতেব গুণগুণানি বন্ধ হয়।

আমিত—ইস বড্ড ঠোঁট ফেটেছে। ---এই দিদি---দিদি! কি করছিল জানালাব ধাবে দাঁডিয়ে! একটু তাকা না।---*(যেন দিদি তাকিয়েছে)* একটু গ্লিসাবিন দে না।

বত্না—*(ধবা গলায়)* নেই।

অমিত—*(বিস্ময়ে)* নেই। *(ঘডি দেখে)* ওঃ বাবা। পৌনে দশটা। *(চেঁচিয়ে)* মা ভাত বাবো। *(চুল আচডায়)* ইস। চিরুনীটায় চুল বাধিয়ে বেখেছিস। ফেলিস না কেন?

মা—*(দূব থেকে)* আয় খোকা। ভাত দিয়েছি।

অমিত—*(চেচিযে)* যাই। *(একটু থেমে)* যাবে দিদি। আজ অফিসে যাবিনে।---যা বাবা। *(ট্রয়াব খুলে কাগজপত্র নেয়)* এই, দিদি। আজ পাঁচটা টাকা দিবি? তুই সব শুদ্ধ সাতাশ টাকা পাবি। আসছে মাসে সব দিয়ে দেব। কথা দিচ্ছি --তোব গা ছুঁয়ে বলছি, সামনেব মাসেই---কথা দিচ্ছি---বিশ্বাস কব।

(শব্দে বোঝা যায়, বত্না আলমাবী খোলে)

বত্না—এই নে। দশটাকা।

অমিত—না না বেশি দরকাব নেই। পাঁচ টাকাতেই হবে।

বত্না--আমার কাছে খুচবো নেই।

অমিত—আচ্ছা, বাকি পাঁচ টাকা তোকে বিকেলেই ফেবত দেব।

মা—*(দূব থেকে)* অমিত।

অমিত--যা--ই। দাও। *(রান্না ঘবেব শব্দ। অমিত রান্না ঘবে।)* তাডাতাড়ি দাও। আজ বড্ড দেবী হয়ে গেল। উঃ ডালটা কি গরম--উঃ--*(মুখে ভাত নিয়ে)* মা, ছোডদি আজ অফিসে যাবে না।

মা—কি জানি। মাছ দি।

অমিত—দাও। *(খাওয়ার শব্দ)*

মা—তোর আর ঝোল লাগবে?

অমিত—না। মা, ছোড়দি আজ আবার কান্নাকাটি করছে কেন? কি হয়েছে জান? তোমরা কিছু বলেছ নাকি?

মা—*(ধমক দিয়ে)* তোর কি দরকার? তুই তো বাড়ির খবর ভারী রাখিস। বাড়ির জন্য কত টান। এই বেরুবি, ফিরবি সেই রাত দশটা এগারটায়। নে, ওঠ।

অমিত—*(হাত চেটে)* মা। তোমরা ছোড়দিকে বকাবকি করো না শুধু শুধু বেচারি দিনের পর দিন---

মা—তুই আজও কি ওর কাছ থেকে টাকা নিয়েছিস?

অমিত—ছোড়দি নিজেই দিয়েছে---জিজ্ঞেস কর-- বাঃ দিদিরা ছোট ভাইকে টাকা দেয় না? *(অমিত হাসে। কুলকুচির শব্দ)*। আমি যাচ্ছি---- *(অমিতের চটির ফটফট শব্দ মিলিয়ে যায়)*

মা—রত্না। কি খুঁজছিস্ আলমারিতে? কিরে, তুই তা হলে আজ অফিসে যাবি না।

রত্না—*(গভীর কণ্ঠে)* না।

মা—কি ঠিক করলি? চাকরি ছেড়ে দিবি?

রত্না—*(কাঢ়ভাবে)* কেন? চাকরি করলে ক'দিন ছুটি কি নেওয়া যাবে না?

মা—ক' দিন নিবি ঠিক করেছিস? *(একটু বিরতি)* দরখাস্ত পাঠিয়েছিস? সেটা তো অন্ততঃ

রত্না—দরখাস্ত না করলেই কি চাকরি খেয়ে নেবে? অত সহজ নয় আজকাল।

মা—রত্না। ঠিক করে বলত! উনি কি তোকে কোন খারাপ কথা বলেছেন?

রত্না—*(চড়া সুরে)* বলেছি তো। আবার কতবার বলব।

মা—এর অত বন্ধু, ওরকম একটা মানী লোক, দশজনে শ্রদ্ধা করে, তাঁর এ রকম মতিভ্রম হয়ে এমন খারাপ কাজ করবেন— বিশ্বাসই হয় না।

রত্না—খারাপ কিছু করেছেন, তা তো বলি নি। পিটপিটিনিতেই আমার জীবন অতিষ্ট করে তুলেছেন। অফিসের সকলে ঠাট্টা করে। সব সময়ে ওর চোখে চোখে থাকতে হবে। কার সঙ্গে কথা বলব, কি ভাবে হাসব --সবই উনি বলে দেবেন। এমন কি অফিসের বাইরেও।

মা—অফিসের বাইরেও।

রত্না—হ্যাঁ। ওর আণ্ডারে চাকরী করি বলে অফিসের বাইরে কার সঙ্গে মিশব না মিশব—সে সবও ওঁর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

মা—অফিসের বাইরে কার সঙ্গে মিশিস? পরমেশ?

রত্না—হ্যাঁ। পরমেশ।

(ইন্টারলুড মিউজিক)

(ট্রাম-বাস ও জনতার শব্দ। ঘ্যাঁস করে বাস থামল। বাসের নানা রকম শব্দ হ'ল।)

পরমেশ—রত্না! রত্না! এই যে এদিকে। ---উঃ। দু সপ্তাহের জন্য বম্বে থেকে এলাম। ভাবলাম, তোমার সঙ্গে---তা অফিস থেকেও সময় বাঁচাতে পারি না। তোমারও ত' অফিস থেকে ছুটি নেবার উপায় নেই।

রত্না—পরমেশ! তুমি এসেছ! *(একটু হেসে)*।

পরমেশ—রত্না! এই ভীড়ই আমাদের নির্জনতা। দু জনের মুখের দিকে তাকাবার অবকাশ।

(পাশে একটা গাড়ি এসে থামল)

রত্না—এই রে! অফিসের সেই বুড়ো!

শশাঙ্ক—রত্না! এখনও বাড়ি যাও নি। এখানে দাঁড়িয়ে আছ?

রত্না —এদিকে একটু কাজ ছিল, এবার যাব!

শশাঙ্ক—ওঃ।---আচ্ছা। শোন। কাল আমার অফিসে আসতে একটু দেরী হতে পারে। তুমি একটু সকাল সকাল আসবে। এসেই এস টি সির চিঠিগুলো ধরবে।

(ইন্টারলুড মিউজিক)

শশাঙ্ক—এসেছ! বাঃ

রত্না—আপনি যে বললেন, আজ আসতে দেরী হবে!

শশাঙ্ক—কাল যে ছোকরাটির সঙ্গে গল্প করছিলে, সে কে?

রত্না—আমাদের অনেকদিনের চেনা। বম্বে থাকেন। কয়েক দিনের জন্য এসেছেন

শশাঙ্ক—'আমাদের অনেক দিনের চেনা'। তোমার বাবা, ভানুবাবু ওকে চেনেন?

রত্না—বাবা, মা সকলেই চেনেন, দাদার বন্ধু। আমাদের বাড়িতে খুবই আসতেন—বাড়ির লোকের মত।

শশাঙ্ক--তা তোমাদের বাড়িতে না গিয়ে রাস্তার দাঁড়িয়ে---*(রত্না চুপ করে থাকে)* তুমি তারপরেও বাড়ি যাওনি। দেখলাম তোমরা রাস্তা পেরিয়ে সি-আই-টি রোডের দিকে গেলে।

(বেলের শব্দ। দরজা খুলে বেয়ারা এলো)

বেয়াড়া—সাব!

শশাঙ্ক—কফি লাও!

বেয়ারা—জী সাব।

(চেয়ার টেনে রত্না বসল, টাইপরাইটারে কাগজ জড়াল। টাইপিং এর শব্দ

বেয়ারা আবার এলো।)

বেয়ারা—কফি সাব।

শশাঙ্ক—*(কফি টানার শব্দ)* দ্যাখো, তোমার বাবা যখন আমায় কাছে এসে তোমার চাকরির জন্য বললেন, আমি আপত্তি করেছিলাম। তোমাদের ছেলেবেলা থেকে দেখেছি---আমার ছেলেমেয়ের মত---এই কাঁচা বয়স---ট্রামে বাসে উজিয়ে এসে---অবশ্য এ অফিসে আরো কটি মেয়ে---সে যাই হোক, এটা একটা ভদ্র বংশের পক্ষে---তা, তোমার বাবা বলেছিলেন, আমি যখন অভিভাবকের মতন থাকব, আমার চোখের ওপর তুমি থাকবে, বুঝতেই পারছ, আমার ওপর কত বড় একটা গুরু দায়িত্ব---এত বড় অফিস সামলে---তা ছাড়া তোমার যখন একটা মিসহ্যাপ হয়ে গেছে---।

(কফি-সিপ্ করবার শব্দ)

শশাঙ্ক—কফিটা টেনে নাও। খাও।---দেখো, প্র্যাকটিক্যালি আমি নিজে হাতে তোমাকে তৈরী করেছি। কাজ জানতে না--- নার্ভাস ছিলে---শর্টহ্যাণ্ডটা আজও ভাল শিখেলে না---অথচ তোমাকে স্টেনোগ্রাফারের পোষ্ট দেওয়া হয়েছে---আমি আস্তে আস্তে ডিকটেশান দি---আমি তোমাকে এত স্নেহ করি---কি, কথা বলছ না যে---বল কিছু---।

রত্না—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই--।

শশাঙ্ক—অন্য মেয়ের সঙ্গে তোমার তফাৎ থাকা দরকার---অন্যেরা অফিসে ছ্যাবলামি করতে পারে, ঢং করতে পারে---কিন্তু তোমার তা সাজে না। তুমি রঙিন শাড়ি পড়--- তাতে অবশ্য আমি আপত্তি করি না---আমি অতটা কনজারভেটিভ নই---

রত্না—আমার মা-ই আমাকে জোর করে—

শশাঙ্ক—তা তো করবেনই--আজকাল অনেকেই---কিন্তু বাইরে ব্যবহারে একটা শুচিতা---রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে আজেবাজে লোকের সঙ্গে--

রত্না—*(দৃঢ় স্বরে)* উনি আজেবাজে লোক নন—

শশাঙ্ক—সে যাই হোক। একটা পুরুষমানুষের সঙ্গে ঘোরা—কেচ্ছা গাইবার লোকের ত' অভাব নেই---

রত্না—আমার বাবা মা জানেন আমি পরমেশদার সঙ্গে বাইরে দেখা করি--- তাদের আপত্তি নেই। আপনি এতে--

শশাঙ্ক—তোমার বাবা মাকে চিনি ত'! ওঁরা আপত্তি করবেন না। কিন্তু আপত্তি করেন নি বলে কি মেনে নিয়েছেন? বুকে খচখচ করে কিন্তু বলতে পারেন না।

রত্না—কেন?

শশাঙ্ক—বিধবা মেয়েকে যে বাপ চাকরি করতে পাঠায়, সে-বাপ মেয়ের গতিবিধি সম্পর্কে কথা বলবে! মুখ কোথায়? কিন্তু আমি তো চোখ বুঁজে থাকতে পারি না!

রত্না—কেন? বিধবা হয়েছি বলে কি আমার সব গেছে?

শশাঙ্ক—না--না--সে কথা বলি নি। তোমার নিজের দোষে ত' কিছু হয় নি। কিন্তু কত সাবধানে তোমাকে চলতে হবে! তোমার বাবা যখন দেখা শোনার ভার আমার ওপর দিয়েছেন, তখন তোমাকে ত' নষ্ট হতে দিতে পারি না!

রত্না —নষ্ট!

শশাঙ্ক—না, না! সেভাবে বলি নি। আরে, এই দ্যাখো, এত রাগ, শোন শোন, রত্না---আমি বলছিলুম কি--

(ইন্টার লুড মিউজিক)

(জাহাজের বাঁশী বোঝায় যে নদীর পাড়।)

পরমেশ—এখানেই বসা যাক।

রত্না—অফিস থেকে বেরুবার আগে মুখটা ভাল করে ধুয়ে আস না কেন? কেমন ঘামে চটচটে হয়ে আছে।

পরমেশ—জল দেখলেই কেমন ইচ্ছে করে নেমে পড়ি। খানিকটা সাঁতরে আসি। তা হলে ঘাম ধুয়ে যায়, শরীরও জুড়োয়। কি গরম তোমাদের কলকাতায়।

রত্না—*(হেসে)* আমাদের কলকাতা! পাঁচমাস বম্বে গিয়েই এই! বিলেত গেলে না জানি কি হবে।

পরমেশ—বিলেতেও যাব। দু'বছর বাদে কোম্পানী আমাকেও বিলেত পাঠাবে। কথা ঠিক হয়ে আছে।

রত্না—সত্যি।

পরমেশ—হ্যাঁ। ন মাসের জন্য।---তোমার বিলেত যেতে ইচ্ছে করে না।

রত্না—*(উদাস সুরে)* উঃ।

পরমেশ—*(দ্বিধা কাটিয়ে প্রসঙ্গ পাল্টে)* এ বছর কাশিয়াং যাবে না।

রত্না—এ বছর আর যাওয়া হবে না।

পরমেশ—বিল্টু কবে আসবে?

রত্না—ওদের ত' গরমের ছুটি নেই। সেই পূজোর সময়।

পরমেশ—পূজোর সময়---অক্টোবর---মানে আমার ট্রেনিং পিড়িয়ড শেষ হয়ে যাবে।

রত্না—গত বছর কাশিয়াং-এ বিল্টুর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল?

পরমেশ—হ্যাঁ। কি খুশি আমাকে দেখে। ছুটে এসে আমার কোলে মুখ গুঁজে দিল।

রত্না—তোমার সঙ্গে বাইরে যেতে ওকে অ্যালাউ করল স্কুল?

পরমেশ—বাঃ করবে না। আমার সঙ্গেই ত' দার্জিলিং ঘুরে এলো। একটু দুষ্টু দুষ্টু। এত সুন্দর হয়েছে ছেলেটা। ওকে ছেড়ে কি করে থাক। ভারী কঠিন প্রাণ তোমার।

রত্না—*(মৃদু হাসে)* বাঃ। ছেলেকে মানুষ করতে হবে না। ওর বাবার ইচ্ছে ছিল কার্শিয়াং-এর ঐ স্কুলেই পড়াবার।

পরমেশ—জান রত্না, দীপঙ্করের মুখের সঙ্গে বিল্টুর মুখের ভারী মিল। আমার কি মনে হয় জান। ও-ও দীপঙ্করের মত' ভাল স্পোর্টস্ ম্যান হবে। *(একটু বিরতি। প্রেমের আবেগে)* রত্না--

রত্না—*(বিগলিত স্বরে)* উ--উ--

পরমেশ—চল, একটা নৌকা ভাড়া করে একটু বেড়াই।

রত্না—না, থাক। আজ নয়, আর একদিন।

পরমেশ—এতক্ষণ বাদে একটু ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে---

রত্না—সত্যিই ইচ্ছে করছে না এখান থেকে যেতে। কিন্তু বেশি দেরী করা যাবে না। মা চিন্তা করবেন।

পরমেশ—অফিসের বুড়োটার কথা কি বলছিলে?

রত্না—আর বলো না। জ্বালালে। তোমাকে ফোন করছিলুম ত'। তাই শতেক প্রশ্ন। সঙ্গে সঙ্গে বললে ছুটির পর ওভারটাইম করতে হবে। বললুম পারব না। কি সন্দেহ---কোথায় যাব? সোজা বাড়ি যাব কিনা!

পরমেশ—লোকটার বাড়িতে বউ আছে?

রত্না—হ্যাঁ। ছেলে-পুলে বউ—বিরাট সংসার মেয়েদের সম্পর্কে এত সন্দেহ বাতিক, ওর বউ মেয়ে কি করে সহ্য করে তাই ভাবি।

পরমেশ—লোকটা তোমার প্রেমে পড়ে গেছে।

রত্না—ধ্যাৎ। তা নয় আসলে---

(ইন্টারলুড মিউজিকের সঙ্গে বোমা পড়ার শব্দ)

অমিত—পরিতিক্রিয়াশীল বুর্জুয়া দালালেরা টাকা ছড়িয়েও ভাঙ্গতে না পেরে এবার বোমা ছুঁড়ছে। শৈলেন, আমাদের দল ডাক। *(পর পর কয়েকটা বোমা পড়ে)* ছোঁড়। ঐ দ্যাখ ওরা পালাচ্ছে। *(আবার দূরে বোমার শব্দ। এদের উল্লাস ধ্বনি)* শৈলেন, দেখ, মনি বিকাশ আর অশোকের বোধ হয় খুব লেগেছে। ওরা রাস্তার পড়ে। ধর্ ধর্--

(পুলিশের গাড়ি থামা ও হুইশিলের শব্দ)

শৈলেন—অমিত। পুলিশ। পালা। পালা।

অমিত—মণিদের ফেলে পালাব।

শৈলেন—পুলিশ এসেছে। ওদের হাসাপাতলে পাঠাবে। এখানে থাকলে

আমাদের হাজতে যেতে হবে।

অমিত—কিন্তু--তাই বলে-- এভাবে পালান--

শৈলেন—গলিতে ঢোক। *(কথায় বোঝা যায় ও দৌড়চ্ছে। হাঁফায়)* একি অমিত। তোর জামায় এত রক্ত।

অমিত—ঘাড়ে ইঁট লেগেছে।

শৈলেন--চল ডাক্তার ঘোষের কাছে।

অমিত—দরকার নেই। ডেটল দিয়ে মুছলেই হবে। কেবল জামাটা বদলাতে হবে।

শৈলেন—সব হবে। চলত।

(ইন্টারলুড মিউজিক)

মা—এত তাড়াতাড়ি ফিরতে পার্লে আজ।

বাবা—হেঁটে আসি ত'! আজ কোন কলেজ ইলেকশন নিয়ে গণ্ডগোল হয়েছে। পথ ফাঁকা চলে এলাম। ওপরে যেন রত্নাকে দেখলাম। অফিস যায় নি।

মান—না।

বাবা—না। সে কি? কেন? এমনি করলে চাকরি থাকবে? আমার দু বছর এক্সটেনশন হয়ে গেল। সামনের বছর রিটায়ার করতেই হবে। সেকথা ভাবলে একদিকে আনন্দ হয়—অন্য দিকে মুখ শুকিয়ে আসে। মেয়েটাকে নিয়ে হয়েছে যত যন্ত্রণা।

মা—এই নাও গামছা, হাতমুখ ধুয়ে এসো। চা করব?

বাবা—কর।

মা—কি অত ভাবছ!

বাবা—ভাবছি মেয়েটার কথা! আমাদের সবচেয়ে সুন্দরী সবচেয়ে প্রাণোচ্ছল মেয়েটা। কি হ'তে কি হ'ল!

মা—হ্যাঁ দীপঙ্করের মত জামাইও হয় না।

বাবা—ছেলেটার সবই গুণের কিন্তু ছিল বেপরোয়া—বেহিসেবী! না হলে দুর্ঘটনাটা ঘটত না।

মা—উঃ ভাবতেও মাথা ঘোরো। একুশ বছরে মেয়ে শাঁখা-সিঁদুর খুইয়ে ছেলে কোলে ফিরে এল।

বাবা—হাঁ। তারপর থেকেই কেমন হয়ে গেল মেয়েটা। এক বছর চলল ফিট। যদি বা ফিট সারল, দিনরাত মনমরা হয়ে থাকত। তারপর এই শশাঙ্ক চৌধুরীকে ধরে চাকরী।

মা—তোমার বন্ধু—

বাবা—বন্ধু! কবে এক মেসে থাকতাম! শশাঙ্ক চৌধুরী আর আমাতে কত তফাৎ! সে একটা অতবড় অফিসের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। না চিনলে কোন

দোষই দেওয়া যেত না। তবে অমায়িক। না হলে একটা আই এ পাস মেয়েটা কেউ শুধু বাবার সঙ্গে বাল্য বন্ধুত্বের খাতিরে এই চাকুরী দেয়। ও আমার থেকেও বেশি পায়।

(এতক্ষণের নানা শব্দে বোঝা যায় বাবা হাতমুখ ধুলেন, মা চা করলেন।)

মা—এই নাও চা।

বাবা—হুঁ। আজ পবমেশকে দেখলাম। হীরের টুকবো ছেলে। সরল নিরহঙ্কাব। অতবড চাকরী কবে, কে বুঝবে। দীপঙ্করেব সঙ্গে বিয়ের আগে ও যদি মুখফুটে বলত....আমি জাতের বিচাব করতাম না। আমি বিদ্যাসগেবেব ভক্ত... এখনও।

রত্না—বাবা! কতক্ষণ এসেচ?

বাবা—একুনি মা! তা, হ্যাবে, পবমেশ কদিন কলকাতায় থাকবে?

মা—আবো দিন দশেক।

বাবা—হ্যাবে! তোর সঙ্গে দেখা হয়? তোকে কিছু বলেছে?

রত্না—কি বলবে?

বাবা—বলবে মানে, এই বিয়েব কথা।

রত্না—ও বিষয়ে আমি এখনো কিছু ঠিক কবিনি।

বাবা—ও কি বলে?

বত্না—বললুম তো, আমি নিজেই এখনো কিছু ঠিক কবিনি।

বাব—আহা, পবমেশ নিজে কিছু বলেছে কিনা, সেটাই জানতে চাইছি।

বত্না—(ক্রুদ্ধ স্ববে) তাব মানে কি? এটা কি একটা দয়াব ব্যাপাব? যে কেউ আমায় বিয়ে কবতে চাইলেই আমি বাজী হয়ে যাব! উদ্ধাব হয়ে যাব! আমার নিজেব একটা মতামত নেই।।

মা—আঃ বত্না! অবুঝেব মত শুধু বাগ কবছিল কেন? তোব বাবা বলছেন—তোবা দুজনে যে বকম ঘোবাঘুবি কবছিস ---- তাতে সবাই ভাববে, তোবা বুঝি বিয়ে কবতে চাস। সেই বকম কিছু ঠিক হয়েছে কিনা, যেটাই তো জিজ্ঞেস কবছেন।

রত্না—ঘোরাঘুরি কবছি মানে কি? একজন চেনা লোকেব সঙ্গে বাইবে কোথাও বসে দুটো কথা বলা যাবে না? আজকাল বিবাহিতা মেয়েবাও এটুকু স্বাধীনতা পায়। তোমবা সব ব্যাপারেই খারাপ ভাব।

মা—খাবাপের কথা তো কিছু বলি নি।

রত্না—নিশ্চয়ই বলেছ! তোমবা এমনভাবে বলছ, যেন আমি পাপ করেছি। বিয়ে কবলেই সব পাপ ঢেকে যাবে। তোমাদেরও ঐ লোকটার মত সন্দেহ বাতিক হয়েছে।

বাবা—(খুব আস্তে আস্তে) তুই দিন পনেব ছুটি নে অফিস থেকে।

রত্না—ছুটি দেবে না।

বাবা—কেন ছুটি দেবে না? তোর ছুটি পাওনা নেই?

রত্না—আছে, তবু ছুটি দেবে না।

বাবা—(*মৃদু হেসে অবিশ্বাসের সুরে*) তা কখনো হয়। শশাঙ্ক তো খারাপ লোক নয়। তাকে বুঝিয়ে বললে—

মা—(*আর্তকণ্ঠে*) আমিও আগে তাই ভাবতুম। রতুর কথাতেও আগে অতটা বিশ্বাস করি নি। কিন্তু আজ দুপুরে যা দেখলাম

বাবা—(*উৎকণ্ঠায়*) কি দেখলে দুপুরে? কি হয়েছে?

[*দুপুরের দৃশ্যঃ কড়ানাড়ার শব্দ*]

মা—(*দরজা খুলে*) কে? ও মা! আপনি।

শশাঙ্ক—তিন দিন রত্না অফিসে যায় নি! কি হয়েছে? অসুখ করে নিত'।

মা—না। কিন্তু—

শশাঙ্ক—আমি তাই খোঁজ নিতে এলাম। রত্না।

রত্না।—(*প্রবেশ করে, বিস্ময়ে*) এ কি! আপনি!

শশাঙ্ক—অফিসে চল রত্না।

রত্না—অসম্ভব।

শশাঙ্ক—কেন? বাড়িতে বসে তুমি কি করবে? অফিসে তোমার ভাল লাগে না? অফিসের ব্যাপারে এমন উদাসীন হলে চাকরিতে কখনও উন্নতি করা যায়?

রত্না—তাই বলে দুপুর দুটোয় কেউ অফিসে যায় না।

শশাঙ্ক—তুমি না যাবার ফলে আমার খুব অসুবিধা হচ্ছে।

রত্না—কি অসুবিধে?

শশাঙ্ক—মানে, কয়েকটা কাগজ তুমি কোথায় রেখেছ কেউ খুঁজে পাচ্চে না। তুমি গিয়ে সেগুলি খুঁজে দেবে চল।

রত্না—খুঁজে না পাবার ত' কোন কথা নয়। সব আমার ড্রয়ারে আছে। যে কেউ বের করে দিতে পারে। আমার অনেক ছুটি জমেছে। আমি কয়েকদিন ছুটি নেব!

শশাঙ্ক—না, না। এখন ছুটি দেওয়া অসম্ভব। আর, ছুটি নিয়ে তুমি কি করবে?

রত্না—বাঃ! মানুষ ছুটি নেয় না!

শশাঙ্ক—অসুখবিসুখ কিছু করোনি, এমনি ছুটি নেবে! আমাদের অফিসে ছুটি সারেণ্ডার করলে মোটা টাকা পাওয়া যায়। ছুটি সারেণ্ডার করে এ বছরে তুমি অনেক টাকা পাবে।

রত্না—আমার বেশি টাকার দরকার নেই।

শশাঙ্ক—না, না, ও সব কাজের কথা নয়। সবে অফিসের কাজ তুমি একটু

একটু করে শিখেছ, এ বছরেই তোমাকে পি. এ-র পোস্ট দেওয়া হবে—এখন অন্যদিকে মনোযোগ কিছুতেই দেওয়া উচিত হবে না।

রত্না—আমার এখন কাজ করতে একটুও ভাল লাগছে না, কদিন আমাকে ছুটি দিতেই হবে।

শশাঙ্ক—রত্না! তুমি কি আমার ওপর রাগ করে অফিসে যাচ্ছ না? [প্রবল আবেগে গদগদ কণ্ঠে] রত্না, তোমার ভালর জন্যই আমি বলছি, তোমাকে আমি নিজে কাজ শিখিয়েছি, তুমি আমার নিজের হাতে গড়া,—তুমি না থাকলে অফিসে আমি কোন কাজেই মন বসাতে পারি না, তোমার জন্য এত খেটেছি, তোমার যাতে উন্নতি হয়—

রত্না—হাত ছাড়ুন। খালি অফিস আর অফিস। তা ছাড়া কি আমার আর কোন জীবন নেই! যাব না অফিসে, যান আপনি চলে যান—

[*ইণ্টারলুড মিউজিক। দৃশ্যান্তর ঃ পূর্বদৃশ্য*]

বাবা—না, না। এর মধ্যে তোমরা এমন কি অন্যায় দেখলে? লোকটা অফিস ছাড়া আর কিছু বোঝে না—রত্নার মত একটা আনাড়ি মেয়েকে চাকরি দিয়ে শিকিয়ে পড়িয়ে নিয়েছে।—

মা—না, না। তুমি বুঝতে পারছ না, আমি দেখেছিলুম ত'। যার অফিসে আড়াই শ' কর্মচারী সে এ রকম একজনের জন্য বাড়ি বয়ে এসে...যে রকম ভাবে তাকাচ্ছিল, যে বকমভাবে কথা বলছিল....মেয়েমানুষের বুঝতে ভুল হয় না। মতিচ্ছন্ন হয়েছে ছি ছি ছি, রত্না ওর মেয়েব বয়সী—

বাবা—কেন? কি করেচে কি?

মা—করবে আবার কি! দুপুব বেলা যা কাণ্ড করছিল, শেষ পর্যন্ত বলে কি জান? বলে, বত্না, তোমার দু হাত ধরে মিনতি করছি, চল, অফিসে চল। আজ না যাও কাল থেকে যাবে কথা দাও—সেই সময়েই আমি ঘরে ঢুকে পড়লুম।

বাবা—আমি শশাঙ্কর বাড়ি গিয়ে দেখা করব। ওকে বুঝিয়ে বলব। কোথাও একটা ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে।

রত্না—না বাবা! তুমি ওর বাড়ি যাবে না। তোমাকে অপমান করবে।

বাবা—নারে না। ও তো আমার পুরোন বন্ধু। আমার মেয়ে ত' ওরই মেয়ের মতই—মানুষটা একটু বেশি গোঁড়া।

রত্না—বাবা তুমি ভুল করছ।

বাবা—ভুল নয়। তা হলে পৃথিবীর সব কিছুই কি ভুল? কোন মানুষকেই তা হলে বিশ্বাস করা যায় না।

রত্না—বাবা! আমি বলছি, তুমি কিছুতেই ওর বাড়িতে যেতে পারবে না!

বাব—তাহলে তুই কি করবি? চাকরি ছেড়ে দিবি?

রত্না—শেষ পর্যন্ত দরকার হলে তাই করব। তাই বলে—

বাবা—তা হলে ত' কথাই নেই। চাকরিই যদি ছাড়ছ তবে

অমিত—দিদি!

মা—অমিত তুই!

অমিত—হ্যাঁ। এসে ঘরে শুয়েছিলাম! তোমাদের কথায় থাকতে পারলাম না। ছোড়দি। তুই চাকরি ছাড়বি কেন? তোদের অফিসে ইউনিয়ন নেই? মামদোবাজী না কি?

মা—খোকা! তুই চুপ কর তো । তোর এসবে মাথা গলাবার কি দরকার?

অমিত—কেন? চুপ করে বসে থাকব কেন? ছোড়দিকে ভালমানুষ পেয়ে যা খুশী তাই করবে? একটা বুড়ো শকুন...একে ত' কর্মচারীদের রক্ত শুষে খাচ্ছে, তার পর আবার

বাবা—অমু। আমার বন্ধু সম্পর্কে এ ধরণের কোন কথা আমি তোমার মুখ থেকে শুনতে চাইনে।

অমিত—বন্ধু মানে কি? এক সময়ে আপনার বন্ধু ছিল, এখন যা ব্যবহার করছেন; তা কি বন্ধুর মত কাজ! ছোড়দি তুই কিছুতেই কাজ ছাড়বি না। কি করে ছাড়ায় দেখতে হবে। ইউনিয়ন আছে যখন।

রত্না—চাকরি হয়ত' এমনিই ছাড়াতে পারব না, কিন্তু আমার আর ও অফিসে যেতে ইচ্ছে করবে না।

—কেন যাবি না। জোর করে যাবি। বুড়োর নাকের ওপর দিয়ে যাবি। আমি পরমেশদাকে সব বলব। ঐ শশাঙ্ক চৌধুরী ফৌধুরী বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া উচিত।

বাবা—অমু। তুমি চুপ করবে কি?

অমিত—আমি ঠিকই বলছি। ওসব লোককে শিক্ষা না দিলে দিনের পর দিন বেড়েই চলবে—কিছু না, বাড়ি যখন ফিরবে স্রেফ তখন অন্ধকারে এককানা পাত্তি ঝাড়লেই—

বাব—অমু!

মা—ও কিরে অমিত, তোর ঘাড়ে অত রক্ত কিসের? কাটল কি করে! কিরে? অ্যাঁ। কথা বলছিস না কেন? অমিত!

[ইণ্টারলুড মিউজিক]

সামান্য গুঞ্জন এবং বক্তৃতার অস্ফুট শব্দ শোনা যাচ্ছে

প্রদীপ—কিরে! মিটিং ছেড়ে বেরিয়ে এলি!

অমিত—কিছুতেই মন দিতে পারছি না। আচ্ছা প্রদীপ, তোর বাড়িত' বেলেঘাটায়। তুই শশাঙ্ক চৌধুরীকে চিনিস। ঐ যে পি. পি. ইনডাস্ট্রিজ—

প্রদীপ—হ্যা, চিনি। কেন?

অমিত—শালাকে একটু শিক্ষা দিতে হবে। ছোড়দি কাজ করে ঐ অফিসে, বুড়ো এমন পিছনে লেগেছে—

প্রদীপ—কি ছাটাই করবে!

অমিত—না তা নয়! রস গড়িয়েছে ..... বুড়ো ভাম একটা সব সময় ছোড়দির পিছনে লেগেছে—

প্রদীপ—দেখেছি। পাড়ার ছোট মেয়ে দেখলে মা মা করে কাঁধে হাত রাখে। আর এ দিকে—পুরো আলুর দোষ। অন্ধকারে ঝাড়ব একখানা গাড়িতে।

অমিত—(*একটু চিন্তা করে*) কিন্তু কিজন্য মার খেল—বুড়ো সেটা যদি জানতে না পারে, তবে ছোড়দির কি লাভ হবে?

প্রদীপ—আগে জানিয়ে, ভয় দেখিয়ে পরে মারতে বলছিস? এতে প্রথমেই জানতে হবে, তোর ছোড়দির মত আছে কিনা!

অমিত—তার মানে?

প্রদীপ—মানে, এর পর তোর ছোড়দির চাকরী যাবেই। জেনে নে, তোর ছোড়দি চাকরী ছাড়তে রাজী আছে কিনা। রিক্স তাকেই নিতে হবে।

অমিত—কেন? চাকরি যাবে কেন? ইউনিয়ন নেই? চাকরি ছাড়ালেই হল!

প্রদীপ—আচ্ছা গোলা তো তুই। চাকরী ছাড়াবে না কি? এইসা প্রেসার টাকটিস খেলবে যে কোন ভদ্রলোকের মেয়ের পক্ষে চাকরি করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। তোর ছোড়দি নিজেই রিজাইন করবে।

অমিত—অবস্থাতো প্রায় সেই রকমই—

[রতনদা প্রবেশ করেন]

রতনদা—অমিত! তুমি এখানে! আমি তোমাকে খুঁজছি।

অমিত—কেন, রতনদা!

রতনদা—নবদ্বীপ বাই-ইলেকসনে আমাদের এখান থেকে দশ জন ভলেন্টিয়ার চেয়েছে। পার্টি ঐ দশজনের মধ্যে তোমাকে একজন নির্বাচন করেচে। রাতে ফারক্কা প্যাসেঞ্জার ধরবে, বাড়ি থেকে একটা জামা কাপড় যা নেবার নিয়ে এসো।

অমিত—আমি যেতে পারব না। আমার অসুবিধা আছে।

রতন—কি অসুবিধা?

অমিত—আমাদের বাড়িতে একটা গণ্ডগোল চলছে।

রতন—কি গণ্ডগোল। যদি তোমার আপত্তি না থাকে তবে আমাকে বল।

অমিত—আপত্তির কি আছে?

প্রদীপ—রতনদা। অমিতের বিধবা দিদি এক প্রাইভেট কোম্পানীতে চাকরী করে। ওর বস ওঁকে ভীষণ বিরক্ত করছে।

রতনদা—এ সামান্য মান-অভিমানের ব্যাপার।

অমিত—সামান্য নয় রতনদা। আমাদের বাড়ির সকলে এ নিয়ে খুবই চিন্তিত। আমার দিদি খুবই অভিমানী কি না!

রতন—তোমাকে একটা কথা বলব অমিত! বৃহত্তর সংগ্রামের পথে পা বাড়িয়েছ তুমি। এমন সামান্য পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে সময় নষ্ট করা তোমার উচিত নয়। আসল ব্যাপার কি জান। একটা একটা করে এ সব সমস্যার সমাধান করা যায় না। বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আমরা এমন একটা সমাজ আনতে চাইছি, যেখানে এ ধরনের কোন সমস্যাই থাকবে না। যাও, তৈরী হয়ে এসো। আটটার মধ্যে রিপোর্ট করব।

ইন্টার মুড মিউজিক

পরমেশ—কিন্তু মাসিমা, আমি কি দোষ করেছি?

মা—দোষ তোমার নয়, তোমাদের কারো নয়। দোষ আমার কপালের। একটা দিন একটু শান্তি পেলাম না। চিন্তায় চিন্তায় আমার হাড় একেবারে কালি হয়ে গেল। আমাদের মত গরীব ঘরের ছেলেমেয়েরা অল্প মাইনের ইস্কুলে পড়ে, মানুষও হয় মোটামুটি। কিন্তু রত্না বিল্টুকে সেই কার্শিয়াং-এর সেই সাহেবী হাইস্কুলেই পড়াবে। দীপঙ্করের তাই ইচ্ছে ছিল।

পরমেশ—আমারও তাই ইচ্ছে।

মা—কিন্তু চাকরী ছাড়লে কে ঐ খরচ চালাবে? ও মেয়ে কারো সাহায্য নেবে ভেবেছ?

পরমেশ—কিন্তু রত্নার পক্ষে চাকরী আর করা চলে না।

মা—তাই তো বলছিলুম, আমার কপালের দোষ। না হলে এতকাল সরকারী চাকরী করে উনি যা পান, ও পায় প্রায় তার সমান। মাইনে আরও বাড়ত। কিন্তু সে চাকরী ওর কপালে সইল না। অবশ্য মেয়ে চিরকাল চাকরী করুক, তাও আমরা চাই না। কিন্তু এখন কি করবে?

পরমেশ—মাসিমা। এর একটা সহজ সমাধান আছে। আপনাদের সব চিন্তা তাতে দূর হবে। আমি রত্নাকে বিয়ে করতে চাই। আমার ট্রেনিং শেষ ডিসেম্বর। তখন বিয়ে করাই আমাদের পক্ষে সবচেয়ে সুবিধে। রত্না চাকরী ছাড়লে কিছু বাড়তি টাকা পাবে। তাতে এ ক'মাস বিল্টুর খরচ চলে যাবে। তারপর থেকে বিল্টু তো আমারও হবে—তখন থেকে দায়িত্ব আমার।

আর, তাতেও যদি অসুবিধা হয়, আমি এখুনি রেজিস্ট্রী করে যেতে রাজী আছি। তাহলে ত' আর কোথাও কোন কথা থাকবে না।

মা—*(একটু চুপ করে থেকে)* পরমেশ! তুমি রত্নাকে এ কথা বলেছ?

পরমেশ—না। এ কথা বলি নি। বলতে সাহস পাচ্ছি না।

মা—সাহস পাও নি!

পরমেশ—না, পাই নি, রত্না যদি একবার না বলে, আমি বড় অসহায় হয়ে পড়ব। মাসিমা, সত্যি বলছি আপনাকে, আরও তো কোন কোন মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, কিন্তু আর কাউকে বিয়ের কথা আমার মনে হয় নি। রত্নাকে ছাড়া...সেইজন্যই বলছি আপনি প্রথমে বলুন।

মা—দেখো পরমেশ। যতই যা হোক, নিজের বিধবা মেয়ে...আমি মা হয়ে তাকে আবার বিয়ের কথা...না বাবা। ও তোমরা নিজেরাই ঠিক করো।

পরমেশ—কিন্তু মাসিমা। আপনি একটু সাহায্য না করলে চলবে না! রত্নার মেজাজ যেমন খারাপ হয়ে আছে, কখন ঝোঁকের মাথায় কি করে বসবে।

মা—বাবা একটা কথা সত্যি করে বলত! আমরা এসব ঠিক বুঝি না রত্নাকে সারা জীবন ভাল মনে স্বীকার করতে পারবে? বিল্টুকে চিরকাল নিজের ছেলে বলে ভাবতে পারবে? দীপঙ্করের কথা মনে পড়বে না তো!

পরমেশ—দীপঙ্করের কথা মনে পড়বে না কেন? নিশ্চয় মনে পড়বে। হয়ত ওর কথা ভেবে কখনও রত্নার মন খারাপ হবে। আর সেটাই ত স্বাভাবিক। কিন্তু ওর কথা ভেবে আমার মন খারাপ হতে যাবে কেন? আমার বরং রক্ত গরম হয়ে উঠবে, যদি শুনি কোন জ্যান্ত লোক রত্নার গায়ে হাত দিয়েছে। যদি কোন অফিসের বড়বাবু—

মা—না, না! সে রকম কিছু হয়নি। তুমি রত্নাকে এখনও চেন না। ওর মত মেয়েকে ছোঁবে সে সাহস—

পরমেশ—রত্নাকে আমি খুব ভাল ভাবেই চিনি। জানি, সে রকম কিছু ঘটেনি।

রত্না—মা!....এই যে চা। (*চা নামাবার শব্দ।*)

মা—বস পরমেশ। আমি আসছি।

পরমেশ—মেট্রোর টিকিট কেটে দাঁড়িয়ে ছিলাম। কথা দিয়ে গেলে না কেন?

রত্না—শরীর খারাপ লাগছিল। তাই যাই নি।

পরমেশ—রত্না। বহু কষ্টে অফিস থেকে কয়েকদিনের ছুটি ম্যানেজ করেছি। ভাবছি বম্বে ফেরার আগে একবার দার্জিলিং থেকে ঘুরে আসব। সেই সঙ্গে কার্শিয়াং-এ বিল্টুকেও দেখে আসব।

রত্না—না।

পরমেশ—কেন?

রত্না—আমি জানি, তুমি কি বলতে চাইছ। কিন্তু তা হয় না।

পরমেশ—হয় না! কিন্তু কেন?

রত্না—হয় না! হয় না।

পরমেশ—কেন রত্না? কেন হয় না!

রত্না—(*কেঁদে ফেলে*) তোমরা ভেবেছ কি? সবাই আমাকে দয়া করবে? আমি

অসহায় বলে সবাই আমাকে দয়া দেখাতে আসবে? আমি কারুর দয়া চাই না। দরকার হলে আমি বিল্টুকে নিয়ে পথে পথে ভিক্ষে করব। না যাও। তুমি যাও।

পরমেশ—রত্না! রত্না! তুমি আমার দিকে একবার—

রত্না—হাত ছাড় পরমেশ। আমি এ চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি। নতুন চাকরি খুঁজছি। যতদিন অন্য কোথাও চাকরি না পাচ্ছি, ততদিন আবার আমাকে স্বাধীন হতে দাও। তুমি আজ যাও পরমেশ। আজ যাও। যা-ও।
